একাদশে সূর্যোদয়

রূপক সাহা

একশো বছর আগের বিস্মৃতপ্রায় একটা অধ্যায়কে তুলে আনার কাজটি খুবই কঠিন। তার কারণ, ভারতীয় ফুটবলের এই অত্যাশ্চর্য সাফল্য নিয়ে আমাদের পূর্বসূরিরা খুব বেশি কিছু লিখে যাননি। ১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাবের সেই শিল্ডজয়ীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মারা যান শিবদাস ভাদুড়ি ১৯৩২ সালে। সর্বশেষ রেভারেন্ড সুধীর চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৬ সালে। মাঝের ৩৪ বছরে যদি কোনও সাংবাদিক উদ্যোগ নিতেন, তা হলে ওঁদের মুখ থেকে নিশ্চয়ই বহু অকথিত কাহিনী জেনে নিতে পারতেন।

তথ্য হিসেবে আমার সামনে ছিল, পুরোনো খবরের কাগজের কিছু কাটিং। ইংরেজ আমলে বেশিরভাগ সংবাদপত্রই অবশ্য মোহনবাগানের এই শিল্ডজয়কে বড় করে দেখায়নি। তাই আমাকে দ্বারস্থ হতে হয়েছিল, অমর একাদশের উত্তরসূরিদের কাছে। তাঁদের খুঁজে বের করার জন্য প্রচুর পরিশ্রমও করতে হয়েছিল। কেউ কেউ অবশ্য সযত্নে রেখেও দিয়েছিলেন এগারোর জার্সি, শিল্ড ও ট্রেডস জয়ের নজির পদকগুলো।

বছর দেড়েক আগে হঠাৎ একদিন মনে হল, শিল্ডজয়ের কাহিনীতে, স্বাধীনতা আন্দোলনে মোহনবাগান ক্লাবের অবদানের কথা তেমনভাবে লেখা হয়নি। তাই 'একাদশে সূর্যোদয়' লিখতে বসলাম। এই কাহিনি তো শুধুমাত্র মোহনবাগান সমর্থকদের জন্য নয়, এই কাহিনী তামাম ফুটবলপ্রেমীদের গর্বের।

একাদশে সূর্যোদয়

রূপক সাহা

দীপ প্রকাশন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৬

EKADASHE SURJYODAY

by

Rupak Saha

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ২০১০ ◆ প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

প্রকাশক : শংকর মণ্ডল

২০৬, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক : লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

মূল্য : ১১০.০০ টাকা

গোষ্ঠ পাল

'শিবদাসবাবু আচেন নাকি গো।'

রাস্তা থেকেই হাঁক পাড়ল নিবারণ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে নিশ্চিত হয়ে গেল। এই সেই বাড়ি। ফটকের পাশে মার্বেল পাথরের গায়ে লেখা 'বিপ্রদাস কুটির'। হ্যাঁ, নির্জন সার্কুলার রোডের কাছে এই বাড়িতেই থাকেন শিবদাসবাবু আর বিজয়দাসবাবু। বার বার বলে দিয়েছেন সেজকর্তা। ভুল হওয়ার কোনও উপায় নেই। বৈঠকখানার সিঁড়িতে পা দিয়ে, উঁকি-ঝুঁকি মেরে নিবারণ ফের হাঁক পাড়ল, 'শিবদাসবাবু, ও শিবদাসবাবু বাড়ি আচেন?'

কিন্তু তার গলার স্বর চাপা পড়ে গেল। শ্যামবাজার মিত্তিরবাড়ির বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। ঘণ্টার সেই আওয়াজ হাতিবাগান থেকেও শোনা যায়। নিবারণ বুঝতে পারল আটটা বেজে গেছে। পান্তির মাঠ থেকে বাবুমশায়রা ফিরে এসেছেন প্র্যাকটিস সেরে। এই বেলায় ধরতে না পারলে বাবুমশায়রা আপিসে বেরিয়ে পড়বেন। সেজকর্তা তাও বলে দিয়েছেন।

ভাদুড়িবাড়ির কনিষ্ঠ পুত্র শিবদাস তখন বাড়িতেই ছিলেন। আপিসে যাওয়ার আগে জলখাবার খেতে বসেছেন। দোতলার ঘর থেকে নিবারণের ডাক শুনে তিনি একটু অবাকই হয়ে গেলেন। বোসবাড়ির কাজের লোক এই নিবারণ। সেজকর্তার খুব পেয়ারের লোক। কী এমন দরকার পড়ল, সেজকর্তা তাকে বাড়িতে পাঠালেন? দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এলেন শিবদাস। বৈঠকখানায় পা দিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার নিবারণ, এই সাতসকালে?'

মাথা নিচু করে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল নিবারণ। বলল, 'আজ্ঞে, সেজকত্তাবাবু আপনাকে ডেকে পাঠ্যেচেন। এখুনি যেতে বলেচেন।'

সেজকত্তাবাবু মানে শৈলেন বসু। সুবেদার মেজর শৈলেন বসু। মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারি।

জননায়ক ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভাইপো। শিবদাস বুঝতে পারলেন, নিশ্চয়ই খুব জরুরি দরকার। এবং সেটা ক্লাব ও টিম সংক্রান্ত। না হলে শৈলেনবাবু লোক পাঠাতেন না। ওঁর সঙ্গে শেষ বার দেখা হয়েছিল দু'দিন আগে। ময়দানের মাঠে প্র্যাকটিসের সময়। দু' একটা কথা বলেই উনি চলে যান। শিবদাস তখনই কানাঘুষোয় শুনেছিলেন, মোহনবাগান যাতে আইএফএ শিল্ডে খেলতে পারে, তার জন্য স্যার খুব চেষ্টা করছেন। কিন্তু ঘরে-বাইরে মোহনবাগানের অনেক শত্রু। মোহনবাগান ক্লাব যাতে শিল্ডে খেলার সুযোগ না পায়, তার জন্য অনেকেই পিছনে লেগেছেন। দ্রুত এই সব চিন্তা করে নিয়ে শিবদাস

বললেন, 'ঠিক আছে নিবারণ, তুমি যাও। সেজকত্তাবাবুকে গিয়ে বল, আমি আসছি।'

'আজ্ঞে, কত্তামশাই ফিটন গাড়ি পাঠ্যে দিয়েচেন।'

ওহ, তার মানে এখুনি বোসবাড়িতে যেতে হবে। 'চলো তা হলে।' জলখাবারের কথা ভুলে শিবদাস বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফিটনে ওঠার আগে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। ছলছল চোখে।

বিপ্রদাস কুটির থেকে বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে বোসবাড়ির দূরত্ব এমন কিছু নয়। হাঁটা পথে মিনিট সাতেক। শ্যামবাজারের ট্রাম গুমটির পিছনে বোসবাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছতেই শিবদাস দেখতে পেলেন শৈলেনবাবু পায়চারি করছেন। মুখ গম্ভীর। রাশভারি মানুষ, সরাসরি প্রশ্ন করার সাহস শিবদাসের নেই। একটু দূরত্ব রেখে তিনি বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'ওদের হ্যান্ডবিলটা দেখেচ শিবদাস?' নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন শৈলেনবাবু।

কীসের হ্যান্ডবিল, বুঝতে পারলেন না শিবদাস। বললেন, 'না তো।'

পকেট থেকে একটা হ্যান্ডবিল বের করে, শিবদাসের দিকে এগিয়ে দিয়ে শৈলেনবাবু বললেন, 'এই দেখো, কী লিখেচে আমাদের নিয়ে।'

মোহনবাগান টিম টানা তিনবার ট্রেডস কাপ জেতার পর থেকে অনেক দেশি ক্লাবের চক্ষুশূল হয়ে গেছে। বিশেষ করে শোভাবাজার ক্লাবের। এত ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ, দুটো ক্লাবই উত্তর কলকাতার। দু'বছর আগে মোহনবাগান ক্লাব আইএফএ শিল্ড ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সেই ম্যাচে শিবদাসরা হেরে যান। সেই হার নিয়ে কত ব্যঙ্গ! কেউ কেউ মোহনবাগান আর শৈলেনবাবুকে হেয় করে ছড়া লিখে, হ্যান্ডবিলও ছাপিয়েছিল। মূল কথা, বামন হয়ে চাঁদে যাওয়ার শখ কেন বাপু? এ বারের হ্যান্ডবিলও সে রকম কিছু হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরলেন শিবদাস। বড় বড় অক্ষরে সব লেখা। বাগবাজারের গ্রাম্য ভাষায় কটাক্ষ। প্রথম দুটো লাইন পড়েই শিবদাস মারাত্মক চটে গেলেন।

'কানু এ বার বেণু ধরেছে,
শিবে বিজে প্যান্টে পটকেছে
ট্রেডস পেয়ে হয়ে ক্ষিপ্ত
হচ্ছেন গিয়ে শিল্ডে লিপ্ত
এবার ঘড়ি পাওয়া হবে শক্ত
গর্ডন ফের হাগিয়ে দেবে।।'

কানু...মানে কানু রায়। মোহনবাগান টিমের রাইট আউট। 'বেণু ধরেছে' মানে...খেলা ছেড়ে এখন বাঁশি বাজানো ধরেছে। 'শিবে বিজে' মানে শিবদাস আর তাঁর দাদা বিজয়দাস। 'প্যান্টে পটকেছে...' মানে প্যান্টেই মলত্যাগ করে ফেলেছে। লাইনটা পড়ে শিবদাসের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। তিনবার ট্রেডস কাপ জেতার পর প্রত্যেক প্লেয়ারকে একটা করে ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন শৈলেনবাবু। তাতেও ব্যঙ্গ। দীর্ঘ ছড়ার প্রথম পংক্তিতে চোখ বোলানোর পর, আর পড়ার ইচ্ছে তাঁর হল না।

শিবদাসের মুখের রং বদলানো দেখে শৈলেনবাবু বললেন, 'কুলতলির মাঠ থেকে এই হ্যান্ডবিল পাড়ায় পাড়ায় ওরা বিলি করচে। কাল কাকাবাবুর কাচে দিয়ে গেচেন যদুপতি মুকুজ্জে।'

কথাগুলো বলেই শৈলেনবাবু বৈঠকখানার দিকে পা বাড়ালেন। বোসবাড়ির বৈঠকখানাটা বিরাট। রোজ সন্ধেবেলায় প্রচুর মানুষের সমাগম হয় সেখানে। ভূপেন্দ্রনাথ বসু পেশায় আইনজীবী। আইন পরামর্শ নেওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনেকেই আসেন। সেই সঙ্গে আসেন সমাজের গণ্যমান্য অনেকেই। সান্ধ্য মজলিসে তখন আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। জাতীয় কংগ্রেস পার্টিতে ভূপেন্দ্রনাথ ইদানীং গুরুত্ব পাচ্ছেন। সেই কারণে সর্বদাই তাঁর চারপাশে ভিড়। সান্ধ্য আড্ডায় নিয়মিত আসেন যদুপতি মুকুজ্জে। শিবদাস তাঁকে ভালমতো চেনেন।

আরাম কেদারায় বসে শৈলেনবাবু বেশ কিছুক্ষণ চুপ। শিবদাস তাঁর কাছে কোনও প্রশ্ন করার সাহস পেলেন না। নিছক একটা হ্যান্ডবিল দেখানোর জন্য যে শৈলেনবাবু তাঁকে ডেকে পাঠাননি, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। নিশ্চয় কোনও গুরুতর প্রসঙ্গ তুলবেন। কথাটা তাঁর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শৈলেনবাবু মৌনভঙ্গ করে বললেন, 'তোমার টিমের কী অবস্তা শিবদাস?'

'তৈরি আচে স্যার। ইলেভেন আ সাইড হয়ে গ্যাচে।'

'টিমে কাকে রাকলে?'

'গোলে হীরালাল, ব্যাকে সুকুল আর সুধীর, হাফে মনমোহন, রাজেন আর নীলু, ফরোয়ার্ডে কানু, হ্যাবুল, অভিলাষ, বিজয়দাদা আর আমি।'

'মাত্তর এগারোজন! আরও দু' একজনকে নিয়ে রাকতে পারলে না কো?'

'আপনি তো জানেনই স্যার, আমি ক্যাপ্টেন হওয়ার পর থেকে টিমের পুরনো প্লেয়াররা কী র'ম লেগেচে আমার পেচনে। ওদের কাউকে টিমে রাকলে সাংঘাতিক করে দেবে। সেটা আমি চাই না কো। দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল অনেক ভাল।'

'না না, পুরনোদের কথা আমি বলচি না কো। আমি বলি কী, আহিরীটোলা বা এরিয়ান ক্লাবে তো অনেক আনরেজিস্টার্ড প্লেয়ার আচে। তাদের দু' একজনকে নিলে কেমন হয়? টিমে মাত্তর এগারোজন রাকাটা রিস্কি, বুয়েচ। ইনজুরি প্রবলেম আচে। ফিরিঙ্গিদের তো জানো। গা জোয়ারি খেলে। শেষে যেন এমনটা না হয়, প্লেয়ারের অভাবে আমরা টিম দিতে পারচি না। এই যেমন শুনচি... আহিরীটোলা ক্লাব এ বার নাম দিয়েও উইথড্র করে নিচ্চে শিল্ড থেকে।'

বাইরের ক্লাব থেকে কোনও প্লেয়ার নেওয়ার বিরোধী শিবদাস। বিশেষ করে শোভাবাজার থেকে। এক আধজন কম প্লেয়ার নিয়ে ম্যাচ খেলতে নামবেন, তাতে তিনি রাজি। কিন্তু যে সব ক্লাবের কর্তা মোহনবাগানের কুৎসা গাইতে নেমেছেন, তাঁদের কাছে শিবদাস হাত পাততে যাবেন না। কথাটা সরাসরি বলার স্পর্ধা তাঁর নেই। শৈলেনবাবুকে তিনি এতটাই সম্মান করেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে, প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য শিবদাস বললেন, 'শিল্ডে কি এবারও শোভাবাজার খেলচে?'

'হ্যাঁ শিবদাস। শুধু শোভাবাজার নয়, সাহেবরা আহিরীটোলা ক্লাবেরও এন্ট্রি নিয়েচে।'

'তা'লে মোহনবাগানের নাম কেন ওরা নেবে না স্যার? টানা তিনবার আমরা ট্রেডস কাপ জিতেছি। লাস্ট ইয়ার শিল্ডের দ্বিতীয় রাউন্ডে গেচি। সাহেবদের বলুন, আমাদের মতো রেকর্ড আর কোন লোকাল টিমের আচে? এ তো ইনজাস্টিস।'

'এক্সাইটেড হয়ো না শিবদাস। কাল রাতে কাকাবাবুমশায় মিঃ ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে কথা বলেচেন। তুমি তো জানোই, কাকাবাবুমশায়ের রিকোয়েস্ট ম্যাকগ্রেগর ফেলতে পারবেন না। আমার সঙ্গে তাঁর যত শত্রুতাই থাক না কো। শুনলুম...উনি গ্রিন সিগন্যাল দিয়েচেন। খবরটা আজ সকালেই আমায় দিল গণেন মল্লিক। এ বারও আমরা শিল্ডে খেলচি। আর সেই কারণেই তড়িঘড়ি করে তোমাকে ডেকে পাঠালাম। তুমি তো গণেনবাবুকে চেনো।'

খবরটা শুনে মুখ চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল শিবদাসের। বললেন, 'আজ্ঞে চিনি স্যার। উনি তো অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টার। গেলবার শিল্ডের ফার্স্ট রাউন্ডে আমরা সেন্ট জেভিয়ার্সকে হারানোর পর... মোহনবাগান টিম সম্পর্কে উনি খুব ভাল লিকেচিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনিই। ওঁর মুখেই শুনলুম, এ বার আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ কার এগেনস্টে... সেটা আজ বিকেলেই জানা যাবে। যাক সে কতা, টিমের সবাইকে তুমি খবরটা জানিয়ে দাও। সব্বাই মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড থাকুক। এ বার ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। সাহেবদের দেখিয়ে দিতে হবে, বাঙালিরাও ফুটবল খেলতে জানে।'

'চেষ্টা করব স্যার। আমার পুরো টিম চার্জড হয়ে আচে। লাক যদি বিট্রে না করে তা'লে...'

'লাক-টাক আমি মানিনে শিবদাস। আমি আর্মির লোক। আমি মনে করি, সাকসেস পেতে গেলে, গোরাদের থেকে আমাদের অনেক অনেক ভাল খেলতে হবে। মাঠে ওরা ঠ্যাঙাতে এলে আমাদেরও পাল্টা ঠ্যাঙাতে হবে। আমাদের সাকসেস-এর পেচনে অনেক কিচু নির্ভর করচে। সব কথা তোমাকে বলা যাবে না শিবদাস। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে বলে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

কথাগুলো বলেই আরাম কেদারা থেকে উঠে পড়লেন শৈলেন বসু। উঠে পড়ার কারণটা শিবদাস বুঝতে পারলেন। হিন্দুস্তানি পালোয়ান রঘু যাদব এসে গেছে। কিছুদিন হল পূর্ণিয়া জেলা থেকে তাকে নিয়ে এসেছেন শৈলেনবাবু। এ বার শরীর দলাই-মালাই করাবেন। বৈঠকখানা থেকে বেরনোর সময় শিবদাস বললেন, 'স্যার...কাল ন্যাশনাল এ সি-র সঙ্গে আমাদের প্র্যাকটিস ম্যাচ আচে। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে। সব্বাইকে ওখানেই খবরটা জানিয়ে দেব। আমার একটা রিকোয়েস্ট আচে স্যার। কাল যদি ম্যাচটা দেকতে আসেন, তা'লে প্লেয়াররা ইন্সপায়ার্ড হবে।'

এতক্ষণে মুখে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল শৈলেন বসুর। বললেন, 'ঠিক আচে, যাব'খন। বন্দে মাতরম।'

'বন্দে মাতরম' বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন শিবদাস। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখলেন, প্রায় ন'টা বাজে। বাপ রে! ন'টার মধ্যেই তাঁকে বেলগাছিয়ায় ভেটেরেনারি

আপিসে যেতে হবে। তিনি ওই ভেটেরেনারি আপিসের ইন্সপেক্টর। ঠিক সময়ে না পৌঁছলে ওপরওয়ালা ওয়াটসন সাহেবের প্যাঁচা মুখ দেখতে হবে যে!

(দুই)

প্রাতঃভ্রমণ সেরে বাড়িতে ফিরলেন কালীচরণ মিত্র। ঘুম থেকে উঠে ইদানীং তিনি গঙ্গাতীরে বেড়াতে যান। আহিরীটোলা ঘাট থেকে সেই বাগবাজার পর্যন্ত। কোনও কোনও দিন ইচ্ছে হলে, ভেতরের রাস্তা দিয়ে চলে যান কুমোরটুলি পার্কে। সকালে বিভিন্ন বয়সি ছেলেরা ফুটবল খেলে। কালীচরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখেন। তুলসী দত্ত বলে একটা ছেলের খেলা তাঁর খুব ভাল লাগে। একদিন বড় ফুটবলার হবে। পার্কের পাশেই ভাগ্যকুলের রায়বাড়ি। রায়বাড়ির কর্তারা ফুটবল পাগল। আড্ডা মারার জন্য এক আধদিন ওঁরা ডেকে নিয়ে যান। খেলা নিয়ে আলোচনা হয়। সকালের দিকটা তাই বেশ কাটে কালীচরণের।

সুতানুটি অঞ্চলের সবাই কালীচরণ মিত্রকে চেনেন। অবশ্য কালী মিত্তির বলে চেনেন। বাঙালিদের মধ্যে ফুটবল খেলা প্রসারের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। এখন মধ্য পঞ্চাশ। মাঝে কিছুদিন হাঁটুর ব্যথায় শয্যাশায়ী ছিলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় ক্রমশই তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন। যৌবনে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাঠে গোরাদের বুটের অনেক আঘাত তিনি সহ্য করেছেন। তখন সেই চোট বেগ দেয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখন পায়ের সেই চোটগুলো ফের চাগাড় দিয়ে উঠছে। শারীরিক কারণেই এখন আর তিনি নিয়মিত ময়দানে যেতে পারেন না। এখনও তিনি আইএফএ-র গভর্নিং বডির সদস্য। তবে সেই সভাতে খুব কমই যান।

চিৎপুরের মল্লিকবাড়ির বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে ন'টা বাজল। বাড়ি ফিরে এই সময়টায় কালী মিত্তির খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেন। আরাম কেদারায় আধশোয়া হয়ে খেলার খবরগুলো নিয়মিত পড়েন। খেলার জগতের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র এখন খবরের কাগজ মারফৎ। বাড়িতে তিনি তিনটে কাগজ রাখেন। সাহেবদের 'দ্য ইংলিশম্যান' আর ঘোষদের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' আর 'দ্য ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ'। তিনটে কাগজ তিন রকমের খবর লেখে। কিন্তু যা বোঝার, বুঝে নেন কালী মিত্তির। তিনি পোড়খাওয়া মানুষ।

টেবিলের ওপর রাখা 'ইংলিশম্যান' কাগজটা কালী মিত্তির হাতে তুলে নিলেন। প্রথম পৃষ্ঠায় আলিপুরের বোমা মামলা, সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত সফর আর টেরিটিবাজারে চিনেম্যান খুন—এই সব খবরে চোখ বোলাতে বোলাতে হঠাৎ তিনি আটক গেলেন খেলার খবরে। দশই জুলাই থেকে আইএফএ শিল্ডের খেলা শুরু হচ্ছে। যে সব দল খেলবে, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে। কালী মিত্তির দেখলেন, টিমগুলোর মধ্যে মোহনবাগানের নামটাও আছে। শিল্ডে তাদের প্রথম ম্যাচে খেলতে হবে সেন্ট জেভিয়ার্সের বিরুদ্ধে। খবরটা দেখে তিনি মনে মনে প্রসন্ন হলেন। গভর্নিং বডির সভায় প্রাথমিক আলোচনাতে ম্যাকগ্রেগর সাহেব বলেছিল, এ বার দুটোর বেশি লোকাল টিমকে শিল্ডে চান্স দেওয়া

যাবে না। আহিরীটোলা, শোভাবাজার আর মোহনবাগানের মধ্যে যে কোনও দুটো দল। নাহ, যোগ্য দলকেই সাহেবরা খেলার সুযোগ দিয়েছে।

কালী মিত্তিরের নিজের টিম শোভাবাজার। তাঁর ক্লাবের অনেকেই মোহনবাগান টিমটাকে পছন্দ করেন না। তা সত্ত্বেও তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন, শিল্ডে মোহনবাগান খেলুক। টিমটা ফিজিক্যালি আর টেকনিক্যালি খুব ভাল জায়গায় রয়েছে। কয়েকদিন আগে ধর্মতলায় আইএফএ আপিসে মন্মথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কালী মিত্তিরের। ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক ক্লাবের মন্মথ গাঙ্গুলি। মন্মথবাবুর সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল নয় মোহনবাগানের। তবুও মন্মথবাবু সেদিন স্বীকার করেছিলেন, 'শিবে-বিজেরা এ বার যা টিম করেচে, আমাদের আর কোনও টুর্নামেন্ট জিততে দেবে না কো। সেদিন ওদের সঙ্গে আমরা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেললুম। একেবারে গোহারান হেরে গেচি। সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে শরৎ সিনহার বদলে ওরা অভিলাষ ঘোষ বলে একটা বাচ্চা ছেলেকে কোত্থেকে ধরে এনেচে। বাপ রে.. সে তো একেবারে বাঘের বাচ্চা। নাহ ভাই, এলেম আচে বটে শিবে-র।'

মোহনবাগানের সেক্রেটারি শৈলেন বসুকে কালী মিত্তির ভালমতো চেনেন। কড়া ধাতের ছেলে। ওঁকে খুব পছন্দও করেন। কেননা সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা ওঁর মধ্যে তিনি লক্ষ করেছেন। ম্যাকগ্রেগরের মতো ফুটবল কর্তাও ওঁকে সমীহ করে চলেন। গত পঁচিশ বছরে বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক ফুটবল খেলার চল হয়েছে। কলকাতায় প্রচুর ক্লাবও গজিয়েছে। বাঙালিরা খেলাটা শিখেছে সাহেবদের কাছ থেকে। কিন্তু ফুটবল মাঠে এখন আর বাঙালিদের সামলাতে পারছে না সাহেবরা। চোদ্দোজন মিলেও না। চোদ্দোজন মানে...এগারো জন প্লেয়ার, একজন রেফারি আর দু'জন টাচ জাজেস। কোনও খেলায় হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখলেই সাহেবরা জোচ্চুরি করে জেতার চেষ্টা করে। যখন তখন পেনাল্টি বসিয়ে দেয়। রেফারি আর টাচ জাজেস-রা সব সাদা চামড়ার। সাহেবদের টিমকে তো ওঁরা জেতাবেই।

সাহেবরা নিজেদের বলে ডোমিসাইল্ড ইউরোপিয়ান্স। তাই ওদের টিম ইউরোপিয়ান টিম। আর বাঙালিদের টিম নেটিভ টিম। সাহেবদের এই তাচ্ছিল্য আর গা জোয়ারি মনোভাব বাঙালিরা ইদানীং পছন্দ করছে না। প্রতি বছরই ফুটবল সিজনে ময়দানে নানা ঘটনা ঘটছে। আর ক্ষোভ বাড়ছে বাঙালিদের। সেই ক্ষোভের আঁচ মাঝে মাঝেই পোহাতে হয় কালী মিত্তির আর মন্মথ গাঙ্গুলিকে। কেন না ওঁরা দু'জন আইএফএ-র জয়েন্ট সেক্রেটারিও। হলে হবে কী, গভর্নিং বডি বা তার ওপরে কাউন্সিল-এ সাহেব সদস্য অনেক বেশি। তাই নেটিভ টিমের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে গেলে কালী মিত্তিররা প্রায়ই কোণঠাসা হয়ে যান। কালী মিত্তির নিজেও আইএফএ-র প্রেসিডেন্ট ডবলিউ ডবলিউ নিন্দ-এর ওপর খুশি নন।

কাগজ পড়তে পড়তেই কালী মিত্তির টের পেলেন বাড়ির সামনে ল্যান্ডো গাড়ি এসে দাঁড়াল। আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ হবে হয়তো। কাগজটা ভাঁজ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তখনই দেখতে পেলেন মন্মথবাবু গাড়ি থেকে নামছেন। আরে... কী আশ্চর্য! একটু আগে তিনি যে এই মন্মথবাবুর কথাই ভাবছিলেন! উনি থাকেন কলকাতার দক্ষিণ

দিকে। সক্কাল বেলায় অতদূর থেকে ছুটে এসেছেন কী কারণে? কালী মিত্তির শশব্যস্ত হয়ে বৈঠকখানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আরে মন্মথবাবু আপনি? আসতে আজ্ঞা হোক।'

মন্মথবাবু বললেন, 'আপনাকে বিব্রত করলুম না তো?'

কালী মিত্তির হাতজোড় করে বললেন, 'কী যে বলেন মোহাই। আমার পরম সৌভাগ্য...আপনার মতোন মানুষ...আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েচেন।'

'নজ্জা দেবেন না কো মিত্তির মোহাই। বোসবাড়িতে এয়েচিলুম। ভাবলুম আপনার দর্শন করে যাই। লাস্ট দেকা হয়েছিল আইএফএ আপিসে। মাঝে তো বহুদিন আপনি আর যানওনি ওদিকে। একা সব সামলতে হচ্চে আমাকে।'

'শরীলটে সুবিধে দিচ্চে না বুঝলেন মন্মথবাবু। ইয়াং বয়সে ফুটবল মাঠে সাহেবদের এত লাতি খেয়েচি...একন সে সব চাগাড় দিচ্চে।'

শ্বেতপাথরের গোল টেবল। তার দু'পাশে বসলেন দু'জন। বাড়িতে অতিথি এলেই হাত পাখা চালানোর লোক এসে যায়। দড়ি টেনে মন্মথবাবুকে বাতাস করতে লাগল একজন। কালী মিত্তির বললেন, 'বোসবাড়িতে শৈলেনের সঙ্গে দেখা হল?'

মন্মথবাবু বললেন, 'না। সে গ্যাচে ময়দানে। টিমের প্র্যাকটিস দেকতে। আমি ভূপেনবাবুর সঙ্গে কথা কয়ে এলুম। কাগজে নিশ্চয় দেকেচেন, মোহনবাগানকে শেষ পর্যন্ত শিল্ডে নিয়েচে। সেই কতাই বলে এলুম। প্লেয়ারদের বলুন, যেন উচিত শিক্ষা দেয় সাহেবদের। অন্তত সেমিফাইনাল অবধি উঠতে পারে। নইলে আমাদের মুক থাকবে না গভর্নিং বডিতে।'

'উনি কী বললেন?

'বললেন তো, টিম ভাল খেলবে। আসলে বিডন স্কোয়ারে স্বদেশি মেলা নিয়ে ভূপেনবাবু খুব ব্যস্ত রয়েচেন। টিমের সব ভার ওঁরা ছেড়ে দিয়েচেন শিবের ওপর। কাল গভর্নিং বডির মিটিংয়ে আপনি থাকলে জোর পেতুম। আমি তো হুমকি দিয়েচিলুম ম্যাকগ্রেগরকে। যদি এ বার মোহনবাগানকে খেলতে না দাও, তা হলে আমরা লোকাল টিমগুলো মিলে আলাদা অ্যাসোসিয়েশন করব। তোমাদের সঙ্গে আর খেলবই না কো। সত্যি একেক সময় এমন রাগ হয় ওদের ওপর। মনে হয়, সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসি।'

'খবর্দার ওই ভুলটি করবেন না কো মন্মথবাবু।'

'শিল্ডে আরেকটা টিমকে ওরা নিয়েচে, সেটা কি আপনি লক্ষ করেছেন?'

'কোন টিম বলুন তো?'

'মোসলেমস। সাহেবদের সেই ডিভাইড অ্যান্ড রুল। হিন্দুদের তিনটে টিম খেলবে কেন? একটা মুসলিম টিমকেও ঢুকিয়ে দাও। মোহনবাগান, শোভাবাজারের যাতে গাত্রদাহ হয়, তার জন্য মোসলেমস দলটাকে বাড়তি খাতির করো। ভাবুন, মোহনবাগানের মতো টিমকে ফার্স্ট রাউন্ড থেকে খেলতে হবে। কিন্তু মোসলেমস দল খেলার সুযোগ পাচ্চে সেকেন্ড রাউন্ড থেকে। সহ্য করা যায়?

'আপনি প্রোটেস্ট করলেন না কেন?'

'করে হবেটা কী? মেজরিটি দেখিয়ে পাস করিয়ে নিত। মাঝখান থেকে মুসলিম কমিউনিটি চটে যেত আমার ওপর।'

'সেটা অবশ্যি ঠিক বলেচেন।'

'আরে... গেল বার শিল্ডের সময় আমাদের সঙ্গে সাহেবরা কী অসভ্যতাই না করলে। আপনি সে সময় পশ্চিমে বেড়াতে গেচিলেন। হয়তো সবটা শোনেননি। কিন্তু সাহেবদের ভাল টাইট দিয়েচিলুম আমি।'

'আপনার টিম ফার্স্ট ম্যাচেই হেরে গেচিল... না?'

'জোচ্চুরি করে হারিয়েচিল মোহাই। আমরা জেনুইন গোল করলুম... রেফারি অফসাইড দিয়ে বাতিল করে দিলে। হারজিত নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। রেফারিজ ডিসিশন ইজ ফাইনাল। কিন্তু তাপ্পর আমাদের মাঠ নিয়ে ওরা গা জোয়ারি করতে এল। আমার টিম প্র্যাকটিস করচে। সেই সময় ফিরিঙ্গিদের দুটো দল এসে বলে কি না...মাঠ ছাড়ো। শিল্ডে আমাদের ম্যাচ আচে। আমরা খেলব। ম্যাকগ্রেগর সাহেবের অর্ডার। আমাদের সত্যমোহন ঘোষালের সঙ্গে পেরথমে কতা কাটাকাটি। সত্যমোহন ভূকৈলাস রাজবাড়ির ছেলে। খুব আপরাইট টাইপের। সাহেবদের গুমোর সে সহ্য করবে কেন? মুকের ওপর সাফ বলে দিয়েচিল, মাঠ কি ম্যাকগ্রেগর সাহেবের বাপের? ব্যস, যে-ই না শোনা, অমনি ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেচিল। তাপ্পর সত্যমোহনকে ওরা মারধর করল।'

কালী মিত্তির বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েচে। সত্যমোহনকে আইএফএ তো সাসপেন্ডও করেছিল। কিন্তু আমি তো জানতুম, একটা নিয়ম আচে...শিল্ডে যে সব টিম খেলবে, তাদের মাঠে শিল্ডের প্রয়োজনে যে কোনও সময় ছেড়ে দিতে হবে?'

'আমিও তাই জানতুম। কিন্তু পরে আইএফএ-র কন্সটিটিউশন ভাল করে পড়ে দেকি, সাহেবরা বরাবর আমাদের কাচে নিয়মের ভুল ব্যাখ্যা করেচে। টিমকে মাঠ ছেড়ে দিতে হবে ততক্ষণই... যতক্ষণ শিল্ডে সে টিকে আচে। টিম হেরে গেলে, মাঠ ছাড়তে বাধ্য নয়। ইন দ্য মিন টাইম, স্রেফ রেফারির রিপোর্টের বেসিসেই গভর্নিং বডি সত্যমোহনকে দু'বচর সাসপেন্ড করলে। বুঝুন, কী ইনজাস্টিস!'

'বাব্বা...এত কাণ্ড ঘটে গেচিল?'

'তা'লে আর বলচি কী। আমি এত রেগে গেচিলুম, ঠিক করলুম কোর্টে যাব। আমি সাহেব অ্যার্টনির সঙ্গে কনসাল্ট করলুম। যেদিন কোর্টে যাব, সেদিন সকালে দেকি, নিন্দ সাহেব আর স্যার ক্লাউ ইজমে সাহেব আমার বাড়িতে এসে হাজির। আইএফএ-র প্রেসিডেন্ট আমার বাড়িতে! দেকে মজা পেলুম মোহাই। গাঁটে গাঁটে পড়লে সাহেবরাও তা'লে ভয় পায়। নিন্দ সাহেব আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন, প্লিজ কোর্টে যাবেন না। কোর্টের বাইরে মিটমাট করে নিন। আমি কিন্তু স্টাবর্ন হয়ে রইলুম। নানা কতার পর স্যার ক্লাউ হটাৎ লোভ দেকালেন। কী বললেন, জানেন?'

'কী বললেন?'

'আমি শুনেচি, আপনার ইয়াং ছেলেটা না কি আনএমপ্লয়েড? তার একটা চাকরির ব্যবস্তা করে দিচ্চি। প্লিজ, আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। আমার রিকোয়েস্ট মেনে নিন।'

'বটে? তাপ্পর কী হল?'

'কী আবার হবে? আমি একচুল নড়লুম না। বললুম, ম্যাকগ্রেগরকে মাফ চাইতে হবে। সত্যমোহনের সাসপেনশন তুলে নিতে হবে। শেষে দুটো দাবিই ওদের মানতে হল।'

শুনে কালী মিত্তির প্রসন্ন হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাগজে কি এ সব খপর বেইরেছিল?'

'সাহেবদের কাগজে বেরোয়নি। শুদু গণেন মিত্তির ওর কাগজে খপরটা পাবলিশ করেচিল। একটা জিনিস বুঝতে পারচি কালীবাবু। সাহেবরা আমাদের ভয় পাচ্চে। নির্ঘাত ভয় পাচ্চে। নইলে বাচ্চাদের মতোন জেদাজেদি করত না।'

কালী মিত্তির বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্চে। এই দিনটার জন্যই ওয়েট করচিলুম মোহাই। এই সময়টায় ওদের গলা টিপতে হবে। সব লোকাল টিমকে আপনি একজোট হতে বলুন। নিজেদের মধ্যে গোপনে কতাবার্তা চালিয়ে যান। দরকার পড়লে আমাকেও ডাকবেন।'

কাজের লোক রেকাবিতে জলখাবার নিয়ে ঢুকল। অন্যজনের হাতে সরবতের গ্লাস। সেদিকে তাকিয়ে মন্মথবাবু বললেন, 'আপনি বলচেন বটে। কিন্তু সবাইকে ইউনাইটেড করা সব থেকে মুশকিলের কাজ। সাহেবদের তো আপনি জানেন। আপনি ইউনাইটেড হতে বলচেন। কিন্তু আমি জানি, সাহেবদের পা-চাটা কয়েকটা ক্লাব সাড়া দেবে না। বড় দুঃখের কথা।'

কথা বলতে বলতেই পকেট থেকে একটা হ্যান্ডবিল বের করে আনলেন মন্মথবাবু। বললেন, 'এটা পড়ে দেখুন। তা'লেই বুঝতে পারবেন। ভূপেনবাবু আমায় এই হ্যান্ডবিলটা দিলেন। মোহনবাগানকে ব্যঙ্গ করে কারা যেন এই হ্যান্ডবিল ছাপিয়েচে।'

'দয়া করে আপনি খাওয়া শুরু করুন। ততক্ষণে আমি পড়ে ফেলচি।' বলে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডবিলটা নিলেন কালী মিত্তির। তার পর তাতে চোখ বুলিয়ে খুব বিষণ্ণ বোধ করলেন। ছিঃ ছিঃ, এরকম নোংরা রসিকতা করা কি উচিত হয়েছে? কয়েকটা লাইন পড়েই তিনি বুঝতে পারলেন, কারা এদ্দুর নামতে পারেন। হ্যান্ডবিলটা টেবলের ওপর রেখে তিনি বললেন, 'দানী মিত্তিরের কি মাথা খারাপ হয়েছে? কেন এ সব ছাপাতে গেল? ছ্যাচড়ামির স্বভাবটি দেকচি, এখনও ওর গেল না। দাঁড়ান মোহাই, আমার সঙ্গে দেকা হোক, এমন ডাঁটব...।'

মন্মথবাবু বললেন, 'শুধু দানী মিত্তিরকে দুষছেন কেন? দেববাড়ির লোকজনও এর পেচনে আচে। আমি ভূপেনবাবুকে বলে এলুম, শিবে-বিজেকে বলুন, যেন মুকের ওপর জবাবটা দেয়। যাক গে যাক, যে কতা বলার জন্য আপনার কাচে এসেচিলুম...পরশুদিন কাউন্সিল আচে। অবিশ্যি আসবেন। শিল্ড থেকে সাহেবরা যাতে মোহনবাগানকে চট করে ছেঁটে ফেলতে পা পারে, তা আমাদেরই দেকা দরকার। শুনলুম, পেয়ারের রেফারি দিয়ে সেটা ওরা করবে।'

শুনে চটে উঠলেন কালী মিত্তির। বললেন, 'তাই না কি? শুয়োর খেকো ব্যাটারা এ সব কন্সপিরেসি করচে। ঠিক আচে, কাউন্সিল মিটিংয়ে আমি থাকব। দেকি, বজ্জাতি ওরা করে কী করে?'

খাওয়া শেষ করে মন্মথবাবু ফের গাড়িতে গিয়ে বসলেন। সে দিকে তাকিয়ে কালী মিত্তির মনে মনে প্রার্থনা করলেন, 'রাধাগোবিন্দ, দেকো...জুলাই মাসটা যেন সুস্থ থাকি।'

(তিন)

'কী অলক্ষুণে কতা গো।'

অবাক হয়ে গালে হাত দিলেন অঘোরসুন্দরী। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলেন না। শিবে-টার হল কী? সাপের পাঁচ পা দেখেছে নাকি। তিনি বারণ করা সত্ত্বেও শিবে আজ বল খেলতে যাবে। তার এত সাহস?

খাটের বাজু ধরে অঝোরে কাঁদছেন কৃষ্ণভামিনী। আজ তার ছোটবোনের আইবুড়ো ভাত। কান্নাকাটি করার দিন নয়। বাপেরবাড়ি সাঁতরাগাছিতে গিয়ে তাঁর হই হুল্লোড় করার কথা। ঘটনাচক্রে তাঁর কপালে উল্টোটাই ঘটছে।

'হতভাগা শিবে কোতায়?' প্রায় হুঙ্কারের সুরে বললেন অঘোরসুন্দরী।

'একুনি বেইরে গেল। মা আমার কী হবে? দুকুরে উনি না গেলে ও বাড়িতে আমি মুক দেকাব ক্যামন করে?'

'যাবে না মানে? ওর ঘাড় যাবে। তুই কাঁদিস না মা।'

হাটখোলার মুখুজ্জেদের বাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্নে গেছিলেন অঘোরসুন্দরী। সেখানে কৃষ্ণভামিনীকে দেখেই পছন্দ করে ফেলেন। সেদিনই ঠিক করে ফেলেন, কনিষ্ঠ পুত্র শিবদাসের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে। কতই বা বয়স তখন কৃষ্ণভামিনীর! নয় পেরিয়ে দশ। বাড়ি ফিরে অঘোরসুন্দরী আর দেরি করেননি। জ্যেষ্ঠপুত্র হরিদাসকে ডেকে বলেন, 'শিবের বিয়ের জোগাড়যন্তর কর। আমি মেয়ে পচুন্দ করে এয়েচি।'

শিবদাস মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ-বাইশ। ফুটবল খেলছেন এরিয়ান ক্লাবে। খেলা শেখেন দুখীরাম মজুমদারের কাছে। কিন্তু তাঁর আপত্তি টিকবে কেন? অঘোরসুন্দরীর কথা অগ্রাহ্য করেন, এমন সাধ্য বিপ্রদাস কুটিরের কারওর নেই। বস্তুত শ্যামবাজার অঞ্চলে অঘোরসুন্দরীকে সবাই চেনেন। আড়ালে তাঁকে সবাই বলেন বাঙালগিন্নি। ভাদুড়ি পরিবার বাঙালদের দেশ থেকে এসেছে বলে। তবে সবাই ওঁকে সম্মান করেন। বামুন ঘরের বিধবা বলে তো বটেই। অঘোরসুন্দরীর দাপট অন্য কারণেও। শ্যামবাজার-ফড়েপুকুর অঞ্চলে অনেক পরিবারের টিকিই তাঁর কাছে বাঁধা। কেননা, গোপনে তিনি বন্ধকের কারবার করেন।

পাঁচ-পাঁচটা জোয়ান ছেলে অঘোরসুন্দরীর। ছিল ছ'জন। একজন অল্প বয়সে মারা গেছেন। এখন ভরন্ত সংসার। সব ছেলেই রোজগেরে। দোষের মধ্যে ফুটবল খেলা নিয়ে সব ছেলেই পাগল। কী যে একটা খেলার চল হয়েছে ইদানীং! প্রতিবেশীদের মুখে অঘোরসুন্দরী শুনেছেন, একটা চামড়ার বল নিয়ে নাকি গোরাদের সঙ্গে প্রায়দিনই ছেলেরা লাথালাথি করতে যায়। বল নাকি গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি। কী অধম্মের কতা! গোমাতা,

তার চামড়া নিয়ে খেলা? বড় ছেলে হরিদাসকে খেলাটা ছাড়িয়ে ছিলেন মাথায় দিব্যি দিয়ে। মেজ দ্বিজদাস, সেজ রামদাসও খেলা ছেড়ে দিয়েছে। ছোট দু'জনে—বিজে আর শিবে সে পাত্তর নয়। তুলনায় বিজেটা মহা বদমাশ। কোনও কথা শোনে না।

ছোটবউ কৃষ্ণভামিনীর মুখে কথাটা শুনে অঘোরসুন্দরী রেগেছেন। সামান্য একটা খেলা। তার জন্য আত্মীয়তা নষ্ট করতে হবে, এ কেমন ধারার কথা? স্থান-কাল-পাত্র ভুলে তিনি গর্জে উঠলেন, 'চাঁড়ালটা গেল কই? ওর বল খেলা আজ আমি ঘুচিয়ে দিচ্চি। এই যা তো... গিয়ে ডেকে আন তো...বাঁদরটা একনও বাইরের ঘরে আচে কি?'

কথাগুলো বলতে বলতেই খাট থেকে নেমে পড়লেন অঘোরসুন্দরী। প্রত্যহ এই সময়টায় তিনি গঙ্গাস্নানে যান। পালকি ঠিক করে দিয়েছেন দ্বিজদাস। যাতে মায়ের কষ্ট না হয়। বাইরে সেই পালকিওয়ালা এসে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গাস্নানের কথা অঘোরসুন্দরী ভুলে গেছেন। চাবির গোছা পিঠে ফেলে তিনি দ্রুত পায়ে বারমহলের দিকে এগোলেন। মুখে বিড়বিড় করতে করতে, 'শয়তান ছেলে। দাঁড়া, তোর একদিন কী আমার একদিন।'

অঘোরসুন্দরী এখন বেশ স্থূলকায়া। তাঁর শরীরের আড়ালে পড়ে গেছেন কৃষ্ণভামিনী। শাশুড়ির পেছন পেছন তিনি চোখ মুছতে মুছতে এগোচ্ছেন। সিঁড়ির গোড়ায় এসে তিনি থমকে গেলেন। বারমহলে বাড়ির বউ-ঝি-দের যাওয়ার নিয়ম নেই। মা তা হলে কুরুক্ষেত্তর করে ছাড়বেন।

স্নান সেরে তখন সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠছেন চারুবালা। দ্বিজদাসের স্ত্রী, শিবদাসের মেজ বউদি। হাতে তাঁর ভিজে শাড়ি-সেমিজ। অঘোরসুন্দরীর রাগী মুখ দেখে চারুবালা বুঝতে পারলেন, কিছু একটা হয়েছে। পেছনেই ছোট জা কৃষ্ণভামিনী। তার চোখ ফোলা ফোলা। ছোট জা-কে খুব স্নেহ করেন চারুবালা। শুধু বোনের বয়সি বলেই নয়, কৃষ্ণভামিনী চিররুগ্না বলে। এ বাড়ির বউ হয়ে আসা ইস্তক তাঁকে খুব কম সময়ই সুস্থ দেখেছেন চারুবালা। লঘুপায়ে কয়েক ধাপ উঠে চারুবালা জিজ্ঞেস করলেন, 'কানচিস কে র‍্যা বোনটি। মা কিচু বলেচে?'

উদ্‌গত কান্না রোধ করতে করতে কৃষ্ণভামিনী নেতিবাচক ঘাড় নাড়লেন।

'তা'লে কী হয়েচে আমায় বল সোনা। শিবে কিচু কয়েছে?'

এ বার মুখ খুললেন কৃষ্ণভামিনী। নাকি স্বরে বললেন, 'মিনালের আজ আইবুড়ো ভাত। বাবামশায় কত করে বলে দেছল, সক্কালবেলায় জোড়ে যেতে। আর উনি বলচেন কী না, বিকেলে বল খেলা আচে। সন্ধে বেলার আগে উনি ও বাড়িতে যেতে পারবেন না। আমি একা গেলে ও বাড়িতে কুটুমরা কী বলবে জানো, সোয়ামীর সঙ্গে আমার মিলমিশ নেই। কী হবে দিদি?'

কথা বলার ধরন দেখে হেসে ফেললেন চারুবালা। তাঁর নিজের জীবনেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। একটা সময় দ্বিজদাসও মোহনবাগানে খেলতেন। বিয়ের আগে চারুবালা বেথুন স্কুলে পড়তেন। এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবি ঠাকুরের নভেল পড়েন। অন্দরমহলে থাকলেও তিনি মোটামুটি বাইরের খবর রাখেন। মেয়েদের সখী সমিতির মেম্বার। স্বদেশি আন্দোলনকে সমর্থন করেন। তিনি জানেন, ইদানীং ব্যাটাছেলেদের বল

খেলার খুব নেশা হয়েছে। এই সুতানুটিতেই অনেক কেলাব হয়েছে। চারুবালার এক দূরসম্পর্কের মামা থাকেন বেহালা-বড়শের দিকে। নাম মন্মথ গাঙ্গুলি। তাঁরও একটা কেলাব আছে।

ভাসুর হরিদাস আর স্বামী দ্বিজদাসের বল খেলার ভীষণ নেশা ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে ওঁরা খেলতে যেতেন বাড়ির কাছে পান্তির মাঠে। তারপর ওঁরা নিয়ে যেতে শুরু করলেন ভাই রামদাসকে। খেলার মাঠ থেকে প্রায়ই ওঁরা চোট আঘাত নিয়ে ফিরতেন। তখন শাশুড়িকে লুকিয়ে স্বামীর পায়ে চুন-হলুদ গরম করে লাগিয়ে দিতেন চারুবালা। বল খেলা নিয়ে পাগলামি দেখে একদিন স্বামীকে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি, 'কেলাব মানে কী?' বউয়ের অনাবশ্যক কৌতূহল দেখে দ্বিজদাস রেগে যাননি। উল্টে, সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মোহনবাগান কেলাবের নামটা সেদিনই প্রথম শোনেন চারুবালা। শ্যামবাজারের মিত্তিররা, বাগবাজারের সেন আর শ্যামপুকুরের বোসরা মিলে নাকি এই মোহনবাগান কেলাব তৈরি করেছেন।

বল খেলা নিয়ে মা তখন কিছুই জানতেন না। বিকেলবেলায় খেলতে যাওয়ার আগে দ্বিজদাস আর রামদাস মায়ের কাছে গিয়ে বলতেন, বিজে আর শিবেকে নিয়ে শ্যাম পার্কের দিকে ঘুরতে যাচ্ছেন। কিন্তু মাঠে পৌঁছে দুইভাই খেলতে নেমে যেতেন। আর তাঁদের জামা-কাপড় আগলাতেন বিজে আর শিবে। চারুবালা কিন্তু একদিন সবই জেনে যান, তাঁর মামার কাছ থেকে। কোনও একটা অনুষ্ঠানে, এক ঘর কুটুমের সামনে মন্মথমামা খুব প্রশংসা করেছিলেন দ্বিজদাসের। গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল চারুবালার। যাক, বল খেলার নেশাটা তা হলে খারাপ কিছু নয়।

এ সব পনেরো-ষোলো বছর আগেকার কথা। এখন লুকোচুরির কিছু নেই। বিপ্রদাস কুটির নামকরা বাড়ি। সবাই জানেন, এ বাড়িতে বিজয়দাস আর শিবদাসের মতো ফুটবলার থাকেন। ক্রন্দনরতা ছোট জায়ের দিকে তাকিয়ে এক ধরনের মমত্ব অনুভব করলেন চারুবালা। বললেন, 'বোন, মাকে কেন এ সব কথা কইতে গেলি। মা বকাবকি করলে হয়তো শিবে আরও ক্ষেপে যাবে। হয়তো সাঁতরাগাচি যাবেই না। নীচে কী হচ্চে, চ গিয়ে দেকে আসি।'

ভিজে শাড়ি-সেমিজ টুলের ওপর রেখে দিলেন চারুবালা। পরে শুকুতে দেবেন। পা বাড়িয়ে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণভামিনী তখনও দাঁড়িয়ে। তাই তিনি তাড়া লাগালেন, 'কই, চ। একুনি লাবণ্যের আসার কতা। সে যদি এসে দেকে বাড়িতে দক্ষযক্ষ হচ্ছে, কী ভাববে বল তো?'

লাবণ্য মানে সখী সমিতির কর্মী লাবণ্যপ্রভা মিত্র। পর্দানসীন মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে সখী সমিতি। সেই সঙ্গে সমাজের অসহায় মেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্পও। লাবণ্য নিজে বনেদি পরিবারের মেয়ে। সুন্দরী ও স্বাধীনচেতা। বয়স উনিশ বছর, কিন্তু বিয়ে করেনি দেশের কাজ করবেন বলে। চারুবালা শুনেছেন, মেয়েটা না কি গোপন সংগঠন ভারতমাতা সভারও মেম্বার। সপ্তাহে দু'দিন এ বাড়িতে আসেন লাবণ্য। সুতো কাটার দিশি কল দিয়ে গেছেন। এ বাড়ির মেয়েরা সময় পেলে সুতো

কেটে রাখেন তাঁর জন্য। বিপ্রদাস কুটিরের সবাই খুব পছন্দ করেন লাবণ্যকে। একমাত্র অঘোরসুন্দরী ছাড়া। কথায় কথায় তিনি বলেন, 'ধিঙ্গি মেয়ে।'

শিবদাসের কী হাল হল, তা দেখার জন্য তাড়াতাড়ি চারুবালা আর কৃষ্ণভামিনী নীচে নেমে এলেন। উঠোন পেরিয়ে বারমহলের দরজার সামনে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে আঁতকে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন, ছড়ি হাতে টুপি মাথায় এক ফিরিঙ্গি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি কী যেন বলছেন। আর উল্টো দিকের দরজায় একপাশে ঘোমটা টেনে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছেন শাশুড়ি মা। বাড়িতে জলজ্যান্ত সাহেব দেখে ভেতরেও চলে আসতে পারছেন না। সুতানুটি অঞ্চলে তখন সাহেবদের দেখাই যেত না। তখন বাঙালির অন্দরমহলে লালমুখো সাহেব মানে, গরু খেকো বাঘ। স্বদেশি আন্দোলন দমন করার জন্য সাহেবরা যতটুকু অত্যাচার করত, তা দ্বিগুণ পল্লবিত হয়ে ঢুকত বাঙালির অন্দরমহলে। অঘোরসুন্দরী যে সাহেব দেখে ভয় পাবেন, সেটাই স্বাভাবিক।

অস্বস্তিকর এই পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ উদয় হলেন বিজয়দাস। ঘরে ঢুকে ইংরেজ ভদ্রলোককে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। হোলি ল্যাংডেন। ওয়েলিংটন ক্লাবের কর্তা। সরকারের আবগারি দফতরের অফিসার। ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের মতো নন। শোনা যায়, হোলি সাহেব এক হিন্দু রমণীকে বিয়ে করেছেন। মোহনবাগানের খুব সাপোর্টার। অবাক হয়ে বিজয়দাস বললেন, 'কী ব্যাপার হোলি সাহেব? টেক ইওর সিট প্লিজ। আই অ্যায়াম রিয়েলি সারপ্রাইজড টু সি ইউ হিয়ার।'

হোলি সাহেবের হাতে তখনও টুপি ধরা। সাদা পাথরের টেবলে সেই টুপি রেখে বাংলায় তিনি বললেন, 'আপনার পরিবারের এই প্রবীণ মহিলাকে আমি শ্রদ্ধা জানাইতেছিলাম।'

অঘোরসুন্দরীকে প্রথমে বিজয়দাস দেখেননি। চোখে পড়তেই তিনি বললেন, 'মাই মাদার।'

হোলি সাহেব ফের শরীর ঝুঁকিয়ে বললেন, 'আমার শ্রদ্ধা জানিয়েন।'

যাঁর উদ্দেশে বললেন, তিনি একবর্ণও বুঝতে পারলেন কি না, বোঝা গেল না। সেটা বুঝে বিজয়দাস খুব মজা পেলেন। অমন রাশভারি মা, তাঁর সঙ্গেও মাঝে মাঝে দুষ্টুমি করতে ছাড়েন না বিজয়দাস। বললেন, 'সাহেব বলচে, তোমার ছেলেরা এত ভাল ফুটবল খেলে...তোমায় সামনে পেয়েচে, একবার পেন্নাম করবেই। ভালয় ভালয় ভেতরে যাও। না হলে কিন্তু তোমায় ছুঁয়ে দেবে বলচে।'

কথাটা শোনামাত্র 'ও মাগো' বলে অঘোরসুন্দরী বিদ্যুৎবেগে ভেতরে চলে গেলেন। আর তাঁর ত্রস্ত ভাব দেখে হেসে ফেললেন বিজয়দাস। সাহেবরা ম্লেচ্ছ, গোমাংস খায়। এক ব্রাহ্মণ বিধবার কাছে তার থেকে অপবিত্র আর কী হতে পারে। বাড়ির ভেতরে গিয়েও অঘোরসুন্দরী থরথর করে কাঁপছেন। চারুবালাকে দেখে তিনি বললেন, 'এই বেহারীকে পালকি তৈরি রাকতে বল। এখুনি গঙ্গায় গে নেয়ে আসতে হবে। আমি ফেরার আগেই গঙ্গার জল দিয়ে পরিষ্কার করে দিস বারমহল। আজ বাড়িতে আসুক শিবে। ওর একদিন কী আমার একদিন।'

শুনে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলেন কৃষ্ণভামিনী।

(চার)

প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে প্র্যাকটিস চলছে মোহনবাগান টিমের। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ-রোদের খেলা চলছে। মনে মনে বৃষ্টিটা চাইছিলেন শিবদাস। বৃষ্টিভেজা মাঠ পিচ্ছিল হয়ে যায়। খালি পায়ে খেলতে অসুবিধে হয়। শিবদাস তাঁর টিমের এই দুর্বলতাটা ভাল করে জানেন। শুকনো খটখটে মাঠে সাহেবদের কোনও টিমকে তিনি ভয় পান না। শুকনো মাঠে ক্যালকাটা, ডালহৌসির মতো শক্ত টিমগুলোকে এর আগে তিনি হারিয়েওছেন। কিন্তু বৃষ্টি হলেই মোহনবাগান স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারে না। তাঁর টিমের একজন বাদে বাকি সবাই যে খালি পায়ে খেলেন। সেই একজন হলেন সুধীর। টিমের লেফট ব্যাক। তাই যে ম্যাচের আগে বৃষ্টি হয়, শিবদাস খুব চিন্তায় থাকেন।

শিবদাস খেলা শিখেছেন এরিয়ান ক্লাবের দুখীরাম মজুমদারের কাছে। দুখীরাম চান, বাঙালিরা ফুটবল খেলাটা খেলুক সাহেবদের মতো বুট পরে। বারবার তিনি বলেন, বুট পরে না খেললে সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না। কিন্তু খালি পায়ে খেলা বাঙালিদের অভ্যেস হয়ে গেছে। তাতে বল কন্ট্রোলে নাকি অনেক সুবিধে হয়। সোল টান দিয়ে সাহেবদের ভড়কি দেওয়া যায়। ট্যাকল করার সময় যাতে সাহেবদের বুটে চোট আঘাত না লাগে, তার জন্য পায়ে শাড়ির পাড় জড়িয়ে নাও। তা হলেই হবে। সিনিয়র প্লেয়াররা অনেকেই সুধীরকে টিটকিরি দিতেন। 'ও ফুটবল খেলে নাকি? ও তো খেলে বুটবল।'

দুখীরামবাবুর কথায় শিবদাস কিছুদিন বুট পরে খেলা প্র্যাকটিস করেছিলেন। কিন্তু ঠিক সুবিধে করতে পারেননি। বুটের ওজন তো বটেই, তার ওপর দামও বেশি। হাল ছেড়ে দিয়ে শিবদাস শেষ পর্যন্ত খালি পায়েই ফিরে যান। শিবদাস মানেন, সুধীর বুট পরে খেলেন বলে অনেক নির্ভয়ে খেলতে পারেন। আসলে সুধীর খেলা শিখেছেন ন্যাশনাল এসি-তে। মন্মথবাবুদের সঙ্গে। কেল্লার শ্রফশায়ার রেজিমেন্ট ফুটবলে টিমের সঙ্গেও ন্যাশনাল নিয়মিত খেলে। মন্মথবাবুরা পুরো টিমটাকেই তৈরি করেছেন অন্যভাবে। ওঁদের টিমের সবাই বুট পরে খেলেন। ওঁদের ফিজিক্যাল ট্রেনিংও আলাদা ধরনের। মন্মথবাবুরা মনে করেন, সাহেবদের খেলায় সাহেবদের হারাতে গেলে...আগে শরীরটাকে শক্তপোক্ত করতে হবে। এই কথাটা অবশ্য শৈলেনবাবুও বলে থাকেন। তিনি ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টের সুবেদার মেজর। আর্মির ফিজিক্যাল ট্রেনিং কোর্স তিনিও চালু করে দিয়েছেন মোহনবাগানে।

সূর্য মেঘের আড়ালে। প্র্যাকটিস করার ফাঁকেই শিবদাস দেখলেন, লাটসাহেবের বাড়ির দিক থেকে শৈলেনবাবু আসছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মণিলাল সেন আর মিত্তিরবাড়ির আরও দু' তিনজন। ওঁদের একটু পেছনেই হেঁটে আসছে নিবারণ। তার কাঁধে বড় একটা ঝোলা। প্র্যাকটিসে যেদিন শৈলেনবাবু আসেন, প্লেয়ারদের জন্য সেদিন লেমনেড, ফল আর সাহেবপাড়ার কেক নিয়ে আসেন। আজও বোধহয় এনেছেন। আজ একটু তাড়াতাড়িই প্র্যাকটিস শেষ করে দেবেন ভেবেছিলেন শিবদাস। কেননা, শ্যালিকা মৃণালিনীর বিয়ে। শ্বশুরবাড়ি সাঁতরাগাছিতে যেতে হবে। বাড়িতে এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে অশান্তি হয়ে গেছে

দুপুরে। কিন্তু শৈলেনবাবু এসে যাওয়ায় বোধহয় তাড়াতাড়ি প্র্যাকটিস গোটানো সম্ভব হবে না। টিম নিয়ে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সে ব্যাপারে কথা কইতে হবে সেক্রেটারির সঙ্গে। টিমের অন্য প্লেয়ারদের সামনে আজই সমস্যার সমাধান করে নেওয়া দরকার।

কাছে এসে শৈলেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার শিবদাস? আজ বিকেলে প্র্যাকটিস?'

মোহনবাগানের প্র্যাকটিস সাধারণত সকালের দিকে হয়। প্লেয়াররা যে-যাঁর বাড়ি থেকে ধর্মতলা অবধি আসেন ট্রামে করে। প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুতে পোশাক বদলে নেন। এই সুবিধেটুকু করে দিয়েছেন ভূপেনবাবু। শিবদাস সেই কারণেই মনে মনে তাঁর কাছে ঋণী। সকালে প্র্যাকটিস সেরেই প্লেয়াররা কেউ চলে যান কলেজে, কেউ আপিসে। কিন্তু সকালের বদলে বিকেলে অনুশীলন করার ভাবনাটা শিবদাসের মাথায় এসেছে অন্য কারণে। তিনি বললেন, 'আজ্ঞে, সকালের দিকে বাতাসে হিউমিডিটি লেভেল বেশি থাকে। শরীল থেকে অনেক বেশি ফ্লুইড বেরিয়ে যায়। কিন্তু শিল্ডের সময় সেটা আমি চাইচি না কো। শিল্ডে আমাদের ম্যাচ খেলতে হবে বিকেলের দিকে। অ্যাকচুয়াল টাইমে আমাদের ছেলেদের প্র্যাকটিস করানো দরকার। যাতে পুরো স্ট্যামিনা নিয়ে সবাই খেলতে পারে। সে কারণেই শিল্ডের ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভাবচি, বিকেলের দিকে প্র্যাকটিস রাকব।'

শুনে খুব প্রসন্ন হলেন শৈলেনবাবু। নাঃ, ঠিক লোকের হাতেই তিনি মোহনবাগানের দায়িত্ব দিয়েছেন। মাঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্কিল প্র্যাকটিস করছে প্লেয়াররা। কেউ শুটিং, কেউ বল জাগলিং, কেউ ড্রিবলিং করছে। চট করে চোখ বুলিয়ে...মাঠে কোথাও নীলমণিকে দেখতে পেলেন না শৈলেনবাবু। নীলমণি মানে নীলমণি দে। টিমের গোলকিপার। শিবদাসকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'নীলমণিকে দেখচি না যে? আসেনি?'

'না, ও শিল্ডে খেলতে পারবে না। কয়েকদিন আগে নীলমণির ঠাকুমা মারা গেচেন। একটা বচর ওকে কালাশৌচ পালন করতে হবে। চামড়ার বল ধরা নিষেধ।'

'কী বলচ তুমি শিবদাস! তা'লে গোলে খেলবেটা কে?'

'চিন্তা করবেন না। গোলে আমি একটা ভাল ছেলেকে নামাচ্চি। গৌরীবাড়ির দিকে থাকে। নাম হীরালাল মুকুজ্জে।'

শুনে নিশ্চিন্ত হলেন শৈলেনবাবু। তারপর বললেন, 'ভাল কতা, তোমাদের জন্য এক সেট নতুন জার্সি অর্ডার দিয়ে এসেছিলাম হোয়াইটওয়ে লেড'ল-তে। ওরা আজই ডেলিভারি দিয়েচে। জার্সিগুলো নিবারণ নিয়ে এসেচে।'

শুনে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন শিবদাস। অ্যাদ্দিন ক্লাবের জার্সি নিজেদের কিনে নিতে হত। আট আনা দিয়ে ক্লাবের মেম্বার না হলে টিমে খেলা যেত না। লেখাপড়ায় ভাল না হলে মেম্বার করা হত না। শৈলেনবাবু নিজে হঠাৎ হঠাৎ প্লেয়ারদের লাইনে দাঁড় করিয়ে, তাঁদের জেনারেল নলেজ টেস্ট করতেন। ক্লাবের টাকায় জার্সি পাওয়াটা বলা যেতে পারে উপরি পাওনা। খুশ খবরটা সবাইকে দেওয়া দরকার। শিবদাস বাঁশি বাজিয়ে প্র্যাকটিস থামিয়ে দিলেন। শৈলেনবাবুকে দেখতে পেয়ে প্লেয়াররা ছুটে এসে লাইন বেঁধে দাঁড়ালেন। আর্মি কমান্ডারের সামনে জওয়ানরা যেমনভাবে দাঁড়ান।

শিবদাস নতুন জার্সির কথা বলতেই সবাই উৎফুল্ল। হাফব্যাক নীলু...নীলমাধব ভট্টাচার্য রসিক ছেলে। সব সময় চনমনে। বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে বলে ওঁর কীর্তন গাওয়ার অভ্যেস আছে। কীর্তনের ঢঙে প্যারোডি গেয়ে, নিত্যিনতুন ছড়া বানিয়ে, মাঝে মধ্যে সবাইকে তিনি চাগিয়ে রাখেন। বিশেষ করে, নীলু পেছনে লাগেন রাইট ব্যাক ভুতি সুকুলের। নতুন জার্সির কথা শুনে শৈলেনবাবুর উপস্থিতি ভুলে গিয়ে নীলু ছড়া কাটলেন, 'কী মজা রে কী মজা...নিয়ে আয় আরশি, ভুতি সুকুল গায়ে চড়াবে ক্লাবের নতুন জার্সি।'

শুনে সবাই হাসছে। কড়া চোখে তাকাতে গিয়েও হেসে ফেললেন শিবদাস। সব সময় গম্ভীরমুখো হয়ে থাকা চলে না। প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্যই তিনি শৈলেনবাবুকে বললেন, 'প্লেয়ারদের ইন্সপায়ার করার জন্য আপনি কিছু বলুন স্যার।'

শুনে চোখ থেকে চশমাটা খুললেন শৈলেন বসু। রুমাল দিয়ে চশমাটা মুছতে মুছতে বললেন, 'বলার আর কী আচে শিবদাস। এই তো আসার সময় মতিলালের মুখে শুনলুম, কুলতলির মাঠে ওরা আমাদের নিয়ে কী ছড়া বেঁধেছে, জানো? বামন হয়ে চাঁদ ধরবে—এই তার কামনা রে, এই তার কামনা, মোহনবাগান শিল্ড নেবে, এই তার বাসনা রে এই তার বাসনা।'

শুনে প্লেয়াররা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন নিজেদের মধ্যে। পরিবেশটা হঠাৎ বদলে গেল। রাগে থমথম করে উঠল সব ক'টা মুখ। সেদিকে তাকিয়ে চশমাটা ফের পরে নিলেন শৈলেনবাবু। তার পর বললেন, 'আজ সকালের কাগজটা কি দেকেচ? খেলার পাতায় সাহেবরা একটা খবর লিখেচে। শিল্ডে খেলার সুযোগ দিয়ে বাবুদের দলকে নাকি অহেতুক তোয়াজ করা হচ্চে। বাবুদের দল বলতে আমরা। সাহেবরা এমন আনকালচার্ড, কাগজে আমাদের ক্লাবের নামটা উল্লেখ করতেও ওদের গায়ে বাঁধে। হোলি সাহেব আমাকে উইশ করতে এসেছিলেন। বলে গেলেন, ফার্স্ট রাউন্ডেই আমাদের হারিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। এমন রেফারি দেবে, যে কি না যখন তখন পেনাল্টি বসিয়ে দিতে পারে। সুকুল আর সুধীর... তোমরা সাবধান। বক্সের মধ্যে এমন কোনও ট্যাকল কোরো না, যাতে রেফারি পেনাল্টি দেওয়ার সুযোগ পায়।'

সুধীর বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'লক্ষ্মীবিলাস কাপের কথা মনে থাকে যেন। পাঁচ-পাঁচটা দিন ড্র করে ফাইনাল ম্যাচটা জিতলুম আমরা। আর হার সহ্য করতে না পেরে, ম্যাচের পর আমাদের হাত থেকে জোর করে কাপটা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন গর্ডন হাইল্যান্ডার্সের পল্টনরা। এই সব অবিচার কাঁহাতক সহ্য করা যায়? কদ্দিন ওরা গা জোয়ারি করে জিতবে? বদলা নেওয়া দরকার। সারা বাঙালি জাতি আজ আমাদের দিকে তাকিয়ে আচে। খেলার মাঠে আমরা যদি ওদের হারাতে পারি, তা'লে সেটা ট্রিমেন্ডাস আত্মবিশ্বাস জোগাবে বাঙালিকে। শুধু বাঙালি কেন, সারা ভারতবাসী বিশ্বাস করতে শুরু করবে, এই দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো সম্ভব।'

স্যারের শেষদিকের কথাগুলো মাথায় ঢুকতে একটু সময় নিল। তার পরই শিবদাস

বলে উঠলেন, 'আমরা জিতব স্যার। কতা দিচ্চি। যতক্ষণ শরীলে রক্ত থাকবে, ততক্ষণ লড়ে যাব।'

কথাগুলো শিবদাস আত্মা থেকে বলছেন। সেটা কণ্ঠস্বরে টের পেলেন শৈলেনবাবু। তিনি বললেন, 'পরশু আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ। কাল সকালে একবার মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আসতে হবে শিবদাস। বিজয়দাস দলের সব থেকে সিনিয়র। ও যাবে ঠনঠনে কালীবাড়িতে পুজো দিতে। যুদ্ধে লড়াই করতে নামার আগে শক্তির আরাধনা করে নেওয়া দরকার। বঙ্কিম চাটুজ্জেমশায় বারবার এ কথা লিখচেন। মাতৃবন্দনা ছাড়া এ যুদ্ধে জেতা যাবে না। মনে করো, স্বাধীনতা যুদ্ধে তোমরা এই এগারো জনই সৈনিক। মাকে শৃঙ্খলামুক্ত করার দায় তোমাদেরই হাতে। আমি আর কিচু বলতে চাই না। তোমরা কেউ যদি কিচু বলতে চাও, বলতে পারো।' কথাগুলো বলেই তিনি শিবদাসের মুখের দিকে তাকালেন। প্লেয়াররা সব চুপ। কেউ কোনও কথা বলার আগেই নীলু গেয়ে উঠলেন—

'ব্যাক ফরোয়ার্ড সমান খেলি
যমের দোসর দু'ধারে
আমাদের আর কে পারে॥
এগারো জনে সাথ সাথ
খেলায় করি বাজিমাত
পাস করি বল শুরু করি
সেন্টার থেকে কর্নারে
আমাদের আর কে পারে॥
ফিল্ডে নামলে শিল্ডটি নেব
কেয়ার কি করি কারে
আমাদের আর কে পারে
হিপ হিপ হুররে॥'

নিজেদের উদ্দীপ্ত করার জন্য এই গানটা সকলে মিলে প্লেয়াররা গাইছেন। সমবেত কণ্ঠস্বর বাতাস ভেদ করে চলে যাচ্ছে চৌরঙ্গি পর্যন্ত। ঠিক এই সময় মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্য। ঘামে ভেজা মুখগুলো গোধূলির নরম রোদ্দুরে উজ্জ্বল। দেখে রোম খাড়া হয়ে গেল শিবদাসের। তিনি হুঙ্কার দেওয়ার মতো করে বলে উঠলেন, 'বন্দে মাতরম।'

(পাঁচ)

ঠনঠনের কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছেন শিবদাস। সঙ্গে অঘোরসুন্দরী। মোহনবাগানের জন্য পুজো দিতে যাওয়ার কথা ছিল বিজয়দাসের। কিন্তু তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেনেটিতে তাঁর দোকানে গেছেন, কী একটা আর্জেন্ট কাজে। বেরনোর সময় বাড়িতে শিবদাস এমন ভাব করেছিলেন, যেন মায়ের জন্যই পুজো দিতে যাচ্ছেন।

কিন্তু আসল কথা আর চাপা রইল কই? মন্দিরের ঠিক উল্টোদিকে, দেববাড়ির ছেলেরা শিবদাসকে খেলার মাঠে দেখেছেন। তাঁদেরই একজন অতীন্দ্র হাইকোর্টে ওকালতি করেন। মন্দিরে শিবদাসকে দেখে তিনি খেলার কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। শিল্ডে মোহনবাগানের খেলা নিয়ে যে সাধারণ লোকের মধ্যে বেশ আগ্রহ সঞ্চার হয়েছে, সেটা মাঠে নামার আগের দিনই টের পেয়ে গেলেন শিবদাস।

দেববাড়ির ছেলেটাই মাকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে যত্নআত্তি করলেন। পুরোহিত মশায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পুজোর শেষে তুলে দিয়ে গেলেন কেরাঞ্চি গাড়িতে। ফিরে যাওয়ার আগে বললেন, 'এ বার কিন্তু শিল্ড জেতা চাই-ই চাই বিজেদা। আমরা কিন্তু আপনাদের দুই ভাইয়ের মুকের দিকে তাকিয়ে আচি। শিল্ড না পেলে কোর্টে সাহেবরা আমাদের দুয়ো দেবে।'

শুনে শিবদাস মনে মনে হাসলেন। খেলার মাঠে সবাই যে ভুলটা করে, অতীন্দ্রও সেই ভুলটাই করেছেন। তাঁকে বিজয়দাস বলে ভেবে নিয়েছেন। আসলে দুই ভাইয়ের চেহারার এত মিল, অনেকেই এই ভুলটা করে। এমন কী, খেলার সময় সাহেবরাও। এই ভ্রান্তিবিলাসের পুরো ফায়দাটা তোলেন দুই ভাই। টিমে বিজয়দাস খেলেন লেফট ইন সাইড। আর শিবদাস লেফট আউট। পাশাপাশি খেলার সময় সাহেবদের ঠকানোর জন্য দুইভাই ক্রমাগত জায়গা বদল করেন। সাহেবরা ভাবেন, শিবদাসকে মার্ক করছেন। আসলে তখন মার্ক করছেন বিজয়দাসকে। সেই ফাঁকে গোল করে আসেন শিবদাস। অতীন্দ্রর ভুল ভাঙানোর জন্যই শিবদাস বললেন, 'আমি কিন্তু বিজেদা নই। আমি শিবেদা।'

পুজো দেওয়ার সময় মোহনবাগানের নামে সংকল্প করেছেন শিবদাস। সেটা মায়ের নজর এড়ায়নি। তার ওপর অতীন্দ্র হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে গেছেন। মায়ের মুখ থমথমে। গাড়ি ফড়েপুকুরের দিকে যাওয়ার সময় মা হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'দেববাড়ির ছোঁড়া তোকে কী বলে গেল র‍্যা?'

'শিল্ড জেতার কথা বলল মা।'

'সেটা আবার কী?'

দুষ্টুমি মাথায় চাপল শিবদাসের। বললেন, 'বিজেদার আফিমের ব্যবসায় নিলাম হয় মা। তাকে বলে শিল্ড। নিলামে হেরে গেলে ওদের ব্যবসা লাটে উঠবে।'

'সত্যি বলচিস?' অঘোরসুন্দরীর চোখে অবিশ্বাস। জেরা করার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'তবে যে ছোঁড়া বলল, ফিরিঙ্গিরা ওকে দুয়ো দেবে।'

'দেবেই তো। নিলামের সময় শিল্ড কেনার জন্য তো ফিরিঙ্গিরাও আসে। ডারহ্যাম সাহেব, ডালহৌসি সাহেব, ক্যালকাটা সাহেব, সেন্ট জেভিয়ার্স সাহেব, মিডলসেক্স সাহেব, গর্ডন হাইল্যান্ডার্স সাহেব...কত নাম বলব মা? নিলামের সময় জিতলে দুয়ো দেয়। হারলে মারধর করে।'

'কী অলক্ষুণে কতা র‍্যা। না না, শিল্ডে তোর হারা চলবে না বাবা। তোকে জিততেই হবে।'

শুনে ফের মনে মনে হাসলেন শিবদাস। মাকে একটু ঠকানো হল। তাতে কী, আশীর্বাদটা

তো পাওয়া হয়ে গেল। বছর কয়েক বিজেদা আর ভুতি সুকুল মিলে আফিমের ব্যবসা করছেন। তাঁদের দোকান পেনেটিতে। বাঙালিদের মধ্যে আফিম খাওয়ার নেশাটা ইদানীং প্রবল। বিশেষ করে, বয়স্ক লোকেদের মধ্যে। তাই মেসার্স সুকুল অ্যান্ড ভাদুড়ির ব্যবসা বেশ ভালই চলে। খোলাবাজারে আফিম পাওয়া যায় না। সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারের আবগারি বিভাগ মাসে একবার করে ব্যবসায়ীদের কাছে আফিম বিক্রি করে। একেক দফায় দু' তিন লাখ টাকার আফিম বিক্রি হয়। সেই আবগারি দফতরের বড়কর্তা হলেন হোলি সাহেব। তিনি শিবদাস বলতে পাগল। সত্যি বলতে কী, শিবদাসের অনুরোধেই হোলি সাহেব আফিম বিক্রির লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছেন সুকুল আর বিজয়দাসকে। তাঁর দৌলতেই বিজয়দাসরা করে খাচ্ছেন।

গাড়ি বিডন স্কোয়ারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে অঘোরসুন্দরী হঠাৎ বললেন, 'এখেনে কী হচ্চে রে শিবে? এত মানুষজন কী করছে?'

ডান দিকে তাকালেন শিবদাস। হেদুয়ার পুকুরে জল টলটল করছে। পাশের মাঠেই মেলার উদ্যোগ চলছে। মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। শিবদাস বললেন, 'স্বদেশি মেলা মা।'

হেদুয়ার মাঠে যে স্বদেশি মেলা হবে, সেটা বোসবাড়িতে শুনেছেন শিবদাস। বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতার নানা জায়গায় এই ধরনের মেলা হচ্ছে। গিরিশ পার্ক, হরিশ পার্ক, কলেজ স্কোয়ার, কুমারটুলি পার্কেও হয়েছে। এর উদ্যোক্তা ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কাকামশায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু খুব জড়িয়ে এই মেলার সঙ্গে। সাধারণ লোকের মধ্যে স্বদেশি চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই এই মেলা শুরু করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। বাংলাকে দু'ভাগ করার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাচ্ছেন ওঁরা। স্বদেশি মেলায় বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দেওয়ায় প্রচণ্ড সাড়া মিলেছে।

বিডন স্কোয়ারে একবার মেলা দেখতে এসেছিলেন শিবদাস আর অভিলাষ ঘোষ। মেলায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা... একবর্ণও বুঝতে পারেননি ওঁরা। কেননা বাঙালি হয়েও সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেছিলেন ইংরেজিতে। তবে লিয়াকৎ হোসেনের বক্তব্য শুনে গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেছিল দু'জনের। তার পর বিষণ্ণ সন্ধ্যায় উদাত্তকণ্ঠে চারণকবি মুকুন্দদাসের গান, 'ছেড়ে দে মা রেশমি চুড়ি, বঙ্গনারী, কভু হাতে আর পরো না।' উফ্, গান শুনে চোখে জল এসে গেছিল সেদিন শিবদাসের। আড়চোখে তাকিয়ে তিনি দেখেছিলেন অভিলাষও হাপুস নয়নে কাঁদছেন। অমন ডাকাবুকো ছেলে, তাঁর চোখেও জল! মনে আছে, বাড়ি ফেরার পথে অভিলাষ বলেছিলেন, 'দ্যাশের লেইগ্যা আমাগোও কিছু করা উচিত শিবেদা। এত লোক দ্যাশের লেইগ্যা প্রাণ দিতাসে। আমরাও বইস্যা থাকুম ক্যান?'

কথাটা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শিবদাস। ঢাকার ছেলে অভিলাষ। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়তে এসেছে। কতই বা বয়স হবে ওর? উনিশ-কুড়ি। ঝাড়া হাত-পা। ওর পক্ষে দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব। কিন্তু তিনি বিবাহিত। সংসারে জড়িয়ে পড়েছেন। এখন তাঁর পক্ষে সরাসরি আন্দোলনে নেমে পড়া সম্ভব নয়। যদিও তিনি চান দেশ থেকে ইংরেজরা বিতাড়িত হোক।

সাহেবদের অত্যাচার আর বরদাস্ত করা যাচ্ছে না।

আনমনা হয়ে অভিলাষের কথা ভাবছেন শিবদাস। হঠাৎ দেখেন, রাস্তা দিয়ে অভিলাষ হেঁটে যাচ্ছেন। সঙ্গে রয়েছে, ওঁরই বয়সি আরেকজন। ছেলেটাকে চিনতে পারলেন না তিনি। মায়ের কথা ভুলে গাড়োয়ানকে বলে উঠলেন, 'এই রোখকে। রোখকে।'

অকস্মাৎ গাড়ি থামানোয় হ্রেষাধ্বনি শুনে পিছন ফিরে তাকিয়েছেন অভিলাষও। শিবদাস তাঁকে বললেন, 'কোতায় যাচ্চিস?'

অভিলাষ বললেন, 'কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে একজনের বাড়িতে সিলাম। যাইতাসি বাদুড়বাগান মেসে। তুমি কোইথেইক্যা শিবেদা?'

'পুজো দিয়ে এলুম। আয়, উটে আয়। চল, আমাদের বাড়িতে চল।'

'না গো। কলেজ যাইতে অইব। তোমাগো বাড়িতে গেলে আমার দেরি হইয়া যাইব।' গাড়িতে ঘোমটা দিয়ে বসেছিলেন অঘোরসুন্দরী। এতক্ষণে খেয়াল করলেন অভিলাষ। কে, দেখেই বুঝতে পারলেন তিনি। হাতজোড় করে অভিলাষ বললেন, 'মা, আমার প্রণাম নিবেন।'

ঘোমটার ফাঁক দিয়ে কী যেন বললেন অঘোরসুন্দরী। সেটা শুনে শিবদাস বললেন, 'মা বলচেন, তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে তাপ্পর কলেজে যাবি।'

অপরিসর রাস্তা। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে পিছনের গাড়ি আটকে যায়। অথচ ব্যারাকপুর যাওয়ার রাস্তা এই একটিই। কথা বলার সময় ওঁরা লক্ষ করেননি, একটা সুদৃশ্য ফিটন গাড়ি ওঁদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার জন্য, অধৈর্য হয়ে কোচোয়ান ঘণ্টা বাজাচ্ছে। তার পিছনে আরও দু' তিনটে গাড়ি। পাশ ফিরে হঠাৎ শিবদাস দেখতে পেলেন, মদ্যপ এক সাহেব রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাল দিচ্ছেন অভিলাষের সঙ্গীকে। বোধহয় পিছনের গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন। তাঁর মুখে 'ব্লাডি নিগার' কথা শুনতে পেলেন শিবদাস। খেলার মাঠে প্রায়শই যা তাঁরা শোনেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ছেলেটি বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে যায়নি। পাল্টা তড়পাচ্ছে। দেখে থমকে গেলেন তিনি।

রোগা পাতলা একটা ছেলে। পরনে ময়লা ধুতি আর শার্ট। উস্কোখুস্কো চুল, সকালে বোধহয় চোখমুখেও জল দেয়নি। চেহারা দেখে মনে হয় না, ভদ্রঘরের। তার এত তেজ? চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। সাহেব ছেলেটার গলা টিপে ধরার পরও ভয় পায়নি। এমন তেরিয়া যে, সেও সাহেবের গলা টিপে ধরেছে। তাঁর সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন মেমসাহেব। ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন সাহেবকে। আশপাশে লোক জমে গেছে। সাহেবকে হেনস্তা হতে দেখে সবাই বেশ মজা পাচ্ছে। ছেলেটার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? সাহেব যদি গিয়ে পুলিশের কাছে কমপ্লেন করেন, তা হলে তো কেলেঙ্কারি হবে। শিবদাস একবার ভাবলেন, গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ছেলেটাকে সরিয়ে দেন। কিন্তু সঙ্গে মা আছেন। তার ওপর পুলিশের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লে শৈলেনবাবুর কাছে বকুনি খেতে হবে। তিনি চুপ করে ছেলেটাকে লক্ষ করে যেতে লাগলেন।

ছেলেটাকে কোনও রকমে, টেনে সরিয়ে আনলেন অভিলাষ। ঘটনা যাতে আর বেশিদূর না গড়ায়, তার জন্য সাহেবের কাছে মাফ চেয়ে, তাঁর গাড়িকে রাস্তা করে দিলেন। তার

পর শিবদাসকে বললেন, 'আপনে চইল্যা যান শিবেদা। বৈকালে মাঠে দেখা অইব খনে।'

মিনিট দশেকের মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে গেলেন শিবদাস। ছেলেটার কথা কিন্তু ভুলতে পারলেন না। এমন একটা পরিস্থিতিতে তিনি নিজেও একদিন পড়েছিলেন। ডালহৌসির সঙ্গে খেলা। সেন্টার হাফ স্টুয়ার্টকে স্লাইডিং ট্যাকল করেছিলেন। ছিটকে পড়ে গেছিলেন স্টুয়ার্ট। উঠেই তিনি গলা টিপে ধরেন শিবদাসের। বাবুদের খেলার অধিকার দেওয়া হয়েছে সেটাই যথেষ্ট। কোন সাহসে তারা সাহেব ফুটবলারকে ট্যাকল করছে! শিবদাসকে সেদিন বাঁচান দর্শকরা। দলে দলে তাঁরা মাঠে ঢুকে পড়েন। ছাতা আর লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করেন সাহেব ফুটবলারদের। ঘোড়পুলিশ চলে আসে। খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

সেদিন স্টুয়ার্টের গলা পাল্টা টিপে ধরতে পারেননি বলে একটা আফসোস ছিল শিবদাসের। সেটা আজ মিটে গেল। বাঙালি তা হলে জাগছে। ডাল-ভাত খেকো, আলসে, দুর্বল একটা জাত, কোণঠাসা হয়ে, পাল্টা মার দেওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। অভিলাষের সঙ্গী ছেলেটার পরিচয় জানা হল না। আজই প্র্যাকটিসের পর সেটা জেনে নেবেন। ভেবে রাখলেন শিবদাস। প্রসাদের চাঙাড়ি নিয়ে মা অন্দরমহলে চলে গেছেন। গাড়িভাড়া মিটিয়ে শিবদাস যখন বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন, এমন সময় পেছন থেকে ডাকলেন এক ভদ্রলোক। আগে কখনও তাঁকে দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না শিবদাস।

পরনে ফুলহাতা শার্ট আর ধুতি। পায়ে কালো শু। 'নমস্কার বিজেবাবু।'

আবার সেই ভুল! ফুটবল পাগল কেউ হবেন। সেটা ধরে নিয়ে শিবদাস কথা বলতে লাগলেন। এ কথা সে কথার পর ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'একটু আগে কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে যে দুটি ছেলের সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন, তারা কে বিজেবাবু?'

শিবদাস বললেন, 'একজন অভিলাষ ঘোষ। মোহনবাগানের প্লেয়ার। অন্যজনকে আমি চিনি না। কেন বলুন তো?'

'আপনার দাদা দ্বিজদাস আমার স্কুলমেট। তাই সাবধান করে দিতে...পিছু পিছু এলাম। অভিলাষ নয়, অন্য ছেলেটা গুপ্ত সমিতির মেম্বার। স্বদেশিদের হয়ে বোমা বানায়। অভিলাষকেও সে দলে টানছে। মানা করে দেবেন। না হলে পুলিশের গুলি খেয়ে অভিলাষও কোনওদিন মারা পড়বে।'

ভদ্রলোক কে, তা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হল না শিবদাসের। নিশ্চয়ই ইংরেজদের পা-চাটা পুলিশের চর। এঁদের গুলি করে মারা উচিত। জ্বলন্ত চোখে তিনি লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

(ছয়)

আজ সকাল থেকে একটু টেনশনে রয়েছেন শিবদাস। কৃষ্ণভামিনী উদরপীড়ায় অসুস্থ। বিয়েবাড়ির অনিয়ম তাঁর সহ্য হয়নি। ডাক্তার পথ্যি দিয়ে গেছেন। তাঁর ভার বড়বউদির হাতে দিয়ে শিবদাস বেরিয়ে পড়েছেন। আজ বিকেলে শিল্ডের প্রথম খেলা সেন্ট জেভিয়ার্সের বিরুদ্ধে। অফিস যাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। চিৎপুরে চিৎপুরেশ্বরী মাকে প্রণাম করে আসার জন্য বেরিয়ে শিবদাস হঠাৎ টের পেলেন বোসবাড়ির কাছাকাছি এসে

গেছেন। এ বাড়িতে তাঁর দ্বার অবারিত। বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন, বৈঠকখানায় শৈলেনবাবু মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন।

শিবদাস কিছু বলার আগেই শৈলেনবাবু বলে উঠলেন, 'খবরটা তোমার কাচে পৌঁচে গেচে তা'লে?'

কথাটা বুঝতে পারলেন না শিবদাস। বললেন, 'কী খবর স্যার?'

কোনও কথা না বলে শৈলেনবাবু একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন। দ্রুত চোখ বোলালেন শিবদাস। তাতে লেখা, 'আজকের ম্যাচে খেলতে পারছি না। প্রিন্সিপালের নির্দেশ, কলেজ আওয়ার শেষ হওয়ার আগে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না। আগে বেরিয়ে এলে, কলেজ থেকে সাসপেন্ড করা হবে। বিনীত সুধীর চ্যাটার্জি।'

চিরকুটটা পড়ে চমকে উঠলেন শিবদাস। ভবানীপুরের এলএমএস কলেজে পড়ান সুধীর। তাঁর ক্লাস বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। কলেজ থেকে একটা দেড়টার সময় বেরতে না পারলে তো, তিনি খেলতেই পারবেন না? কেননা, খেলা আরম্ভ বেলা তিনটেয়। মোহনবাগান টিমের ডিফেন্সে সুধীর বিরাট ভরসা। তিনি টিমে যোগ দেওয়ার পর থেকে ক্লাবের ভাগ্য যেন খুলে গেছে। কোচবিহার কাপ, ট্রেডস কাপ, একের পর এক টুর্নামেন্টে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সুধীর খুবই পয়মন্ত প্লেয়ার। তাঁকে বাদ দিয়ে নামার কথা ভাবতেই পারেন না শিবদাস। চিরকুট পড়ে তিনি শৈলেনবাবুর দিকে তাকালেন। যা আশঙ্কা করছিলেন, তাই ঘটতে চলেছে। ষড়যন্ত্র তা হলে শুরু হয়ে গেছে। শৈলেনবাবু চেয়ার থেকে উঠে পায়চারি শুরু করলেন। তারপর বললেন, 'এ নিশ্চয়ই ম্যাকগ্রেগরের বদমাইসি। ব্যাটা আমার ওপর রাগ ফলাচ্চে। কী করা যায়, বলো তো শিবদাস?'

চিরকুট পড়ে শিবদাস একেবারে দমে গেছেন। সুধীর আসতে পারছে না, তার মানে... অভিলাষ, রাজেন আর কানুরও আসার সম্ভাবনা কম। তিনজনই কলেজে পড়েন। প্রথম দু'জন স্কটিশ চার্চ কলেজে, আর কানু প্রেসিডেন্সিতে। ম্যাকগ্রেগর সাহেব যদি সত্যিই শয়তানি করেন, তা হলে ওই তিনজনকেও আটকে দিতে পারেন। সাহেবদের লম্বা হাত। সর্বত্র ওঁদের লোক। দুই কলেজের প্রিন্সিপালকে টিপে দিলেই সর্বনাশ। বিকেল পাঁচটার আগে ওঁরা আর কলেজ থেকে বেরতে পারবেন না। এত যত্ন করে টিমটা তিনি তৈরি করলেন। অথচ তার চারটে প্লেয়ার খেলতে পারবেন না?

না, না, অভিলাষ, রাজেন আর কানুকে আটকানো দরকার। আজ যাতে ওঁরা কেউ কলেজে না যান, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কথাটা মনে হতেই তিনি বললেন, 'স্যার, বাদুড়বাগানের মেসে এখুনি লোক পাটান। অভিলাষরা যাতে কলেজে না যায়, সে কতা গিয়ে কেউ বলুক।'

পায়চারি থামিয়ে শৈলেনবাবু বললেন, 'শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে তোমায় ক'টা ম্যাচ জিততে হবে শিবদাস?'

'পাঁচটা ম্যাচ স্যার।'

'ফাইনাল কবে?'

'২৯ জুলাই।'

'তার মানে আজ থেকে কুড়ি দিন পর। এই তিনটে সপ্তাহ ক'বার তুমি ক'জনকে আটকাবে? তার চেয়ে আমি বলি কী, অন্য ক্লাব থেকে প্লেয়ার ধার নাও। তাঁদের রিজ়ার্ভে রাখো।'

এর আগেও অন্য ক্লাবের আনরেজিস্টার্ড প্লেয়ার টিমে নেওয়ার কথা বলেছেন শৈলেনবাবু। কিন্তু তাতে মন সায় দেয়নি শিবদাসের। ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। কুড়ি দিন কেন, দরকার হলে আরও বেশি সময় প্লেয়ারদের এক ছাতার তলায় রাখতে হবে। সে দিক থেকে বোসবাড়ি সব থেকে নিরাপদ জায়গা। সব প্লেয়ারকে এই কুড়িদিনের জন্য এখানে এনে রাখলে কেমন হয়? প্রথমেই এই যুক্তি না দিয়ে শিবদাস বললেন, 'কোন টিম থেকে প্লেয়ার নেবেন স্যার?'

'কেন আহিরীটোলা থেকে! শুনলুম, ওরা ক্যালকাটা ক্লাবকে এবার ওয়াক ওভার দিচ্চে। পুরো টিম করতে পারচে না বলে। ওদের প্রাণকেষ্ট দেকা করতে এয়েচিল, বলে গেল আমায়। ওদের টিম থেকেই দু' চারজনকে নিয়ে নাও না। আমার ভয় হচ্ছে কী জানো, মাঠে গিয়ে প্লেয়ার আসছে না দেকে... কোনও ম্যাচে আমাদের যেন ওয়াক ওভার দিতে না হয়।'

শিবদাস খুব বিনীতভাবে বললেন, 'আসলে কী জানেন স্যার, আমাদের টিমটা সেট হয়ে গেচে। এই টিমে অন্য কাউকে ঢোকালে রিদম নষ্ট হয়ে যাবে। তেমন হলে এক আধজন কম নিয়ে খেলতে রাজি আছি। কিন্তু সেট ভাঙা উচিত হবে না।'

'সুধীরের জায়গায় কাকে খেলাবে? ওর মতো পজিশনাল খেলা কি অন্য কেউ খেলতে পারবে? সুকুলটা এত অ্যাটাকে যায়, পেচনে কে রইল না রইল—মাথাও ঘামায় না।'

শৈলেনবাবুর কথা মন দিয়ে শুনলেন শিবদাস। অন্যায্য কিছু বলেননি। সুধীর একটু স্লো। টিমের অন্য প্লেয়ারদের যা দক্ষতা, তার ধারে কাছে আসেন না। কিন্তু সুধীর এমন চমৎকার পজিশন নিয়ে খেলেন, গোলকিপারকে তেমন কঠিন বল ধরতেই হয় না। তা ছাড়া সুধীর দলের একমাত্র বুট পরা প্লেয়ার। জলকাদার মাঠে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকেন। সুধীরের জায়গায় অন্য কোনও প্লেয়ারকে ডিফেন্সে রাখতে মন চাইছে না শিবদাসের। তিনি বললেন, 'একটা কাজ করলে হয় না স্যার। কাকামশায়কে বলুন না, যাতে তিনি এলএমএস কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে একবার কতা বলেন। উনি বললে সুধীরকে নিশ্চয়ই ওঁরা খেলার জন্য ছেড়ে দেবেন।'

'বলার তো চেষ্টা করচি। কিন্তু কংগ্রেসের স্বদেশি মেলা নিয়ে কাকামশায় এখন এমন ব্যস্ত, অন্য দিকে মন দেওয়ার সময়ই পাচ্চেন না। এই দ্যাখো না, সকাল থেকে ওঁর চেম্বারে ঢুকতেই পারচি না। সুরেনবাবু এয়েচেন। তাঁর সঙ্গে কাকামশায় মেলা নিয়ে কতা বলচেন।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শিবদাস বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না স্যার। মাঠে গিয়ে আমি ডিসিশন নেব। সুধীর যদি সত্যিই না আসতে পারে, তা'লে নীলুকে হাফব্যাক থেকে নামিয়ে লেফট ব্যাকে খেলাব। আর সামনের দিকটা আমরা বাকি ক'জন মিলে সামলে নেব। যদি খুব দরকার হয়, তা'লে ভোলানাথকে ফরোয়ার্ড লাইনে ইউজ করতে পারি।'

পরামর্শটা শৈলেনবাবুর অপছন্দ হল না। নীলু খেলে লেফট হাফে। শ্রীরামপুর কলেজ থেকে তিনিই নীলুকে ধরে এনেছিলেন। শিবদাস যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই নীলু সুধীরের জায়গায় মানিয়ে নিতে পারবে। শিবদাসের অসম্ভব ফুটবল বুদ্ধি। এরিয়ানের দুখীরাম মজুমদারের পর একমাত্র এই ছেলেটাই ফুটবল বোঝে। তাই শৈলেনবাবু তাঁকে ক্যাপ্টেন করেছেন। স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে শিবদাসকে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি বাড়ি যাও। কাকামশায়ের সঙ্গে আমি কতা বলচি। একুনি বাদুড়বাগানে নিবারণকে পাঠিয়ে দিচ্চি। দুকুর একটায় এখেনে চলে এসো। অন্যথা কোরো না।'

বেলা প্রায় ন'টা। রাজবল্লভ পাড়ার মোড় থেকে একটা কেরাঞ্চি গাড়ি ভাড়া করে চিৎপুরের দিকে রওনা দিলেন শিবদাস। চিৎপুরেশ্বরী মন্দিরের দিকে। ভাগ্যিস, আনমনে আজ বোসবাড়িতে গিয়েছিলেন। তাই সুধীরের সমস্যাটা আগেভাগে জানতে পারলেন। মন্দিরে যাওয়ার পথে শিবদাসের মন অবশ্য বলল, সুধীর আসবে। আসবেই। কলেজে ওর যা-ই হোক না কেন। এলএমএস কলেজটা চালায় মিশনারিরা। সুধীর ক্রিশ্চান। কলকাতার আর্চবিশপ খুবই ভালবাসেন ওঁকে। কলেজের ওপর রাগ করে সুধীর যদি বেরিয়ে আসেন, তা হলে সেই খবর আর্চবিশপ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

...ঘণ্টাখানেক পর বাড়ি ফিরে শিবদাস অবাক হয়ে গেলেন। হোলি সাহেব এসেছেন। তক্তপোশে কোল বালিশ জড়িয়ে তিনি বসে। কথা বলছেন বিজেদাদার সঙ্গে। এর আগেও একদিন হোলি সাহেব ফড়েপুকুরে এসেছিলেন। সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ দেখা হওয়ায় শিবদাস বললেন, 'হোয়াট আ সারপ্রাইজ।'

হোলি সাহেব ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'ব্যারাকপুরে গিয়াছিলাম। ফিরিবার পথে ভাবিলাম, টোমাকে উইশ করিয়া যাই। আজ শিল্ডে ফার্স্ট খেলা। কী মনে হইতেছে?'

শিবদাস বললেন, 'খবর ভাল নয় সাহেব। সুধীর মনে হয় খেলতে পারবে না।'

'হোয়াট! কেন... উহার কী প্রবলেম?'

'কলেজ থেকে ওকে ছাড়চে না। আটকে দিয়েচে।'

'আটারলি ননসেন্স। ভেরি ভেরি আনস্পোর্টিং। আমি ভবানীপুর যাইব। কলেজের প্রিন্সিপালকে আমি চিনি। গিয়া উহাকে বলিব, ইহা আপনারা কী করিতেছেন। ইংরেজ জাতির মতো আচরণ করুন। ইউ ক্যান বি সিওর শিবডাস, সুধীর খেলিবে। প্রিন্সিপালের এক নিকট আত্মীয়কে আমি আফিম বিক্রির লাইসেন্স দিয়াছি। উনি যদি আমার কথা না শোনেন, তাহা হইলে, আমি অ্যাকশন লইব। উহার লাইসেন্স বাটিল করিয়া দিব।'

শিবদাস বললেন, 'প্লিজ সাহেব, আপনি যদি এটা করেন, আমি গ্রেটফুল থাকব।'

হোলি সাহেব বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, গ্রাউন্ড যাহাতে ড্রাই থাকে। বাই দ্য বাই, আজিকার ইংলিশম্যান পেপারটা কি টোমরা দেখিয়াছ শিবডাস?'

প্রশ্ন শুনে দুইভাই একযোগে মাথা নাড়লেন। না, দেখেননি। খবরের কাগজ কেনার চল এ বাড়িতে নেই। শিবদাস বোসবাড়িতে ইংরেজি কাগজ দেখেছেন। বাড়িতে মেজবউদি প্রবাসী, অবতার, সবুজ পত্র পত্রিকা রাখেন বটে, কিন্তু সেগুলো উল্টে দেখার সময় হয় না।

হোলি সাহেব বললেন, 'সেন্ট জেভিয়ার্স টিম বডলা লইবার জন্য প্রস্তুত। বাবুদের দলকে তাহারা সমুচিট শিক্ষা দিবার জন্য টৈরি। ভয় পাইবার কিছু নাই। আমি জেভিয়ার্স টিমের খেলা দেখিয়াছি। শিবডাস, টোমরা যদি টোমাদের ন্যাচারাল খেলা খেলিতে পারো, তাহা হইলেই জিতিবে।'

হোলি সাহেব বাংলা বলছেন। বিজয়দাস জিজ্ঞেস করলেন, 'সাহেব, আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কী করে?'

হো হো করে হাসলেন হোলি সাহেব। তারপর বললেন, 'একটা প্রবাড আছে, রোমে থাকিতে হইলে রোমানদের মতো হইতে হইবে। হামি তাহাই মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। টোমাদের হয়টো জানা নাই, হামি একজন বাঙালি হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছি। তাহার সঙ্গে বাংলায় কথোপকথন করি। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত কলেজের এক শিক্ষককে রাখিয়া বাংলা গ্রামার শিখিয়াছি। শিবডাস, একটা কথা হামি বিলিভ করি, ভারতে থাকিটে হইলে, ইংরেজদের ভারতীয় ভাষা শিখিটেই হইবে। ভারতীয়দের শুধু ইংরাজি শিখাইলে চলিবে না। হামি এই কথা গভর্নর জেনারেলকেও বলিয়াছি।'

কথা বলতে বলতে বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করলেন হোলি সাহেব। তাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'চলি। আমি টোমাডের খেলা দেখিতে রেঞ্জার্স মাঠে যাইব। পুনরায় দেখা হইবে।'

তক্তপোশ থেকে নামার পর কী যেন মনে পড়ল হোলি সাহেবের। দু'পা এগিয়েও, ফিরে এসে তিনি বললেন, 'টোমাডের দলে সুটীর ক্রিশ্চান। ব্যারাকপুরের চার্চ হইতে তাহার জন্য হামি একটা ক্রশ আনিয়াছি। সেন্ট জেমস ক্যাথিড্রালের পবিত্র জলে শোধন করা। এই ক্রশ সুটীরকে দিতে হইবে। মোহনবাগানের পক্ষে তাহা মঙ্গলজনক হইবে।'

একটা সোনালি ক্রশ বিজয়দাসের হাতে ধরিয়ে দিলেন হোলি সাহেব। তারপর টেবলের ওপর রাখা টুপিটা তুলে, দুই ভাইয়ের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় শিবদাস বিহ্বল। এমন মানুষও তা হলে ইংরেজদের মধ্যে আছেন, যিনি মোহনবাগানের মঙ্গল চান। দাদার হাতে ধরা ক্রশের দিকে শিবদাস একবার তাকালেন। সুধীরের হাতে এটা তুলে দিতে হবে। বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া যাবে না। ম্লেচ্ছদের জিনিস, জানলে মা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবেন। টেবলের ওপর একটা ফুলদানি রয়েছে। তার তলায় ক্রশটা লুকিয়ে রাখতে বলে শিবদাস অন্দরমহলে ঢুকে গেলেন। মনে মনে ঠিক করে রাখলেন, মাঠে যাওয়ার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

(সাত)

কালী মিত্তির আজ খুব খুশি। সকালে কুমারটুলি পার্কে গিয়েছিলেন। বাচ্চাদের খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোদ্দো পনেরো বছরের একটা ছেলেকে দেখে তিনি মুগ্ধ। দুর্দান্ত স্বাস্থ্য। পায়ে গোলার মতো শট। খেলছে, যেন বাঘের বাচ্চা। এক কোণে বসে চুপচাপ ছেলেটার খেলা তিনি দেখেছেন। খেলা শেষ হতেই তাকে ধরে জিজ্ঞেস করেছেন, 'অ্যাই তোর নাম কী রে?'

'গোষ্ঠ, গোষ্ঠ পাল।'

'কোতায় থাকিস?'

পার্কের কাছেই একটা বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে ছেলেটা বলেছিল, 'ওই বাসায়।'

কথায় স্পষ্ট পূর্ববঙ্গীয় টান। পূর্ব বাংলা থেকে আসা কিছু পরিবার এই অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ কলকাতায় চাকরি করে। কেউ বা পাটের ব্যবসা। কালী মিত্তির বুঝতে পারলেন, গোষ্ঠ সেই সব পরিবারেরই একজন হবে। তবে বেশিদিন নিশ্চয়ই আসেনি। ছেলেটাকে দেখেই কালী মিত্তির ঠিক করে ফেললেন, দুখীরামকে একবার ডেকে পাঠাবেন। দুখীরাম থাকে শ্যামপুকুরে। এরিয়ান ক্লাবটা চালায়। ওর খুব উৎসাহ। গ্রাম গঞ্জ থেকে উঠতি প্লেয়ার ধরে আনে। ঘষে মেজে তাদের তৈরি করে নেয়। এই গোষ্ঠ ছেলেটা যদি দুখীরামের হাতে পড়ে, তা হলে ভাল থ্রি কোয়ার্টার ব্যাক হতে পারবে।

আজ শিল্ডে মোহনবাগানের খেলা আছে। দুখীরাম নিশ্চয়ই খেলা দেখতে যাবে। সেখানেই ওর সঙ্গে কথা বলে নেবেন। বাড়ি ফিরে হাত পা ধুয়ে কালী মিত্তির আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন। বাড়ি ফেরার পথে শ্যামবাজারের মোড়ে বিমান মিত্তিরের বাড়িতে গেছিলেন। সেখানে জোর তোড়জোড় চলছে, সবাই রেঞ্জার্স মাঠে খেলা দেখতে যাবেন। ফুটবল খেলাটা তা হলে লোকের ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে। যে মিত্তিররা পুতুলের বিয়ে দিয়ে হাজার হাজার টাকা খরচ করতেন, তাঁরাও এখন ফুটবলের আলোচনা করছেন। কালী মিত্তিররা তো এটাই চেয়েছিলেন। এই খেলাটাকে ঘিরে বাঙালি জাতি সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াক।

মনে হচ্ছে, এই সেদিনের কথা। কিন্তু মাঝে তেত্রিশটা বছর যে কীভাবে পেরিয়ে গেছে, ভাবলেই এখন অবাক হন কালী মিত্তির। চোখ বুজলেই সেই দিনটাকে দেখতে পান তিনি। হেয়ার স্কুলে তখনও ফার্স্ট পিরিয়ড শুরু হয়নি। চোখমুখে একরাশ উত্তেজনা নিয়ে ক্লাসে ঢুকল নগেন। ফার্স্ট বেঞ্চে পাশাপাশি বসতেন হরিদাস শীল, নগেন সর্বাধিকারী ও তিনি। ডেস্কের ওপর বইখাতা রেখেই নগেন বলল, 'জানিস ভাই, কাল একটা অদ্ভুত খেলা দেকেচি। গোলপানা একটা চামড়ার জিনিস নিয়ে গোরা পল্টনরা খেলচে। ঠাম্মার সঙ্গে তখন বাবুঘাটে যাচ্চিলুম। ফিটনে চেপে গঙ্গায় নাইতে। গড়ের ঢালে দেকলুম, পল্টনরা সেই চামড়ার জিনিসটাতে নাথি মেরে দৌড়ুচ্চে।'

হরিদাস থাকত জানবাজারে। গড়ের মাঠের কাছে। নগেনের কথা শুনে ও বলেছিল, 'বুইচি, তুই কোন খেলার কতা কইচিস। রাগবী... গোরা পল্টনরা এদানীং খুব খেলে।'

নগেন দমবার ছেলে নয়। হরিদাসের কথা পাত্তা না দিয়ে ও বলেছিল, 'গোরাদের খেলতে দেকে আমার কী যে মনে হল, ভাবলুম, ফের গিয়ে ভালভাবে দেকি। ঠাম্মা বাবুঘাটে নেবে যেতেই কোচোয়ানকে বললুম, চল আবার সেথা যেতে হবে। ঠাম্মা চান করে ওঠার আগেই ফিরে আসব। ঠাম্মা টেরটিও পাবে না কো।'

ক্লাসের অন্য ছাত্ররাও সামনের দিকে তখন চলে এসেছে। ফার্স্ট বেঞ্চের সামনে ছোটখাট জটলা। সবাই নগেনের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা শুনতে চায়। বাপ রে, নগেন গোরাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে! সবাই ভুলে গেছিলেন, স্কুলে এসেছেন। প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে

কালী মিত্তির সেদিন জানতে চেয়েছিলেন, 'তাপ্পর কী হল রে নগেন?'

'গড়ের ঢালে ফিরে এলুম। ফিটন থেকে নেমে গে দাঁড়ালুম গড়ের ঢালে। পল্টনদের হুঁশ নেই। আপন মনেই তারা খেলে যাচ্চে। হঠাৎ হল কী, গোলপানা সেই জিনিসটা লাপাতে লাপাতে এল আমার কাচে। আর তখুনি পল্টনদের চোখ গে পড়ল আমার দিকে।'

অন্য সবার চোখ তখন ছানাবড়া। সত্যি কী সাহস নগেনের। সতীর্থদের উত্তেজনার চরমে পৌঁছে দিয়ে নগেন বলল, 'তাপ্পর কী হল জানিস? একজন গোরা বাঁজখাই গলায় দূর থেকে বলল, কিক দ্য বল মাই বয়। কিক ইট টু মি। পেরথমে বুঝতে পারিনি কো। তাপ্পর কতাটা মাতায় ঢুকতেই সেই বলটা তুলে নিয়ে দিলুম কষে লাতি। বাই করে সেটা উড়ে গেল। গোরা পল্টনটা হেসে বললে, ভেরি গুড মাই বয়।'

'তোর পায়ে লাগেনি?'

ঘাড় নেড়েছিল নগেন। 'না, সেটা খুব হালকা। মনে হল, পেটের ভেতর বাতাস রয়েচে।'

ইতিমধ্যে ক্লাস শুরুর ঘণ্টা পড়ে গেছিল। শিক্ষক রামতারণ মুখোপাধ্যায়ও চলে এসেছেন। হুড়মুড় করে সবাই যে যার সিটে চলে গেছিলেন। কারও কৌতূহল তখনও মেটেনি। বাঙালি ছেলেদের মধ্যে কায়িক পরিশ্রমের খেলা বলতে তখন কিছুই নেই। টিফিনের সময় ফের সবাই জড়ো হয়েছিলেন। মনে পড়ছে... কালী মিত্তিরের সব মনে পড়ছে। নগেনই প্রথম কথাটা তোলে, 'গোরাদের মতোন সবাই মিলে ওই খেলাটা খেলবি?'

শুনে অন্যরা আকাশ থেকে পড়েছিলেন। সাহেবদের খেলা, খেলব আমরা? চামড়ার সেই জিনিসটা কে দেবে? খেলার নিয়মকানুনই বা কী? কে শেখাবে? সবাইকে থামিয়ে দিয়েছিল নগেন। বলেছিল, 'আমাদের বাড়িতে এক গোমস্তা আচে। সাহেবদের সঙ্গে তার খুব পিরিত। সেই আমাদের হেল্প করতে পারে।'

কিন্তু যত সহজে নগেন কথাগুলো বলেছিল, তত সহজে সমস্যা সমাধান হল না। দু'দিন পর স্কুলে এসে নগেন বলল, 'না রে, গোরাদের মতোন খেলা বোধহয় আমাদের হবে না।'

কালী মিত্তির আর হরিদাসের চোখে তখন নেশার ঘোর। 'কেন হবে না?'

'খোঁজ নিইচি। গোলপানা বলের দাম কত জানিস? প্রায় চার ট্যাকা। বাড়িতে বলেচিলুম। কেউ ট্যাকা দিতে চাইলে না।'

হরিদাস বড়লোকের ছেলে। মাত্র চার টাকার পরোয়া ও করে না। ও দাবড়ে উঠেছিল, 'ট্যাকার জন্য পিচিয়ে যাস নে নগেন। ট্যাকা আমি দেব। চ, কাল ধম্মতলায় গিয়ে বল কিনে আনি। একবার যকন ঠিক করেচি খেলব, তো খেলবই।'

সত্যিই, টাকার অভাব মিটে গেল। সাহেব পাড়ায় খেলার সরঞ্জামের দোকান আছে। তিনজন মিলে গেলেন সেখানে। তিন টাকা বারো আনা দিয়ে কিনেও আনলেন বল। পরদিন টিফিনের সময় সে এক দৃশ্য। সারা স্কুলে রটে গেছে, নগেনরা একটা অদ্ভুত খেলার জিনিস এনেছে। লাথি মেরে খেলতে হয়। স্কুলের মাঠে ভিড় উপচে পড়েছিল। বলে

সবাই লাথি মারতে চায়। বিশ্রী হট্টগোল।

মাঠের সেই দৃশ্য প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দা থেকে দেখছিলেন অধ্যাপক স্ট্যাক। দেখে অবাকই হয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি দোতলা থেকে তিনি নেমে এলেন। হুইসল বাজিয়ে থামিয়ে দিলেন সবাইকে। তারপর বললেন, 'স্টুডেন্টস, টোমরা ঠিক কী খেলিতাছ? রাগবি, না সকার?'

নগেনের হাতে ধরা বল। আমতা আমতা করে ও বলেছিল, 'স্যার, আমরা ঠিক জানি না। গড়ের ঢালে পল্টনদের খেলতে দেকেচিলাম। সেটাই খেলচি।'

শুনে স্ট্যাক সাহেব হেসে ফেলেছিলেন। 'ও, টোমরা তাহা হইলে সকার খেলিতে চাও। বাট ডিয়ার স্টুডেন্টস, শুরুতেই টোমরা ভুল করিয়াছ। পটলের আকৃতির যে বল তোমরা কিনিয়া আনিয়াছ, তাহা রাগবি বল। ইহা ফুটবল নহে। ফুটবল গোলাকার।'

খুব মুষড়ে পড়েছিল নগেন। ভুল বল কিনে এনেছে বলে। সেটা লক্ষ করে স্ট্যাক সাহেব বললেন, 'নেভার মাইন্ড। টোমরা খেলিতে চাও। আমি টোমাডের একটা ফুটবল উপহার দিব। আগামীকাল হইতে টিফিনের সময় টোমরা মাঠে হাজির থাকিও। টোমাডের আমি নিয়মকানুনও শিখাইব। ফুটবল খুব সহজ খেলা।'

অধ্যাপক স্ট্যাক পরদিন সত্যি সত্যিই ফুটবল উপহার দিয়েছিলেন। খেলাও শেখাতেন।

...পুরনো সেই দিনের কথা মনে হতেই কালী মিত্তির তীব্র সুখানুভূতি অনুভব করলেন। স্ট্যাক সাহেব বলতেন, ফুটবল হচ্ছে আমজনতার খেলা। সত্যিই তাই। তিন দশকের মধ্যে খেলাটা যেন বাঙালির মধ্যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। ফুটবল খেলা শেখার আগে বাঙালি ক্রিকেট শিখেছে। কিন্তু ক্রিকেট রাজা রাজড়াদের খেলাই রয়ে গেছে। সাধারণ লোকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শীতকালে সাহেবদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এক আধদিন বিনোদন আর স্ফূর্তির অঙ্গ ক্রিকেট। খরচসাপেক্ষ খেলা। কে খেলবে, অভিজাতরা ছাড়া? ক্রিকেট খেলায় সাহেবদের জিৎ অবধারিত। খেলায় হারলেও কলকাতার এলিট সোসাইটির মানুষ লজ্জাবোধ করে না। উল্টে সাহেবদের জিতিয়ে দিয়ে কৃতার্থবোধ করে।

চোখের সামনে এ সব কালী মিত্তির দেখেছেন। তিনি নিজে খেলেছেন শোভাবাজার ক্লাবে। এগারো বছর সেই দলের ক্যাপ্টেনও ছিলেন। ভারতের প্রথম ফুটবল টুর্নামেন্ট হল ট্রেডস কাপ। শুরু করেছিল ইউরোপীয় বেনিয়ারা। প্রথম দিকে সাহেবরা কোনও স্থানীয় দলকে খেলার জন্য ডাকত না। সাহেবদের সঙ্গে জেদাজেদি করে কোচবিহারের মহারাজা চালু করলেন কোচবিহার কাপ। শুধুমাত্র ভারতীয় দলগুলির জন্য। কিন্তু কোচবিহার কাপকে সাহেবরা তখন বি গ্রেড টুর্নামেন্ট ভাবত। শোভাবাজারই প্রথম ভারতীয় দল, ১৮৮৯ সালে যারা প্রথম ট্রেডস কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সেই সুযোগ-পাওয়ার জন্য শোভাবাজার রাজবাড়ির লোকেদের কতটা তোষামোদী করতে হয়েছিল, কালী মিত্তির তা ভালমতো জানেন।

শোভাবাজার ক্লাবের পিছনে রয়েছে শোভাবাজার রাজবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু ফুটবলটাও রাজবাড়ির কর্তারা খেলতে চেয়েছিলেন ক্রিকেটের মতো। সাহেবদের সঙ্গে খেলো, কিন্তু খবরদার জিততে যেও না। তা হলে ওদের অহংবোধে আঘাত দেওয়া হবে।

সেই সময় শোভাবাজারের প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যাশনাল এ সি। তাদের পিছনেও রাজবাড়ির সমর্থন আছে। খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ির। দুই ক্লাবের মধ্যে পার্থক্য একটাই, ভূকৈলাস রাজবাড়ির ছেলেরা ফুটবল খেলে। শোভাবাজার রাজবাড়ির ছেলেরা খেলে না। তাদের মাঠে খেলে উত্তর কলকাতার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা। তাদের মধ্যবিত্ত মানসিকতা কালী মিত্তির কোনওদিন পছন্দ করেননি। ন্যাশনাল এ সি-র মনোভাব তিনি সমর্থন করতেন। নিছক সাহেব তোষণ নয়। ফুটবল খেলা চরিত্র গঠনের জন্য। দেশমাতৃকার সেবার জন্য। প্রচ্ছন্নভাবে বঙ্কিমচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শ অনুসরণ করে এগিয়েছে ন্যাশনাল এ সি। শক্তিমান হও, খেলার মাঠে সাহেবদের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দাও।

প্রথমে শোভাবাজার, ন্যাশনাল এ সি, এখন মোহনবাগান। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে বাঙালির ফুটবল। বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ। পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কালী মিত্তির কোথায় যেন সোনালি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। ঠিক আঠারো বছর আগে শোভাবাজারও শিল্ডে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। সে বার শিল্ড টুর্নামেন্ট খেলা হয়েছিল দু'জায়গায়। এলাহাবাদ আর কলকাতায়। শোভাবাজার ক্লাব খেলেছিল কলকাতায়। ফার্স্ট রাউন্ডে ফিফথ রয়াল আর্টিলারির কাছে, মাত্র আটজনের দল নিয়ে খেলে কালী মিত্তিররা সেদিন হেরে গেছিলেন ৩-০ গোলে।

আজ সেই শিল্ডে মোহনবাগান খেলতে নামছে। বহুদিন পর ফের মাঠে গিয়ে খেলা দেখার তীব্র ইচ্ছা অনুভব করলেন কালী মিত্তির। এই বিশ্বাস নিয়ে যে, তিনি যা পারেননি, শিবদাস তা করে দেখাবেই।

(আট)

সুধীরের ব্যাপারে কাকামশায়ের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। সকালে বার তিনেক নিবারণকে চেম্বারে পাঠিয়েছিলেন শৈলেনবাবু। দেখে আসার জন্য কাকাবাবু ফাঁকা আছেন কি না। কিন্তু তিনবারই ফিরে এসে নিবারণ বলল, ঘরভর্তি লোক। কত্তামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায়নি।

বিডন স্কোয়ারে স্বদেশি মেলা খুব বড় করে হবে। সংগঠনের দায়িত্ব সুরেনবাবু দিয়েছেন কাকামশায়ের ওপর। যাঁরা স্বদেশি মেলায় অংশ নিতে চান, তাঁরা নাম লেখাতে আসছেন বোসবাড়িতে। মেলা চলবে সাত-আট দিন ধরে। স্বদেশ নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা হবে। সেই সঙ্গে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানও। সব বন্দোবস্ত করার ভার এসে পড়েছে কাকামশায়ের ওপর। তাঁর এখন নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। ঠিকমতো কোর্ট কাছারিতেও যেতে পারছেন না। মক্কেলরা এসে ফিরে যাচ্ছেন। কাকামশায়ের ব্যস্ততা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন শৈলেনবাবু। কিছু করার নেই। টিম নিয়ে একটু পরেই তিনি বেরিয়ে পড়বেন গড়ের মাঠের দিকে। কাকামশায়ের আশীর্বাদ ছাড়া সে কী করে সম্ভব?

বোসবাড়ির উঠোনে প্লেয়ারদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন শৈলেনবাবু। এমন সময়

চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন কুমুদিনী দেবী। ব্যারিস্টার জে এন মিত্রের স্ত্রী। তাঁর সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচয় আছে শৈলেনবাবুর। বয়স পঞ্চাশের অধিক। শিক্ষিতা, অলোকপ্রাপ্তা মহিলা, স্বামীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনের টানে অন্দরমহল থেকে বেরিয়ে এসেছেন। স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি নানা ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করেন। তাঁকে দেখেই কুমুদিনী বললেন, 'কেমন আচেন শৈলেনবাবু?'

'ভাল। আপনার সব কুশল তো?'

ইতিবাচক ঘাড় নাড়লেন কুমুদিনী। বললেন, 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করব বলে মনে অনেকদিন ধরে তাগিদ দিচ্চে।'

'কোনও সংকোচ করবেন না। বলুন।'

'শুনেচি, স্থানীয় যুবকদের না কি রোজ সকালে আপনি কুচকাওয়াজ শেকান?'

শুনে অবাক হলেন শৈলেনবাবু। কুমুদিনী তা হলে অনেক খোঁজ খবরই রাখেন। শৈলেনবাবু নিজে খুব বলিষ্ঠ মানুষ। ছোটবেলা থেকে শরীরচর্চা করেছেন। এখনও নিয়মিত মুগুর ভাজেন। শ্যামপুকুর অঞ্চলে বাঙালিদের মধ্যে তিনি একটা অলিখিত নিয়ম চালু করেছেন। ভোর পাঁচটার সময় শ্যামপুকুর অঞ্চলের সব যুবককে বোসবাড়ির সামনের মাঠে শরীরচর্চার জন্য হাজির হতে হবে। বাঙালি জাতির কাপুরুষ বদনাম তিনি ঘোচাতে চান। শৈলেনবাবু নিজে বন্দুক চালাতে জানেন। কাউকে কাউকে বন্দুক চালানো শেখানও। খুলনায় বেড়াতে গিয়ে একবার তিনি বাঘ শিকার করে এনেছিলেন। ইংরেজদের তিনি দেখিয়ে দিতে চান, বাঙালিরা লড়াই করতেও জানে।

শৈলেনবাবু বললেন, 'ঠিকই শুনেচেন। ইয়াং ছেলেরা যাতে কসরত করে শরীরটাকে সুস্থ রাখতে পারে, শক্তি অর্জন করতে পারে, সে কারণে তাদের আসতে বলি। এই অঞ্চলে কোনও যুবক ভোর পাঁচটার পর বিছানায় শুয়ে থাকে না। আমার কাচে এসে ড্রিল করে।'

'মেয়েদের জন্যও এ র'ম কিচু করুন না। আর কদ্দিন তারা ঘোমটা দিয়ে অন্দরমহলে বসে থাকবে ভাই। শক্তির উৎস তো মেয়েরাই।'

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন শৈলেনবাবু। কুমুদিনী তো ঠিকই বলছেন। মেয়েদের কথা কেন এতদিন মাথায় আসেনি। তিনি বললেন, 'মেয়েরা ড্রিল শিকতে আসবেন, বলচেন?'

'কেন আসবেন না? প্লেগ হলে মানুষের সেবা শুশ্রূষার জন্য তাঁরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারেন। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাকে সামিল হতে পারেন। তা হলে কেন শরীরচর্চার জন্য সাড়া দেবেন না? ইন ফ্যাক্ট, আমার কাচে অনেকেই আক্ষেপ করেন। ভূপেনবাবুর সঙ্গে আজই আমি কতা কয়েচি। উনি বললেন, ও ব্যাপারে আপনার সঙ্গে পরে কতা কয়ে নিতে। উনি বললেন, কী এক ফুটবল খেলা নিয়ে আপনি নাকি এখন খুব ব্যস্ত।'

'উনি ঠিকই বলেচেন। আজ শিল্ডে আমাদের খেলা আচে।'

'তা'লে পরে একদিন কথা বলা যাবে ভাই। দেকি, স্বদেশি মেলার সময় মেয়েদের সঙ্গে আমি কথা কয়ে রাকব। এ বারই প্রথম... মেলায় মেয়ে ভলান্টিয়ার রাকার কতা

চলচে। প্রচুর মেয়ে ভলান্টিয়ার হতে চাইচে। দেকে সত্যি অবাক হচ্চি। স্বদেশি চেতনার বীজ অন্দরমহলেও ছড়িয়ে গ্যাচে। আমাদের সখী সমিতির কর্মীরা ফিজিক্যাল ট্রেনিং নিতে চায়। লাবণ্যপ্রভা নামে একটি মেয়েকে আমি আপনার কাচে পাঠিয়ে দেব। সে-ই যোগাযোগ রাকবে। আচ্চা, আসি তা'লে। পরে একদিন কথা হবে।' নমস্কার জানিয়ে কুমুদিনী চলে গেলেন।

বেলা এগারোটা বাজে। আর দেরি করা যায় না। কাকামশায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য শৈলেনবাবু উঠে এলেন চেম্বারে। দেখলেন, যদুপতি মুকুজ্জে, সোমনাথ সেন আরও কয়েকজন কাকামশায়কে ঘিরে বসে আছেন। স্বদেশি মেলার একটি দিনের অনুষ্ঠান পুরো মেয়েদের জন্য রাখা যায় কি না, তা নিয়ে কথা বলছেন। এ দিকে তাকিয়ে কাকামশায় বলে উঠলেন, 'আরে, শৈলেন যে! কী ব্যাপার? কিচু বলবে না কি আমাকে? আজ তোমার খেলা আচে না?'

'হ্যাঁ কাকামশায়। সুধীরকে নিয়ে একটা প্রবলেম হয়েচে। তাই...'

'বলো, কী প্রবলেম?'

'আমরা যাতে ফুল টিম নিয়ে খেলতে না পারি, সে জন্য কলেজ থেকে সুধীরকে আটকে দিয়েচে।' বলেই সুধীরের পাঠানো চিরকুটটা তিনি এগিয়ে দিলেন ভূপেনবাবুর দিকে।

চিরকুটে চোখ বুলিয়ে ভূপেনবাবু মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন যদুপতি মুকুজ্জের সঙ্গে। চিরকুটটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এ তো অসভ্যতা। ইংরেজদের হলটা কী?'

যদুপতি বললেন, 'কনসপিরেসি। আপনি কলেজের প্রিন্সিপালের কাচে একটা কড়া চিঠি পাঠান। তাতে যদি কাজ না হয়, তা'লে আর্চবিশপের সঙ্গে কতা বলুন। হইচই না বাধালে চলবে না। ত্যামন হলে আমি কংগ্রেসের লোকজনকে নিয়ে ধরনা দেব। ভাঙচোর করে দেব ভবানীপুরের কলেজ।'

'মাতা গরম কোরো না কো যদুপতি। তাতে আজকের সমস্যা মিটবে না।'

'মাতা গরম? কী বলচেন আপনি? আমার তো মনে হয়, মিটিং মিছিল অনেক হয়েছে। আর অনুরোধ টনুরোধ নয়। এ বার মারের বদলে পালটা মার। না হলে ইংরেজদের তাড়ানো যাবে না। রসিকতা হচ্চে? এভাবে প্লেয়ার আটকে ম্যাচ জিতবে? ইংরেজদের ওপর আপনার দুর্বলতা থাকতে পারে ভূপেনবাবু, কোর্ট কাচারিতে আপনাকে ওদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই। এই জাতটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

কংগ্রেসিদের মধ্যে যদুপতিবাবু একটু উগ্রপন্থী। মাঝে মাঝেই তর্কাতর্কিতে উনি জড়িয়ে পড়েন। ফের কাকামশায়ের সঙ্গে যদুপতিবাবুর লেগে যাবে। তাই শৈলেনবাবু বলে উঠলেন, 'প্রবলেমটার কতা আপনাদের জানিয়ে রাকলুম। যা হোক, একটা ব্যবস্থা যে নিতে হয়।'

'দেকি। আজ কোনও রকমে ম্যানেজ করো। তা, এ বার তোমার টিমের প্রসপেক্ট কী র'ম শৈলেন?'

'ভাল খেলবে। আমার মন বলচে, চ্যাম্পিয়নও হয়ে যেতে পারে। শিল্ডে যারা খেলছে,

তাদের সঙ্গে এর আগে খেলেচি। শুদু ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট ছাড়া। এই টিমটা ফৈজাবাদ থেকে এয়েচে। টিমটা ক্যামন, জানি না। শুনলুম, বেশ স্ট্রং টিম।'

'ওরা এসে উটেচে কোতায়?'

'ব্যারাকপুরে পল্টনদের ছাউনিতে।'

'ভালই হল। ওদের টিম নিশ্চয়ই ব্যারাকপুরেই প্র্যাকটিস করচে। টিমটা সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া যেতে পারে। ফিকশ্চারে ইস্টইয়র্ক কোন দিকে আছে শৈলেন?'

'আমাদের ঠিক উল্টো দিকে। ফাইনালের আগে ওদের সঙ্গে আমাদের দেকা হওয়ার চান্স নেই।'

'ভেরি গুড। ব্যারাকপুরের ছাউনিতে আমার এক পরিচিত... চাকরি করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ফুটবল খেলত। তাতে চেনো তুমি। বিশ্বনাথ চক্কোত্তি। আগে সে ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের স্টোর বিভাগে। বিশ্ব থাকে কাশীপুরের দিকে। ওকে বলে দিচ্চি। তোমায় ফিড ব্যাক দিয়ে দেবে।'

শৈলেনবাবুকে কথাগুলো বলেই যদুপতি মল্লিকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ভূপেনবাবু। তারপর বললেন, 'জানো যদুপতি, এই বিশ্বনাথ তোমার মতোনই উগ্রপন্থী। আরে, ও তো ফোর্ট উইলিয়ামে বসেই দাড়ি ওপরাত সাহেবদের। ওখেনে চাকরি করার সময় ইন্ডিয়ান এমপ্লয়িদের নিয়েও একটা ফুটবল টিম তৈরি করেচিল। তার নাম দিয়েচিল আর্সেনাল। সেই টিম দু'বার কোচবিহার কাপও জিতেচে। এই সব খবর সাহেবদের কাগজ ছাপে না। তাই তোমরা জানতে পারো না। তখন বলে বলে ওরা রেজিমেন্টাল টিমকে হারিয়ে দিত ফ্রেন্ডলি ম্যাচে। সেই রাগে সাহেবরা ওকে বদলি করে দিয়েচে ব্যারাকপুরে। ব্যস, টিমটাও গ্যাচে ভেঙে।'

আর্সেনাল টিমটার কথা জানেন শৈলেনবাবু। কোচবিহার কাপে ওদের খেলাও দেখেছেন। আসলে টিমটা নিয়মিত খেলার সুযোগ পেত বিলেত থেকে আসা রেজিমেন্টাল টিমগুলোর সঙ্গে। ওদের খেলা দেখে নতুন টেকনিক শিখতে পারত। তাই এত উন্নতি করেছিল। কিন্তু মোহনবাগান তো সেই সুযোগ পায়ই না। সাহেবরা এত উন্নাসিক, নেটিভ টিমের সঙ্গে খেলতেই চায় না। মনে করে সাব স্ট্যান্ডার্ড টিম। কিন্তু ওদের এই মনোভাব বেশিদিন থাকবে না। একটা বড় টুর্ণামেন্টে জয়, সবকিছু উল্টে দেবে। কে জানে, এ বারের শিল্ডই সেই টুর্নামেন্ট নয়?

ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় ভূপেনবাবু বললেন, 'আজকের ম্যাচটা কোনও রকমে জেতো শৈলেন। কতা দিচ্চি, পরের ম্যাচ থেকে ফুল টিম পাবে। আমি এ দিকে একটু সামলে নিই। তারপর তোমাদের ম্যাচ দেখতে যাব।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'আপনি আশীর্বাদ করুন কাকামশায়, যাতে জিতি।'

'নিশ্চয়ই জিতবে।' তারপর যদুপতির দিকে তাকিয়ে হালকা মেজাজে ভূপেনবাবু বললেন, 'চলো হে উগ্রপতি। এ বার বেরুতে হবে। বিডন স্কোয়ারে যেতে হবে।'

কাকামশায়ের সঙ্গে কথা বলে কিছুটা হালকা হলেন শৈলেনবাবু। বৈঠকখানায় গিয়ে তিনি আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন। সুধীরকে নিয়ে যে সমস্যাটা তৈরি হয়েছে,

তার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। কথাটা অন্য কাউকে বলা যাবে না। ম্যাকগ্রেগর সাহেবের লালমুখটা হঠাৎই শৈলেনবাবুর চোখের সামনে ভেসে উঠল। পুরনো শত্রুতা। ম্যাকগ্রেগর ব্যাটা একই সময় খেলত ক্যালকাটা ক্লাবে। বছর দশেক আগের কথা। মোহনবাগানের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেছিল ক্যালকাটা। সেই ম্যাচে শৈলেনবাবু এমন একটা ট্যাকল করেছিলেন যে হাঁটু খুলে দিয়েছিলেন ম্যাকগ্রেগরের। সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার জন্য শৈলেনবাবু তখন খেলতেন বুট পরে। কোনও ইংরেজ প্লেয়ার তাঁকে একটা লাথি মারলে, পাল্টা দুটো লাথি না মারা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হতেন না।

ম্যাকগ্রেগর সেদিনের অপমানের কথা ভুলে যাননি। তার পর যখনই সুযোগ পান, জব্দ করার চেষ্টা করেন শৈলেনবাবু আর মোহনবাগানকে। ম্যাকগ্রেগর এখন ছড়ি ঘোরাচ্ছেন আইএফএ-তে। তিনি আবার ভবানীপুরের এলএমএস কলেজের বোর্ড মেম্বার। যে কলেজে পড়ান সুধীর। তাই মনে হয়, কারসাজি করে ম্যাকগ্রেগরই আটকানোর চেষ্টা করেছেন সুধীরকে। চিরকুটে পরিষ্কার করে সুধীর কিছু লেখেননি বটে, একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন— কার শয়তানি।

এই তো তিন চারদিন আগে কারেন্সি আপিসে একটা দরকারে গেছিলেন শৈলেনবাবু। ওই অফিসে কিছুদিন চাকরি করেছেন তিনি। সেখানে হঠাৎ দেখা ম্যাকগ্রেগরের সঙ্গে। কথায় কথায় সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন। 'আমাদের কলেজের এক টিচার শুনেছি, আপনার টিমে খেলেন। প্রায়দিনই বিকেলের দিকে তিনি ক্লাস নেন না। ছাত্ররা কমপ্লেন করছে তাঁর সম্পর্কে। উনি কি আপনার টিমে নিয়মিত খেলেন?'

তখন এত মারপ্যাঁচ বুঝতে পারেননি শৈলেনবাবু। সুধীর সম্পর্কে খুব গুণগান করেছিলেন। বলেছিলেন এ বার তাঁর টিম খুব শক্তিশালী। সিভিল আর মিলিটারি টিমগুলোকে দেখে নেবে। তখন তিনি ভাবতেও পারেননি, ম্যাকগ্রেগর শয়তানি করবেন। কিন্তু কী আর করা যাবে। এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়েই মোহনবাগানকে এগোতে হবে। কথাটা ভাবার সময়ই তিনি দেখলেন, শিবদাস হেঁটে আসছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে নীলু। দু'জনকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শৈলেনবাবু। যাক, সুধীরের জায়গায় খেলার মতো নীলুকে তো পাওয়া গেল।

(নয়)

বিপ্রদাস কুটির থেকে সুতোর লাটিম সংগ্রহ করে লাবণ্যপ্রভা যখন নিজের বাড়ি মোহন ভিলায় পৌঁছলেন, তখন বেলা প্রায় এগারোটা। তাঁর সখী সমিতির আপিসে ইতিমধ্যেই দশ বারোজন মেয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। বারমহলে আগে এটা ছিল নাচঘর। জীর্ণ অবস্থায় ফাঁকা পড়েছিল। বাবার কাছ থেকে হলঘরটা লাবণ্যপ্রভা চেয়ে নিয়েছেন সখী সমিতির আপিস করবেন বলে। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এই ঘরে পল্লীর মেয়েরা ভিড় করে থাকে। নানা রকমের হাতের কাজ শেখে। নিত্য ব্যবহার্য আর শৌখিন জিনিসপত্তর তৈরি করে। পরে সেইসব জিনিস সখী সমিতির কর্মীরা বিক্রি করেন মেলায়। তা থেকে যা রোজগার হয়, সেই টাকা খরচ করা হয়, সমাজসেবামূলক কাজে।

লাবণ্যপ্রভাকে দেখে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এল তারাসুন্দরী, সুধীরা আর কনকচাঁপারা। তিনজনেরই অল্প বয়েস। একসঙ্গে কলকল করে কী যেন বলে উঠল। লাবণ্যপ্রভা কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাই কড়া গলায় তিনি বললেন, 'চুপ মার। যা বলবি, একজন বল।'

ধমক খেয়ে তিনজনই চুপ। কয়েক সেকেন্ড পর তারাসুন্দরী বলল, 'দিদি, আপনার সনে দেকা করার জন্যি একজন সেই সক্কাল থেকে বসে আচে।'

'কে সে? কিচু বলেচে?'

সুধীরা বলল, 'দিদি, গরাণহাটার মেয়ে। কাল রেতে সোয়ামী মারধর করে বের করে দিয়েচে বাড়ি থেকে। কাঁনতে কাঁনতে তাই আমাদের একেনে চলে এয়েচে।'

'মেয়েটাকে... তোরা কেউ চিনিস?'

'না দিদি। আলতামাসি গরাণহাটার দিকে থাকত। আলতামাসি চিনতে পারে। কিন্তু সে তো একনও আসেনে। কুমুদিনী দিদির বাড়ি গ্যাচে।'

'মেয়েটা এখন কোতায় রে?'

'হুই যে, বেঞ্চির ওপর শুয়ে আচে। বলল, সারাটা রাত গাড়িবারান্দায় বসে ছিল। একেনে এসে তাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েচে।'

'ঠিক আছে। তোরা একন যা। ঘুম থেকে উঠলে... মেয়েটাকে আমার কাচে আনবি। তাপ্পর কুমুদিদি এলে ঠিক করব, মেয়েটাকে এখেনে রাকব কি না।'

দূর থেকে বেঞ্চের দিকে তাকালেন লাবণ্যপ্রভা। মেয়েটা কাত হয়ে শুয়ে রয়েছে। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ঢলঢলে মুখ, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রং। পরনে সস্তার ডুরে কাটা শাড়ি। আলতা রাঙা পা দুটো বেরিয়ে রয়েছে। বয়স সতেরো-আঠারোর বেশি না। গায়ে একটা অলঙ্কারও নেই। তার মানে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার সময়, সব কেড়েকুড়ে নিয়েছে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দুঃখে মন ভরে গেল লাবণ্যপ্রভার। নিশ্চয় বারো-তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। পাঁচ-ছয় বছরের বিবাহিত জীবনেই বুঝে গেছে, পুরুষজাতটা কী নির্মম। কিন্তু বাপেরবাড়িতে ফিরে না গিয়ে মেয়েটা কেন সখী সমিতির দ্বারস্থ হল, লাবণ্যপ্রভা সেটা বুঝতে পারলেন না। সখী সমিতির ঠিকানাটাই বা কে ওকে দিল? কার সঙ্গে মেয়েটা এল? আগে এ সব জানা দরকার।

ঠেকে শিখেছেন লাবণ্যপ্রভা। বছর খানেক আগে এরকমই একটা মেয়ে কান্নাকাটি করে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। নাম বলেছিল প্রফুল্লমুখী। বিশেষ খোঁজখবর না নিয়েই সখী সমিতিতে তাকে নিয়েছিলেন কুমুদিদি... সমিতির সেক্রেটারি কুমুদিনী মিত্র। পরে দেখা গেল, সে পুলিশের চর। সখী সমিতির ওপর নজর রাখার জন্য পুলিশ তাকে পাঠিয়েছে। লাবণ্যপ্রভারা তখনই জানতে পারেন, মেয়েটা রোজ লালবাজারে খবর পাঠায়। সমিতিতে কে আসে, কে যায়, কী আলোচনা হয়, সব খবর পাচার করে। তার পাঠানো খবরের ওপর ভিত্তি করেই নলিনী বলে একটা মেয়ে ধরা পড়ল। তখন নলিনীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অনুশীলন সমিতির। প্রফুল্লমুখী রাতারাতি উধাও হয়ে গেছিল, সমিতির কিছু কাগজপত্র নিয়ে। ইদানীং লাবণ্যপ্রভারা সাবধান হয়ে গেছেন। কাউকে সাহায্য করতে

নামার আগে, তাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে লাবণ্যপ্রভা ঠিক করে নিলেন, গরাণহাটার এ মেয়েটির সম্পর্কেও আগে খোঁজ নিতে হবে।

চোখ ফিরিয়ে অন্য মেয়েদের দিকে তাকালেন লাবণ্যপ্রভা। সখী সমিতিতে ব্যস্ততা সারদিন ধরে। বেলা দুটোর পর থেকে স্কুল শুরু হবে। আশপাশের মহিলারা সংসারের কাজ সেরে তখন এখানে আসেন। তাঁদের সুবিধের জন্যই এই সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে। বিকেল পাঁচটা অবধি স্কুল। ওই সময়টায় কুমুদিদি আসেন। মেয়েদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নানা ধরনের পরামর্শ দেন। মেয়েদের কত ধরনের সমস্যা! অশিক্ষার কারণেই সেই সব সমস্যা। পরামর্শ দিতে গিয়ে প্রথম দিকে কুমুদিদিকে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে! মেয়েদের পরিবারের লোকজন এসে হামলা করেছে সমিতিতে। কিন্তু কুমুদিদির স্বামী হাইকোর্টের নামী ব্যারিস্টার। তাই কেউ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ আর বিধবা বিবাহে উৎসাহ... যেন ব্রত হিসাবে নিয়েছেন কুমুদিদি। আর মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ভার দিয়েছেন লাবণ্যপ্রভার ওপর। এই কাজটি মন দিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের দিকেও ঝুঁকছেন লাবণ্যপ্রভা। পাঞ্জাবে সরলা দেবী চৌধুরাণী ভারতমাতা সভা তৈরি করেছেন... গোপনে নারী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন সেখানে। সেই ধাঁচেই এগোতে চান লাবণ্যপ্রভা।

মেয়েরা নিবিষ্টমনে যে যার কাজ করে যাচ্ছে। অন্দরমহলের দিকে যাওয়ার সময় লাবণ্যপ্রভা দেখতে পেলেন, তারাসুন্দরী ফিসফিস করে কী যেন বলছে মঙ্গলা বলে একটা মেয়ের কাছে। আঁচল দিয়ে মঙ্গলা চোখের জল মুছছে। দেখে লাবণ্যপ্রভা দাঁড়িয়ে গেলেন। পনেরো-ষোলো বছর বয়সি এই মেয়েটা ফড়েপুকুরের দিকে থাকে। শান্ত স্বভাবের। খুব কম কথা বলে। সাত চড়ে রা কাড়ে না। তবে হাতের কাজে খুব দড়। বিছানার চাদর, বালিশের কভার আর রুমালে এত সুন্দর সুতির কাজ করে, মেলায় চট করে তা বিক্রি হয়ে যায়। সেই কারণে মেয়েটাকে খুব ভালবাসেন কুমুদিদি। সেই মেয়ের চোখে জল কেন? কৌতূহলী হয়ে লাবণ্যপ্রভা জিজ্ঞেস করলেন, 'এই মেয়ে... তোর কী হয়েচে রে?'

তারাসুন্দরী বলল, 'বরের সঙ্গে ঝগড়া করে এয়েচে।'

'কেন, ঝগড়া হয়েচে কেন?

'বর আজ কাজে যায়নে। গড়ের মাঠে কেলাবের বল খেলা আচে। বাবু জেদ ধরেচে, কামাই দিয়ে সেই খেলা দেখতে যাবে।'

'তুই এত ফটরফটর করচিস কেন তারা? তোকে জিজ্ঞেস করেচি?' ঈষৎ বিরক্ত লাবণ্যপ্রভা। বললেন, 'এই মঙ্গলা...তুই বল। তোর বর কোথায় কাজ করে?'

'সেনবাড়ির সেরেস্তায় দিদি।' নাকিসুরে বলল মঙ্গলা, 'সেই খানাকুলে। দিন কে দিন কাজ। না গেলে মাইনে পায় না। আজ সক্কালে বলে কি না, কাজে যাবে না। বল খেলা দেকতে যাবে। ঘরে চাল বাড়ন্ত। চারজনের সংসার...আমি যে কী করে চালাই, সে ভগমানই জানেন।'

'তুই বলিসনি, ঘরে চাল-ডাল নেই?'

'বলে কী হবে। বর.... বিয়ের দিনই আমায় দিব্যি দিয়ে রেকেচিল। বল খেলা নিয়ে

কোনও কতা বলা চলবে না। শিবেদা বলে কে একজন আচে, তার কাচে খেলা শিকতে যায়। দিদি, ওর কাচে শিবেদাই সব, আমি কেউ না।'

শুনে হাসি পেল লাবণ্যপ্রভার। বুঝতে পারলেন, শিবেদা মানে শিবদাস ভাদুড়ি। নামকরা ফুটবল প্লেয়ার। ঘণ্টাখানেক আগে শিবদাসদাদার বাড়িতেই গেছিলেন তিনি। তাঁর মেজ বউদিদি চারুবালার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানেও একই দৃশ্য দেখে এসেছেন। বল খেলা নিয়ে সেখানেও বউয়ের কান্নাকাটি আর মায়ের রাগারাগি। বল খেলাটা যে বাঙালি পরিবারের কত গভীরে ঢুকে গেছে, তার প্রমাণ এই দুটো ঘটনা। মঙ্গলার মাথায় হাত বুলিয়ে লাবণ্যপ্রভা বললেন, 'দূর বোকা, কাঁদছিস কেন? বল খেলাটা তো খারাপ কিছু নয়। পুরুষ মানুষের কত রকম দোষ থাকে। মদ খাওয়া, মেয়েমানুষের বাড়িতে যাওয়া। তোর ভাগ্যি ভাল, তোর বর শিবদাসদাদার মতো লোকের কাছে বল খেলে। শিবদাসদাদাকে আমি চিনি। আমাদের এখেনে আসে চারুদিদি...চিনিস তাঁকে? শিবদাসদাদা হল, তাঁর দেওর। এই তো আমি তাঁদের বাড়ি থেকে এলুম।'

মঙ্গলা এত কথা শুনেও দ্বিধায়, 'তবে যে শউরমোহাই বলেন, বল খেলা ফিরিঙ্গিদের খেলা। ওদের সনে লাতালাতি করতে হয়।'

'ঠিকই বলেছে। বলে লাথালাথি করতে হয়। তুই এত চিন্তা করচিস কেন বোন? তোর বরের নামটা আমায় বল। আমি শিবদাসদাদাকে বলে দেব।'

মেয়েদের স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে নেই। মঙ্গলা ইশারা করায় তারাসুন্দরী বলে উঠল, 'হরেন...হরেন বরাট।'

'ঠিক আছে। মনে থাকবে। শোন, তোর যদি টাকা পয়সা লাগে, আমার কাচ থেকে নিয়ে যাস।'

কথাগুলো বলেই লাবণ্যপ্রভা অন্দরমহলের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। খাওয়া দাওয়া সেরে, বিশ্রাম নিয়ে, ঘণ্টাখানেক পর তিনি ফের সমিতির আপিসে আসবেন। দোতলার দক্ষিণ দিকে একটা ঘরে থাকেন লাবণ্যপ্রভা। নাচঘর থেকে সেটা এত দূরে, সখী সমিতির হই হট্টগোল সেখানে পৌঁছয় না। এই মোহন ভিলা বাড়িটা বানিয়েছিলেন তাঁর দাদু কীর্তি মিত্তির। আসলে বাগানবাড়ি। সামনে বিরাট বাগান আর মাঠ ছিল তখন। সেখানে জুরি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। দাদু খুব শৌখিন ছিলেন। জ্ঞান হওয়ার পর তাঁকে নিজের চোখে দেখেননি লাবণ্যপ্রভা। তবে তাঁর অয়েল পেন্টিং আছে দোতলার ল্যান্ডিংয়ের দেওয়ালে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠার সময়ে হঠাৎ সে দিকে লাবণ্যপ্রভার চোখ চলে গেল। ছবিটা বিবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু দাদু দাঁড়িয়ে আছেন রাজকীয় মহিমায়।

মোহনভিলার সেই রমরমা এখন আর নেই। দাদু মারা যাওয়ার পর জ্ঞাতি বিবাদ চরমে। সম্পত্তি ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তি বিক্রি করে নিকট আত্মীয়রা চলে যাচ্ছেন কলকাতার দক্ষিণ দিকে। লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় ডান দিকে তাকিয়ে লাবণ্যপ্রভা দেখতে পেলেন, বাগানের অর্ধেকটা উধাও হয়ে গেছে। ছোট বড় বাড়ি তৈরি হচ্ছে। খুব ছোটবেলায় ওই বাগানটা দেখিয়ে বাবা বলতেন, 'জানিস মা, এই মাঠে একটা সময় মোহনবাগান ক্লাব প্র্যাকটিস করত। আমরা এমন অপদার্থ, বাবার সাধের বাগানটাও বাঁচিয়ে

রাখতে পারলুম না।' বাবা আরও বলতেন, 'মোহনবাগান ক্লাব আর তোর জন্ম একই দিনে। এই বাড়িতেই বার মহলে যখন মান্যগণ্যরা ক্লাব করার ডিসিশন নিচ্ছেন, সেই সময় অন্দরমহল থেকে খবর এল, তুই জন্মেচিস। মোহনভিলায় জন্ম বলে ক্লাবের নাম রাখা হল মোহনবাগান। আর বাবা ভেতরে এসে তোর মুখ দেখে নাম রাখলেন মোহিনী...মনমোহিনী। কিন্তু স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে আমি তোর নামটা বদলে দিয়েচিলুম। তোর মায়ের নাম ছিল কনকপ্রভা। তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে লাবণ্যপ্রভা। শুনে বাবা খুব রাগারাগি করেছিলেন।'

বাবার সেই কথা মনে করে লাবণ্যপ্রভা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাড়ির লোকজন এখনও তাঁকে মোহিনী বলে ডাকেন। কিন্তু বাইরের লোক তাঁকে চেনে লাবণ্যপ্রভা বলে। ডাকনামটা শুনে কুমুদিদি অবশ্য হাসতে হাসতে একবার বলেছিলেন, ' তোর এই নামটাই অ্যাপ্রোপিয়েট, জানিস লাবণ্য। সত্যি তোর ভেতর একটা মোহিনীশক্তি আচে। এই কারণেই তো তোকে দলে টেনেচি।'

ধপ করে একটা শব্দ হল। লাবণ্যপ্রভা দাঁড়িয়ে গেলেন। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে। বহু বছর মোহনভিলায় মেরামতির কাজ হয়নি। জায়গায় জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়ছে। দেওয়ালে গাছ গজিয়ে উঠেছে। খাঁজে খাঁজে চিল, চড়াই আর পায়রার বাসা। মা মাঝে মাঝেই বিক্রি করে দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু বাবা রাজি নন। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া।

ইদানীং লাবণ্যপ্রভা জানতে পেরেছেন, সার্কুলার রোড চওড়া হবে। কর্পোরেশনের কর্মীরা জরিপ করে গেছেন। হয়তো বাড়ির একাংশ ভাঙা পড়বে। আসলে রাস্তা চওড়া করার ব্যাপারটা অজুহাত। সাহেবদের কুনজরে পড়েছে কীর্তি মিত্তিরের বাড়ি। সখী সমিতিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য। লাবণ্যপ্রভা ঠিকই করে রেখেছেন, কর্পোরেশন নোটিশ দিলেই ব্যাপক আন্দোলন শুরু করবেন।

বারান্দা পেরিয়ে লাবণ্যপ্রভা নিজের ঘরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় পেছন থেকে ডাক শুনতে পেলেন। তারাসুন্দরী ছুটতে ছুটতে আসছে। 'দিদি... ও দিদি...শিগগির চলো। সমিতির ঘরে পুলিশ এয়েচে। নেবুতলার মেয়েটাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্চে।'

খাওয়া মাথায় উঠল। লাবণ্যপ্রভা দ্রুত পায়ে নাচঘরের দিকে ফিরতে লাগলেন।

(দশ)

বাদুড়বাগান থেকে শ্যামপুকুরের বোসবাড়ি অনেকটা পথ। বেলা একটার মধ্যে শিবেদা বোসবাড়িতে পৌঁছে যেতে বলেছেন। প্লেয়াররা সবাই আগে ওখানে সমবেত হবেন। তার পর সবাই একসঙ্গে গড়ের মাঠে যাবেন। এ রকমই নির্দেশ আছে। আন্দাজ করে ঠিক এক ঘণ্টা আগে মেস থেকে বেরিয়ে পড়লেন অভিলাষ ঘোষ। মেস থেকে খেলতে যাওয়ার কথা তাঁর নয়। অন্য দিন কলেজ থেকেই তিনি বোসবাড়ির কাজের লোক নিবারণ এসে খবর দিয়ে গেছে, কলেজে যাওয়ার দরকার নেই। কী একটা কারণে শৈলেনবাবু মানা করে দিয়েছেন।

অথচ আজ কলেজ যাওয়ার খুব দরকার ছিল। যতীন এসে দাঁড়িয়ে থাকবে হেদুয়ার সামনে। ঢাকা থেকে কলকাতায় পড়তে আসার পর একমাত্র এই ছেলেটার সঙ্গেই খুব বন্ধুত্ব হয়েছে অভিলাষের। ফার্স্ট ইয়ারে দু'জনে একই ক্লাসে পড়ত। যতীন যে বেপরোয়া টাইপের ছেলে, সেটা কলেজের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যে অভিলাষ টের পেয়ে গেছিলেন। পূর্ববাংলার ছেলে বলে শুরুর দিকে সবাই তাঁকে খেপাতেন বাঙাল বলে। খানিকটা তাচ্ছিল্যও করতেন। কিন্তু রাজেনদা তখন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, 'তরে যদি কেউ বাঙাল কয়, তাইলে তুইও ছাড়বি না। তারে ঘটি বইল্যা জব্দ করবি।'

এই রাজেনদা... রাজেন সেনগুপ্ত বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতায় আছেন। মোহনবাগান ক্লাবে ফুটবল খেলেন। এবং স্কটিশচার্চ কলেজেই পড়েন। সবাই তাঁকে চেনেন। বছর দুয়েক আগে ময়মনসিংহে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলতে গেছিলেন রাজেনদা। ওখানে অপোনেন্ট টিমে সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে খেলেছিলেন অভিলাষ। গোলও করেন। ওঁর খেলা দেখে খুব পছন্দ হয় রাজেনদার। উনিই বাবার সঙ্গে কথা বলে অভিলাষকে কলকাতায় নিয়ে আসেন। বাবার একমাত্র শর্ত ছিল, কলকাতায় গিয়ে লেখাপড়া করতে হবে। শুধু ফুটবল খেললে চলবে না।

কলেজ ছাত্রদের ইলিয়ট শিল্ড ফুটবলে বাঙাল অভিলাষের খেলা দেখে ঘটি ছাত্ররা চুপ করে গেছিল। অভিলাষের মনে আছে, এই যতীন ছেলেটি এসে সেদিন বলেছিল, 'তোমার গাটস দেখে ভাল লাগল অভিলাষ। মেডিকেল কলেজের ব্যাকটাকে তুমি যেভাবে চার্জ করলে, দেখে আনন্দ পেলাম। সাহেবের বাচ্চাকে উচিত শিক্ষা দিয়েচ।'

সাদা চামড়ার লোকের প্রতি যতীনের বিদ্বেষ যে কতটা, তা অভিলাষ বুঝতে পেরেছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই। ইংল্যান্ডের রাজার জন্মদিন পালিত হবে কলেজে। প্রিন্সিপাল সব ছাত্রকে হাজির থাকতে বলেছিলেন সেদিন। রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করে গান গাইতে হবে ছাত্রদের। 'হে রাজা, হে রাজা, তোমাকে সেলাম, তোমাকে জানাই মোদের শতকোটি প্রণাম।' অনুষ্ঠানের দিন সমবেত গানের সময় হঠাৎ কুকুর ডাকার আওয়াজ। কে, কে এই জঘন্য অপরাধটি করেছে? রাজাকে অপমান? প্রিন্সিপাল সাহেব ক্ষিপ্ত। অপরাধীর নাম জানতে না পারলে তিনি সব ছাত্রকে রাস্টিকেট করবেন। বিশ্বাসঘাতক দুই ছাত্র বলে দিয়েছিল যতীনের নাম। ফলে তাঁকে কলেজ থেকে রাস্টিকেট করা হল। যতীনের জন্য সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল অভিলাষের। কোথাকার রাজা...তার জন্য একজন ভারতবাসীকে প্রশস্তি গাইতে হবে কেন? ক্ষণিকের জন্য ওঁর মনেও বিদ্রোহ জেগেছিল।

এই যতীনের সঙ্গে মাস দুয়েক বাদে ওঁর ফের দেখা হয়েছিল হেদুয়ায়। চেহারাটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। পরনের পোশাকও মলিন। এক নজরেই অভিলাষ বুঝতে পেরেছিলেন, যতীন ভাল নেই। বেঞ্চে বসে দু'দণ্ড কথা বলেছিলেন তিনি, 'কী করত্যাস অহন যতীন? অন্য কলেজে ভর্তি হইছ?'

'না ভাই, আমি আর নেকাপড়া করব না। কলেজের ওপর ভক্তি চটে গ্যাচে।'

'তুমি আছ কোনহানে?'

'কলেজ থেকে রাস্টিকেট করেচে শুনে, বাড়ি থেকে বাবা আমায় তাড়িয়ে দিয়েচেন। একন আচি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের একটা বাড়িতে। তা, তোমার খপর বলো। খেলা কী র'ম হচ্চে। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে শ্যাম পার্কের দিকে গ্যাচিলাম। দেখলাম, মোহনবাগানের হয়ে তুমি খেলচ। আহিরীটোলার এগেনস্টে। দেখে খুব ভাল লাগল ভাই।'

'ম্যাচের পর দেখা করো নাই ক্যান?'

'কী জানি, তুমি কতা কইবে কী না, বুঝতে পারিনি। কলেজের স্টুডেন্টরা তো আমায় দেখলেই একন পালিয়ে যায়। পুলিশের ঝামেলায় পড়বে বলে।'

যতীনের চোখের কোণে পিচুটি। অনবরত জল ঝরছে। তা দেখে অভিলাষ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোমার চোখে কী হইসে যতীন?'

যতীনের মুখে করুণ হাসি, 'ভেতরে অনেক জল জমে আচে ভাই। খানিকটা বেরিয়ে যাচ্চে। দেশ থেকে সাহেবদের তাড়াতে না পারলে জল পড়া বন্ধ হবে না কো।'

দপ করে যতীনের চোখ দুটো সেদিন এক লহমার জন্য জ্বলে উঠেছিল। যতীনের জন্য অনেকটা দরদ জমা হয়ে আছে অভিলাষের মনের ভেতরে। মাঝে মাঝেই যতীনের সঙ্গে দেখা হয়। অনেক সময় টাকাপয়সা দিয়েও তিনি সাহায্য করেন। ধীরে ধীরে যতীনের আসল পরিচয়টা তিনি পেয়ে গেছেন। সে এখন বিপ্লবী। অনুশীলন সমিতির আশ্রয়ে রয়েছে। আর সেটা জানার পর থেকেই যতীনের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। বোসবাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে অভিলাষ ভাবতে লাগলেন, না এই ঝাঁ রোদ্দুরে বন্ধুকে দাঁড় করিয়ে রাখাটা ঠিক হবে না। না গেলে মনে কষ্ট পাবে। অভিলাষ ঠিক করলেন, ওর সঙ্গে একটু কথা বলেই বোসবাড়িতে চলে যাবেন। যদি দেরি হয়ে যায়, তা হলে কেরাঞ্চি গাড়ি ভাড়া করে নেবেন। পকেটে বাবার পাঠানো হাত খরচার টাকা আছে।

... হেদুয়ায় পৌঁছে অভিলাষ দেখলেন, উত্তর দিকে একটা গাছের ছাওয়ায় যতীন বসে রয়েছে। ওকে দেখে অভিলাষ বললেন, 'কী জন্য ডাকসো, তাড়াতাড়ি কও। আইজ আমাগো খেলা আছে গড়ের মাঠে।'

'জানি। আমাদের আড্ডায় তোমাদের খেলার কতা হচ্চিল। হেমবাবু বোধহয় লুকিয়ে তোমাদের খেলা দেখতে যাবেন। আমারও যাওয়ার কতা আচে।'

শুনে খুব খুশি হলেন অভিলাষ। হেমবাবু... হেমচন্দ্র ঘোষ বিপ্লবী। মুক্তি সংঘ আর অনুশীলন সমিতির মাথা। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন অভিলাষ। অনুশীলন সমিতির আড্ডায় গিয়ে। কিন্তু ইদানীং ওঁদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ইংরেজ সরকার। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে। প্রচুর ধরপাকড় করেছে। হেমবাবুরা এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন। সমিতি চালাচ্ছেন গোপনে। তাই এখনও তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়নি অভিলাষের। কয়েকদিন আড্ডায় গিয়ে অভিলাষ টের পেয়েছেন, এই বিপ্লবীদের সাহসের তুলনা নেই। নিঃস্বার্থভাবে এঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। অভিলাষ পরিচয় করতে চান শুনে হেমবাবু নাকি যতীনকে একটা ভাল কথা বলেছিলেন, 'বাঙালি যে যেখানে আছে, যেভাবে আছে, সেইভাবে থেকেই দেশমাতৃকার সেবা করুক। অভিলাষকে বলো, তাকে অনুশীলন সমিতিতে আসতে হবে না। সে ফুটবল

খেলে। ফুটবল মাঠেই এমন কিছু করুক, যাতে ইংরেজরা ভয় পায়।'

সেই হেমবাবু মাঠে যাবেন শুনে অভিলাষ বললেন, 'খেলার পর হেমবাবুর লগে আমার পরিচয় করাইয়া দিবি ভাই?'

যতীন বলল, 'তাঁর ইচ্ছে। উনি যদি চান, তা হলে আলাপ করিয়ে দেব। উনি আর আমি দু'জনেই ছদ্মবেশে যাব। তুমি চিনতে পারবে কি না, বলতে পারব না। যাক সে কতা, তোমাকে যে জন্য দেখা করতে বললাম, সেটা বলি। কাল সকালের ঘটনাটার কতা তোমার মনে আচে?

'মনে থাকবে না কেন? সাহেবের সঙ্গে তোমার ঝামেলার ঘটনাটা তো?'

'হ্যাঁ। ঘটনাটা তোমার বিজেদার সামনে ঘটেছিল বলে, আমার মনটা খচখচ করচিল। আমাদের কাচে খপর আচে, পুলিশের চর পিছু পিছু গিয়ে বিজয়দাসবাবুকে সাবধান করে এয়েচে। বলে গ্যাচে, তুমি যেন আমার সঙ্গে আর মেশামেশি না-করো। বিজয়দাসবাবু নিশ্চয়ই জেনে গেচেন, আমি কে। উনি যদি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করেন, ডিনাই কোরো।'

'বিজেদার লগে তো কাইল বিকালেই প্র্যাকটিসে আমার দেখা হইসিল। কই, কিছু জিগায় নাই তো? পুলিশের কথা তুমি জানলা কী কইর‍্যা?'

'পুলিশের মধ্যেও আমাদের লোক আচে। খপরটা তারাই দিয়ে গ্যাচে। যাক, উনি যকন কিচু জানতে চাননি, তকন তুমিও চুপ করে থেকো। তুমি একন যাও ভাই। বেলা তিনটের সময় হেমবাবু চৌরঙ্গিতে আসবেন। ওকান থেকেই আমরা দু'জন মাঠে যাব।'

অভিলাষ দু'পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই পিছু ডাকল যতীন, 'শোনো, হেমবাবুর সেই কতাটা তোমার মনে আচে তো ভাই?'

'কী কথা যতীন?'

'বিপ্লব। ইংরেজদের তাড়ানোর বিপ্লব। ফুটবল মাঠ থেকে তোমরাই শুরু করো না কেন। হাজার হাজার বাঙালি তোমাদের দিকে তাকিয়ে। আগুন জ্বলে ওঠার অপেক্ষায়। তোমরা যদি জেতো, তা হলে সেটা স্ফুলিঙ্গের কাজ করবে।'

কথাগুলো যতীন এমনভাবে বলল, মনে গেঁথে গেল অভিলাষের। মনে মনে তিনি বললেন, 'তোমাগো চেষ্টা বৃথা যাইব না ভাই। আমরা চেষ্টা করুম।'

...বিকেলে রেঞ্জার্স মাঠে সেন্ট জেভিয়ার্সের বিরুদ্ধে প্রথম পনেরো মিনিটের মধ্যেই গোলটা করার পর দর্শকদের মধ্যে হেমবাবু আর যতীনকে খুঁজতে লাগলেন অভিলাষ। মাঠে প্রচুর দর্শক হয়েছে। টুল, বেঞ্চ আর ঘোড়ার গাড়ির ছাদে বসেও খেলা দেখছেন কিছু লোক। মোহনবাগানের হয়ে তাঁরা চ্যাঁচাচ্ছেন। দর্শকদের মধ্যে হেমবাবু নিশ্চয়ই কোথাও আছেন। ওঁর গোলটা অবশ্যই দেখেছেন। পরে দেখা হলে যতীনকে জিজ্ঞেস করতে হবে, হেমবাবু খুশি হয়েছেন কী না। কিন্তু গোল দেওয়াটাই তো শেষ কথা নয়। ম্যাচটা হেরে গেলে চলবে না। আজ জিততেই হবে। সেন্টার সার্কেলে ফিরে গিয়ে অভিলাষ ফের মন দিলেন খেলায়। সুধীরদা আসতে পারেনি। কানু রায়ও। কানুর বদলে খেলছেন ভোলানাথদা। দশজন নিয়ে খেলতেও মোহনবাগানের অসুবিধা হচ্ছে না।

জ্যাভেরিয়ান্স টিমের ডিফেন্স এত জমাট খেলছে, প্রথমার্ধে গোল করার আর সুযোগই

পেলেন না অভিলাষ। ওদের দুই ব্যাক রোজ আর গ্রেসনি দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছে। মাঝ মাঠে ফিশার আর ওয়ার্ড বলই ধরতে দিচ্ছে না। হাফব্যাক পুসে একবার বিশ্রী ফাউল করল বিজেদাকে। রেফারি হোলে ফাউল দিলেন না। কিন্তু রাগিয়ে দিলেন বিজেদাকে। হাফ টাইমের পর সেই রাগ ভালমতোন পুষিয়ে নিলেন বিজেদা দুটো গোল করে। মোহনবাগান ৩-০ গোলে ম্যাচটা জিতল।

খেলার পর দর্শকদের ভিড়ের মাঝখান দিয়ে অভিলাষ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুর দিকে ফিরছেন, তখন গলা শুকিয়ে কাঠ। তাঁবুতে পৌঁছলে লেবুর জল পাওয়া যাবে। কপাল ভাল থাকলে একটা লেমনেড। কোমরে হাত দিয়ে অভিলাষ হাঁটছেন। এমন সময় ভিড়ের মাঝখান থেকে হঠাৎ একজন ভিস্তিওয়ালা সামনে এসে দাঁড়াল। তার কাঁধে চামড়ার ব্যাগে জল। মুচকি হেসে সে বলল, 'পানি পিওগে?'

গলা ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য অভিলাষ তখন উদগ্রীব। দু'হাত আঁজলা করে পেতে তিনি জল খেতে লাগলেন। ঠিক তখনই কানের কাছে শুনলেন, 'ওয়েল প্লেড।'

চমকে উঠে অভিলাষ তাকাতেই, সেই ভিস্তিওয়ালা নিমেষে ভিড়ের মাঝখানে মিশে গেল!

(এগারো)

বিপ্রদাস কুটিরের ছাদে উঠলে প্রথমে যেটা চোখে পড়ে, সেটা হল ঘড়িওয়ালা বাড়ির ছোট গম্বুজ। বিমান মিত্তিরের বাড়ি, অথচ লোকে জানে ঘড়িওয়ালা বাড়ি বলে। কার্নিশে গিয়ে দাঁড়ালে শিবদাস-বিজয়দাস ঘড়িটাকেও স্পষ্ট দেখতে পান। এই ঘড়িটা দুই ভাইকে খুব সাহায্য করে। যে দিন খেলা থাকে না, সেদিন দুই ভাই ওই ঘড়ির সময় দেখেই, পাক্কা তিন ঘণ্টা প্র্যাকটিস করেন।

শিল্ডের সেকেন্ড রাউন্ডে মোহনবাগানের খেলা রেঞ্জার্সের সঙ্গে। এখনও দু'দিন বাকি। ভোর পাঁচটায় শিবদাস আর বিজয় ছাদে উঠে এলেন। চারদিক ফরসা হয়ে আসছে। কার্নিশের ধারে দাঁড়িয়ে দুই ভাই নিম ডাল দিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করলেন। মুখ চোখ না ধুয়ে তাঁরা প্র্যাকটিস আরম্ভ করতে পারেন না। বাসি মুখে প্র্যাকটিস কী রকম যেন অপবিত্র লাগে। শিবদাস গতকাল রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরেছেন। শ্যালিকার বিয়েতে এক রাত্তির আটকে গেছিলেন সাঁতরাগাছিতে। ভূরিভোজ হয়ে গেছে। শিবদাসের শরীর এমনিতে ছিপছিপে। তবুও আজ একটু বেশি প্র্যাকটিস করে শরীরটাকে তিনি ঝরঝরে করে নিতে চান।

কর্পোরেশনের লোকেরা রাস্তায় গ্যাসের আলো এখনও নিভিয়ে যায়নি। মেথর মুদ্দোফরাসদের দু'-চারজনকে দেখা যাচ্ছে। রাস্তার একধারে দু'চাকার একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে। এ বাড়ি-ও বাড়ির খাটা পায়খানা থেকে মল তুলে মেথররা সেই গাড়িতে রাখছে। এই গাড়ি তারা নিয়ে যাবে উল্টোডাঙায়। তার পর সেই ধাপার মাঠে। কলকাতা ভাল করে জেগে ওঠার আগে মেথররা এই কাজটা সেরে ফেলে। মেথরদের অনেকের মুখ চেনা হয়ে গেছে শিবদাসদের। সপ্তাহে পাঁচদিন দৌড়তে দৌড়তে তাঁরা গড়ের মাঠে যান।

মাঝে গঙ্গার ঘাটগুলোতে বেবুশ্যেরা স্নান সারে। ওরা এক আধদিন টিপ্পুনী কেটেছিল। তার পর থেকে বিজয়দাস আর ওদিকে যেতে চান না।

গতকাল প্র্যাকটিসে যেতে পারেননি শিবদাস। মনে মনে তাই লজ্জা পাচ্ছেন। শৈলেনবাবু শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কম্পিটিশনের মাঝে টিমের ক্যাপ্টেন যদি প্র্যাকটিসে গরহাজির থাকে, তা হলে তিনি তো রাগ করবেনই। ছাদে রাখা গাড়ু থেকে জল ঢেলে মুখ ধোয়ার ফাঁকে বিজয়দাসকে জিজ্ঞেস করলেন শিবদাস, 'দাদা, টিমের সব ঠিকঠাক আচে তো?'

বিজয়দাস বললেন, 'অমনিতে সব ঠিকই আচে। তবে হাবুলকে নিয়ে একটা সমিস্যে হয়েচে।'

বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল শিবদাসের। উৎসুক মুখে তিনি দাদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কার্নিশ থেকে ফুল গাছের টবগুলো নামাচ্ছিলেন বিজয়দাস। বললেন, 'ওর আপিসে এক হারামি সাহেব আচে। সে নাকি ডালহৌসি ক্লাবের সাপোর্টার। হাবুল সোমবার আপিস থেকে আগেভাগে বেরিয়ে এয়েচিল বলে, পরদিন নাকি সেই সাহেব ওকে ডেঁটেচে। বলেচে, হাফ কামাই করলেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দেবে।'

'শৈলেনবাবু এ কতা জানেন?'

'উনি তো কাল প্র্যাকটিসে আসেননি। সেনবাড়ির মণিবাবু এয়েচিলেন। তিনি শুনেচেন।'

শৈলেনবাবু কাল প্র্যাকটিসে যাননি শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন শিবদাস। বিকেলের দিকে মাঝে মধ্যেই শৈলেনবাবু কারেন্সি আপিসে যান। সেদিন হাজির থাকেন অন্য কর্তারা। মোহনবাগান ক্লাবের প্রথম ক্যাপ্টেন মণিলালা সেন, ক্লাবের অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, ট্রেজারার বিজয়কৃষ্ণ বরাট। মুখ ধুয়ে গাড়ু একপাশে সরিয়ে রেখে শিবদাস এ বার বললেন, 'ভূপেনবাবু জানেন?'

বিজয়দাস বললেন, 'জানবেন না কেন? মণিবাবু বলবেন...বলেচেন।'

টিমের ইনসাইড রাইট হাবুল সরকার চাকরি করেন কলকাতা কর্পোরেশনে। সুধীরের মতো তাঁকে নিয়ে সমস্যা হলে তো টিম গড়াই কঠিন হয়ে যাবে। আবার ষড়যন্ত্র! কী করা যায়, চুপ করে শিবদাস ভাবতে লাগলেন। তাঁকে গুম মেরে যেতে দেখে মৃদু ধমকালেন বিজয়দাস, 'তুই ভেবে করবিটা কী? নে, টবগুলো ধর। হাতে হাতে সাজিয়ে নিই।'

বিপ্রদাস কুটিরের ছাদটি নেহাৎ ছোট নয়। চারদিকে কমপক্ষে শ'দেড়েক ফুলের টব আছে। এই টবগুলো ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে নেন দুই ভাই। তার পর এঁকেবেঁকে দৌড়ে ড্রিবল প্র্যাকটিস করেন। কখনও পায়ে বল নিয়ে দৌড়ে, কখনও বল ছাড়াই। ড্রিবলিং শেখার এই কৌশলটা শিবদাসের নিজস্ব আবিষ্কার। সাহেবরা খুঁটি রেখে ড্রিবলিং প্র্যাকটিস করে। ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়ে তিনি নিজের একদিন শ্রফশায়ার টিমের প্র্যাকটিস দেখেছেন। তার পরই এই আইডিয়াটা মাথায় খেলে যায়। মাঝে মধ্যে দুই টবের মাঝে ফাঁকটা বড় করে নেন। ইনসাইড আউটসাইড টোকা অনুশীলন করেন। শিবদাসের মতে, যার পায়ে ড্রিবল নেই, সে ফুটবলারই নয়।

ছাদে শিবদাস ড্রিবলিং প্র্যাকটিস করছেন। নীচে নেমে গেলেন বিজয়দাস। নীচে শান

বাঁধানো বিরাট উঠোন। তাতে তেল মেশানো জল ঢেলে দিলেন যাতে উঠোনটা পিচ্ছিল হয়ে যায়। হাতে নারকোল কাতার দড়ি। স্কিপিং শুরু করলেন বিজয়দাস। এটা শরীরের ব্যালান্স রাখার প্র্যাকটিস। সেই সঙ্গে শরীরটাকে ফিট রাখারও। রোজ হাজার দেড়েক স্কিপিং করেন। বয়স যত বাড়ছে, খাটনিও তত বাড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

অঘোরসুন্দরী ঘুম থেকে উঠে পড়েছেন। তার মানে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সারা বাড়ি জেগে যাবে। গঙ্গা স্নান করতে যাওয়ার আগে, তাঁর বাসি কাপড় কেচে নেওয়ার অভ্যেস। ভিজে কাপড় শুকোতে দেওয়ার জন্য তিনি ছাদে উঠলেন। গত তিনদিন তিনি শিবদাসের সঙ্গে কথাই বলেননি।

মাকে দেখে প্র্যাকটিস থামিয়ে ছুটে এলেন শিবদাস। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'এখনও আমার ওপর রাগ করে রয়েচ মা?'

'কেন তুই আমার কতা সেদিন শুনলিনি?'

'কেন মা, সেদিন তো আমি আইবুড়ো ভাতে গেসলুম।'

'সে তো গেলি সনধেবেলায়। আর তুই হলি ও বাড়ির বড় জামাই। শালির বিয়ে বলে কতা। কোথায় দু' তিনদিন আগে যাবি। গে বিয়ের দেকাশুনো করবি। তবেই না কুটুম আমার পশংসা করবে।'

'কিন্তু মা মোহনবাগানের খেলা ফেলে ওকেনে যাই কী করে বলো? আমার কাচে আগে তুমি, তাপ্পর মোহনবাগান। এই খেলা নিয়ে কত নোক আমার দিকে তাকিয়ে আচে জানো? এই তো সাঁতরাগাচিতে...বিয়ে খেতে এসে, খাওয়া দাওয়া ভুলে, কত লোক আমায় ঘিরে ধরলে। আপনাদের জিততেই হবে। সে তুমি দেকলে অবাক হয়ে যেতে। বিশ্বেস না হয়, মেজবউদিকে জিজ্ঞেস করো। মৃণালের বর দেকবে কী, নোকে আমাকেই দেকে যাচ্চে। শেষে শউরমোহাই তাদিরগে বকাবকি শুরু করলেন। তোমার ছোট বউয়ের অল্প বয়েস। এ সব কিচ্চু বোঝে না। খালি ভেউভেউ কান্না।'

বলার ধরন দেখে হেসে ফেললেন অঘোরসুন্দরী। যত তাড়াতাড়ি তিনি রাগেন, তার থেকেও কম সময়ে তিনি ঠান্ডা হন। বললেন, 'মেজবউ ফিরে এসে আমায় সব বলেচে। তা, তুই বল খ্যাল না বাপু। আমার আপততির কী আচে। আমি তো আরও রেগে গেসলুম, বামুনবাড়িতে তোরা ম্লেচ্ছ ঢুকয়েচিলি বলে।'

ইতিমধ্যে ওপরে উঠে এসেছেন বিজয়দাস। মায়ের শেষ কথাটা শুনেছেন। মায়ের পিছনে লাগার জন্য বললেন, 'হোলি সাহেব ম্লেচ্ছ নয় মা। সাহেবদের মধ্যে বামুনও আছে। উনি গোরাদের মধ্যে বামুন। বিয়ে করেচেন হিঁন্দু মেয়েকে।'

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে অঘোরসুন্দরী। সাহেবদের মধ্যে বামুন আছে, এ কথা তিনি জন্মেও শোনেননি—বিজে ফচকেমি করচে না তো? ওর তো ফকরামি করার অভ্যেস আছে। কথাটা পাত্তা না দিয়ে তিনি বললেন, 'না বাপু, সাহেব-বামুন হোক বা চাঁড়াল। আর যেন কোনওদিন এ বাড়িতে না ঢোকে।'

শিবদাস বললেন, 'ঠিক আচে মা, সাহেবকে আমি বলে দেব। কিন্তু তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো, যেন শিল্ডটা আমরা জিততে পারি। মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কিচু হবে

না। আগে শিল্ড জিতি, তাপ্পর তুমি যা বলবে, তা-ই করব।'

শুনে অঘোরসুন্দরীর মন গলে জল। বললেন, 'যা যা, আমার কতা কত শুনিস। দেকলাম তো। একন মিষ্টি মিষ্টি কতা কইচিস। শোন বাচা, আজ আমার করালীব্রত। আমি গঙ্গাচান করে ফিরে না আসা পর্যন্ত তুই বেরুবি না।' ভিজে কাপড় মেলে দিয়ে অঘোরসুন্দরী নীচে নেমে গেলেন।

মায়ের কথা শুনে শিবদাস খুব হালকা বোধ করলেন। হঠাৎ উৎফুল্ল হলে যা হয়, দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি ড্রিবল প্র্যাকটিস শুরু করলেন। এক একটা টোকায় ছিটকে ফেলে দিতে শুরু করলেন মিলিটারি টিমের সব ব্যাক—ম্যাডেন, র‍্যানস্টেড, টিনডাল, ক্লার্ক, স্কালে, মার্টিন, জ্যাকসন, বার্চদের। কল্পনায় দ্রুত বেগে ঢুকে পড়লেন বিপক্ষের ডিফেন্সে। তার পর দুম করে শট নিলেন গোলে। বল উড়ে গিয়ে পড়ল সার্কুলার রোডে।

সার্কুলার রোড দিয়ে ট্রেন যায় ধাপার মাঠে। উত্তর কলকাতার আবর্জনা নিয়ে। ময়লা ফেলে দিয়ে আসে ধাপার মাঠে। আবর্জনা ফেলে কলকাতার ওই সব অঞ্চল এখন ভরাট করা হচ্ছে। কর্পোরেশন এই কাজের ইজারা দিয়েছে সেনবাড়ির কর্তাদের। বাগবাজারে সেনরা আবার মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। শ্যাম পার্কের পিছনেই তাঁদের বাড়ি।

বলটা কোথায় গিয়ে পড়ল, তা দেখার জন্য কার্নিশ থেকে উঁকি দিলেন শিবদাস। দেখলেন, নীচে বল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুধীর। আরে... সুধীর এল কেত্থেকে? এই সাতসকালে? শিবদাসকে দেখে রাস্তা থেকে সুধীর ডাকলেন, 'এই শিবে, নেমে আয়। কতা আছে।'

'তুই কোত্থেকে?'

'কাল রাতে বোসবাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন ভূপেনবাবু। রাতে খাওয়াদাওয়া করে ওখানে থেকে গেছি। সকাল হতেই ভাবলুম, তোর এখেনে ঘুরে যাই।'

'আয় ভেতরে আয়। আমি আসচি।'

দুড়দাড় করে নীচে নেমে এলেন শিবদাস। ভূপেনবাবু যখন ওকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তখন সমস্যা মিটে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সেকেন্ড রাউন্ডের ম্যাচে সুধীর খেলতে পারলে, ডিফেন্স নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। দরজা খুলে সুধীরকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিলেন শিবদাস। এই সাতসকালেও সুধীর টিপটপ। জুতোর পালিশ থেকে জামার ইস্তিরি—একেবারে ঝকঝকে। ঘুম থেকে উঠে এসেছেন, অথচ কত তাজা মনে হচ্ছে। সুধীর দিলখোলা টাইপের মানুষ। পড়াশুনোয় খুব চৌকস। ভাল পাশ দিয়েছে বলে ওঁর কলেজ ওকে পড়ানোর চাকরি দিয়েছে। সতীর্থের দিকে এক পলক তাকিয়ে শিবদাস বললেন, 'তোকে দেকে বল পেলুম। বোস, আগে আমি জলখাবারের ব্যবস্তা করি। তাপ্পর কতা হবে।' বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন।

বার মহলের ঘরে একা বসে রয়েছেন সুধীর। ঘরের চার দেওয়ালে অনেক ছবি টাঙানো রয়েছে। উঠে গিয়ে সেই ছবিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন তিনি। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ, কালীঘাটের মায়ের ছবি পাশে আছেন প্রভু যিশুও। চড়কডাঙার

মেলায় এ সব ঠাকুর দেবতার ছবি খুব বিক্রি হয়। এ বাড়ির কেউ হয়তো কিনে এনেছেন। যিশুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সুধীর বুকে ক্রশ আঁকলেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মভীরু মানুষ। নিয়মিত চার্চে যান। নিজে ধর্মযাজক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন। ছবির সামনে নীরবে প্রার্থনা করে সুধীর জানলার কাছে গেলেন।

জানলার ধারে টেবলের ওপর ফ্লাওয়ার ভাস। তাতে বাসি ফুল। ফুলের প্রতি তীব্র অনুরাগ সুধীরের। কিন্তু বাসি ফুল মোটেই পছন্দ করেন না। অভ্যেসবশত, ফ্লাওয়ার ভাস থেকে ফুলের বোকে-টা তুলে নিতে গিয়ে ঠক করে একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন সুধীর। দেখলেন, টেবলের ওপর পড়ে রয়েছে একটা সোনালি ক্রশ। দেখে সুধীর রোমাঞ্চিত হলেন। শিবদাস-বিজয়দাসরা গোঁড়া হিন্দু। তাঁদের বাড়িতে ক্রশ! এল কী করে? ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি যিশুর ছবি দিকে তাকালেন। নির্জন ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে সুধীর এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে লাগলেন।

টেবল থেকে তুলে নিয়ে ক্রশটা চুম্বন করার সময় সুধীর টের পেলেন, শিবদাস পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি বললেন, 'ক্রশটা তোরই। তোর জন্যই ওটা রেকে গেচেন হোলি সাহেব।'

(বারো)

চৌদ্দোই জুলাই, সোমবার। সকাল থেকেই আকাশ থমথমে। যে কোনও সময় প্রবল বৃষ্টি হতে পারে। বোসবাড়ির বৈঠকখানায় একে একে হাজির হচ্ছেন মোহনবাগানের সব প্লেয়ার। হীরালাল, ভূতি সুকুল, সুধীর, রাজেন। সবার মুখ আকাশের মতোই থমথমে। আজ শিল্ডে সেকেন্ড রাউন্ডের খেলা। রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে। বৃষ্টি যদি হয়, তা হলে জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। শিবদাস সকাল থেকেই ভগবানকে ডাকছেন। বৃষ্টি যদি হয়, দুপুরের মধ্যেই হয়ে যাক। ম্যাচ সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। ঘণ্টা কয়েক রোদ্দুর পেলে মাঠ শুকিয়ে যাবে। খেলা কাস্টমস মাঠে। জল দাঁড়ায় না। মাঠ একেবারে কার্পেটের মতো। তবে বৃষ্টি হলে চটচটে হয়ে থাকবে।

শিবদাসের মনোবাসনা পূরণ করার কোনও ইচ্ছে যে ভগবানের নেই, সেটা বোঝা যাচ্ছে। আকাশ আরও গাঢ় মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিকেল তিনটে পর্যন্ত বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই। জানলা দিয়ে আকাশ দেখছেন শিবদাস। এমন সময় সুকুল এসে পাশে দাঁড়ালেন। মুখ গম্ভীর। দেখেই শিবদাস বুঝে গেলেন, কোনও অভিযোগ আছে। আনমনা হয়ে তিনি বললেন, 'কিছু বলবি?'

সুকুল বললেন, 'নীলুর ফচকেমি তো আর সহ্য হচ্ছে না ক্যাপ্টেন।'

'কেন, কী বলেছে?'

'আরে...তখন থেকে কানের কাছে ছড়া কাটছে। এ কূল ও কূল দু'কূল গেল, এ বার সুকুল একটু খেলো। কেন, লাস্ট ম্যাচটা কি আমি খারাপ খেলেছি? খারাপ খেললে ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজে কি আমার প্রশংসা বেরুত। কই, তোর নামে তো একটা লাইনও লেখেনি।'

'নীলুর কতা তুই ধরিস কেন বোকা? তুই খেপে যাস বলেই তো ও তোর পেছনে বেশি করে লাগে। ওর কতায় কান না দিয়ে বরং আজকের খেলার কতা ভাব। মনে হচ্ছে, বৃষ্টি হবে।'

নীলুর প্রসঙ্গ ভুলে গেলেন সুকুল। বললেন, 'আমাদিগের কপালে ভাল কিছু লেখা নেই রে। শ্লা, গেল বছর দেখলি না, ফার্স্ট রাউন্ডেই হেরে গেলুম ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়েজের কাছে। সেদিনও আকাশ ঢেকেছিল। ধুস, ভগমানটা না একচোখো।'

সুকুল কিন্তু বাঙালি নন। চার পুরুষ আগে উত্তরপ্রদেশ থেকে ওর পূর্বপুরুষরা কলকাতায় আসেন ব্যবসা করতে। সেই থেকে শুক্ল পরিবার এই শহরেই আছেন। সুকুলের জন্ম অবশ্য কলকাতায়। মোহনবাগান ক্লাব যে বছর তৈরি হয়, সেই বছর ধরে কলকাতায় আছেন বলে, তিনি একরকম বাঙালিই হয়ে গেছেন। মোহনবাগানে যখন আসেন, তখন সুকুল খেলতেন সেন্টার ফরোয়ার্ডে। কিন্তু কয়েকদিন খেলা দেখে শিবদাস তাঁকে নামিয়ে আনেন রাইট ব্যাকে। শিবদাসকে খুব মানেন বলে, নতুন পজিশনে খেলতে সুকুল কোনও আপত্তি করেননি। ট্রেডস কাপ, আসানুল্লা কাপ, লক্ষ্মীবিলাস কাপ এমন কী শিল্ডেও ভূতি সুকুল চমৎকার খেলেছেন।

সুকুলের কথা শেষ হতে না হতেই শৈলেনবাবু এসে বললেন, 'বসে থেকে আর কী হবে? চলো, মাঠের দিকে রওনা দিই। যা হওয়ার তাই হবে।'

সবাই মিলে তৈরি হয়ে নিলেন। সবার কাঁধে কিট ব্যাগ। তাতে জার্সি, শর্টস, শাড়ির পাড়, অ্যাঙ্কলেট আছে। বাড়ি থেকে সব প্লেয়ারকে জার্সি কেচে আনতে হয়। জার্সিতে ইস্তিরি করা না থাকলে খুব চটে যান শৈলেনবাবু। বোসবাড়ি থেকে সামান্য হেঁটে গেলে শ্যামবাজার। সেখান থেকে ট্রামে করে সোজা ধর্মতলা। মিনিট কুড়ির বেশি লাগে না। শৈলেনবাবু অবশ্য টিমের সঙ্গে যান না। গড়ের মাঠে তিনি যান ফিটন গাড়িতে, নিবারণকে সঙ্গে নিয়ে। সবাই মিলে বলরাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এলেন।

উল্টো দিক থেকে গণেনবাবু আসছেন। তাঁকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন শৈলেনবাবু। বেশ উৎসাহভরে বললেন, 'আপনি? চলুন, আমার সঙ্গে মাঠে চলুন।'

গণেনবাবু বললেন, 'ওপরের যা অবস্তা, অফিস থেকে বেরুনোরা সময় ভাবলুম, এ দিক পানে ঘুরে যাই। যদি দেকা হয়ে যায় তো...আপনার গাড়িতেই উঠে যাওয়া যাবে।'

'বেশ করেছেন। আপনি হলেন আমাদের টিমের জন্য খুব লাকি।'

'এ কতা পাঁচকান করবেন না যেন! রমেশবাবুর কানে গেলে, উনি খুব চটে যাবেন।'

গণেন মল্লিক অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টার। রমেশ ঘোষাল 'দ্য বেঙ্গলি' পত্রিকার। দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা রেষারেষির। কিন্তু দু'জনেই শৈলেনবাবুর খুব প্রিয়। গণেন মল্লিকের কথাটা শুনে শৈলেনবাবু তাই মুচকি হাসলেন। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল রাইফেল ব্রিগেডের খেলা দেখতে গেচিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ গেসলুম। আজকের ম্যাচ জিততে পারলে থার্ড রাউন্ডে আপনাদের কিন্তু...ওদের এগেনস্টে খেলতে হবে। তাই ওদের আগে থেকে দেখে রাখলুম।'

'ব্রিস্টল ইউনাইটেডের সঙ্গে কেমন খেললে ওরা?'

'আহামারি কিছু নয়। কোনওরকমে এক গোলে জিতেছে। ওদের গোলকিপার নর্টন বড্ড বেশি টপ বক্সে এসে খেলে। ওভারকনফিডেন্ট আর কী। গোলটা খেলও সেই কারণে। আপনি শিবে বা বিজেকে বলবেন, লং ডিসট্যান্স শট নিতে।'

'আরে মশাই দাঁড়ান। আগে আজকের ম্যাচটা জিতি। তার পর তো থার্ড রাউন্ড।'

'ফিকশ্চারটা কি ভালভাবে স্টাডি করেছেন মশাই। আপনাদের দুই রাইভাল ক্যালকাটা আর ডালহৌসি সেকেন্ড রাউন্ডে মুখোমুখি হয়ে গ্যাচে। আপনার একটা শত্তুর সেকেন্ড রাউন্ডেই কেটে যাবে। শুনচি, গর্ডন হাইল্যান্ডার্স নাকি এ বার টিম দেবে না। ওরা যদি উইথড্র করে...'

'আসল কারণটা জানিনে কো। মনে হয়, আইএফএ-র ওরা খুব চটেচে। তা'লে বাকি রইল গে মিডলসেক্স-এর দুটো দল আর ইস্ট ইয়র্কশায়ার। সুবিধে হল গিয়ে কি জানেন? ইস্ট ইয়র্কশায়ার দলটা এয়েচে সেই ফৈজাবাদ থেকে। ওরা আপনার টিম সম্পর্কে কিছুটি জানে না। একটু চেপে খেললে, আপনারা জিতবেনই বা নয় কেন?'

'এত অ্যাম্বিশাস হওয়া ভাল নয়।'

'কিন্তু বিধির লিখন যদি থাকে? পেনেটির কাছে এক জ্যোতিষীর কাছে আমি মাঝে মধ্যে যাই। তাঁকে গণনা করতে বলেছিলুম। উনি বলেচেন, মোহনবাগান সাকসেসফুল হবেই।'

'আপনি জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বেস করেন নাকি?'

'সার্টেনলি। অ্যাদ্দিন আপনাকে বলিনি, আজ বলচি, ক্যালকাটা ক্লাবের গোলকিপার ডডস সাহেবকে মনে আছে? তাঁর সঙ্গে আমার খুব খাতির। তাঁকে আমি নিয়ে গেসলুম এই জ্যোতিষীর কাচে। বউকে নিয়ে প্রবলেম। বউয়ের সঙ্গে নাকি এক্সট্রামেরিটাল অ্যাফেয়ার্স আছে শারম্যানের। শারম্যান কে বুঝতে পারলেন? ক্যালকাটা টিমের ক্যাপ্টেন।'

সাহেবদের টিমের নানা খবর দেন গণেন মল্লিক। এই কারণেই তাঁকে খুব পছন্দ করেন শৈলেনবাবু। শারম্যানকে তিনি খুব ভালমতোনই চেনেন। আইএফএ-তে যাঁরা মোহনবাগানের পেছনে লেগেছেন, এই শারম্যান তাঁদের অন্যতম। তাঁকে নিয়ে কেচ্ছা। ডডস আর শারম্যান—এই দুই সাহেবের সম্পর্কটা যে আদায় কাঁচকলায়, তা প্রকাশ্যে এসেছিল একবার শিল্ড ফাইনালকে ঘিরে। কাগজে কাগজে খুব লেখালেখি হয়েছিল। সে বার শিল্ড ফাইনালে ডডস একেবারে শেষ মুহূর্তে খেলতে চাননি শারম্যানের ক্যাপ্টেনসিতে। ডালহৌসির কাছে ক্যালকাটা সেই ম্যাচে হেরে যায়। তারা জিততে পারলে টানা তিনবার শিল্ড জেতার রেকর্ডটা করে রাখতে পারত। তা হলে দুই সাহেবের ঝগড়ার নেপথ্য কারণটা বউ টানাটানি নিয়ে! শৈলেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তা...আপনার জ্যোতিষী কি ডডসকে ঠিকঠাক বিধান দিয়েছিল?'

গণেন মল্লিক বললেন, 'আলবাত। আঙুলে একটা স্টোন পরিয়ে দিল। তার পর বলল, আপনার বউ এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার কাচে ফিরে আসবে। ঠিক তাই হল। আমার খুব বিশ্বাস আছে মশাই। দেখে নেবেন, মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হবেই। কেউ রুখতে

পারবে না। আপনার টিমের প্লেয়ারদের দেখলুম, খুব টেনস্‌ড হয়ে আছে। ওদের রিল্যাক্স থাকতে বলুন।'

ফিটন গাড়িতে যেতে যেতে দু'জনে গল্প করছেন। কখন রাজভবনের কাছে পৌঁছে গেছেন, টেরও পাননি। গাড়ি থেকে ওঁরা নামতেই হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি এল। দেখে শৈলেনবাবু খুব দমে গেলেন। কাস্টমস মাঠের আশপাশে তখনই লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। আকাশ জুড়ে বিজলি। কড়াক কড়াক করে বাজ পড়ছে কখনও কখনও। ময়দানের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফাঁকা। বাজ পড়ে প্রতি মরশুমেই দু' চারজন লোক মারা যায়। সেই ভয়ে লোকে এদিক ওদিকে দৌড়োদৌড়ি করছে। গাছতলায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে শৈলেনবাবু ভাবলেন, এত উৎসাহ নিয়ে লোকগুলো খেলা দেখতে এসেচে। সারাক্ষণ বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজবে। এঁদের কথা ভেবে মোহনবাগানের জেতা উচিত।

ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক। গণেনবাবুর সঙ্গে ফিটনেই বসে রইলেন শৈলেনবাবু। সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে। প্লেয়াররা এখনও আসেনি। বোধহয় ধর্মতলার ট্রাম গুমটিতেই আটকে রয়েছে।

খেলার আগেই বৃষ্টিতে ভিজে গেলে, খেলার সময় মাসল ক্র্যাম্প হওয়ার সম্ভাবনা। শিবদাস এ সব খুব খেয়াল রাখেন। বৃষ্টি না-থামা পর্যন্ত কিছুতেই তিনি ক্লাব তাঁবুতে আসবেন না। বৃষ্টি দেখে শিবদাসও মনে হয় হতাশ হয়ে গেছেন। খালি পায়ে ওঁরা মাঠে দাঁড়াবেন কী করে? শৈলেনবাবু ভয় পেয়ে গেলেন, বিশ্রী কিছু একটা ফল না আবার হয়ে যায়। হ্যান্ডবিলের বিদ্রুপগুলো মনে পড়তে লাগল। হুল ফোটানো সব ব্যঙ্গ। বাজে রেজাল্ট হলে কাল কাগজ পড়ে হাসাহাসি করবে ওই কুচক্রীরা।

ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টিটা ধরে আসতেই শৈলেনবাবু দেখতে পেলেন, ধর্মতলার দিক থেকে তাঁর প্লেয়াররা হেঁটে আসছেন। দেখেই তিনি ফিটন গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। হঠাৎ চোখে পড়ল, লাট সাহেবের বাড়ির দিক থেকে পাগলের মতো একজন দৌড়ে আসছেন। কাছে আসতেই তিনি চিনতে পারলেন—গোকুল বরাট। হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বললেন, ট্রাম থেকে নেমে তাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন হোয়াইটওয়ে লেডল'র পোর্টিকোয়। তখন খুব কাছেই বাজ পড়ে। তার ধাক্কায় মূর্ছা গেছেন সতীশ বসাক। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি দরকার।

সতীশ বসাককে শৈলেনবাবু খুব ভালমতো চেনেন। কাকামশায়ের চেম্বারে প্রায়ই তিনি আসেন। বয়স্ক মানুষ। পোস্তায় তাঁর নুনের কারবার। হয়তো গড়ের মাঠে আসছিলেন খেলা দেখার জন্য। আচমকা বাজ পড়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। খবরটা শুনে শৈলেনবাবু বিচলিত হয়ে পড়লেন। খেলার থেকে অনেক বড় একজন মানুষের জান বাঁচানো। শিবদাসকে ডেকে তিনি বললেন, 'মেডিক্যাল কলেজ থেকে ঘুরে আসচি। মোহনবাগানের মান রেখো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে অচেতন সতীশবাবুকে তুলে নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের দিকে রওনা হলেন শৈলেনবাবু। অবস্থা এমন কিছু গুরুতর নয়। বাজ পড়ার শব্দে কানের পর্দা ফেটে গেছে। আধ ঘণ্টা শুশ্রূষার পর চোখ মেলে তাকালেন সতীশবাবু। অবাক হয়ে

বললেন, 'শৈলেন, বাবা তুমি এখেনে? তোমার খেলা আচে না? যাও, কাস্টমস মাঠে যাও। ওখেনে তোমাকে প্রয়োজন।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'আসলে আপনার খপরটা শুনে...'

'কী বলচ, শুনতে পাচ্চি না বাবা। আমি ঠিক আচি। আমার কতা তোমায় ভাবতে হবেনে। তুমি শিগগির যাও। তুমি না গেলে মোহনবাগান জিতবে না।' এক হাত ডান কানে চেপে রেখেছেন সতীশবাবু। দু'চোখ বোজা। সম্ভবত যন্ত্রণা সহ্য করছেন। অন্য হাত নেড়ে, চলে যাওয়ার জন্য তাড়া লাগাচ্ছেন তিনি। দেখে বুকটা কেমন করে উঠল শৈলেনবাবুর। তিনি আর্মির লোক। আবেগ টাবেগের ধার ধারেন না। তবুও মোহনবাগানের জন্য বয়স্ক মানুষটার আকুতি দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন। এমন মানুষের সংখ্যা যত বাড়বে, ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তাও তত বাড়বে। নিবারণকে রেখে গেলেন শৈলেনবাবু। সতীশ বসাককে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে যে!

কাস্টমস মাঠে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন সেকেন্ড হাফ চলছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ফের শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠের কাছেই অপ্রত্যাশিত সংবাদটা পেয়ে গেলেন শৈলেনবাবু। মোহনবাগান দুটো গোল চাপিয়ে দিয়েছে। মাঠের উত্তর দিকেই সবথেকে বেশি লোক। ক্লাব সচিবকে দেখতে পেয়ে হই হই করে উঠলেন সমর্থকরা। ভিজে নেতিয়ে গেছেন সবাই। তবুও উৎসাহের অভাব নেই। সবাই একসঙ্গে কথা বলছেন। তাই গোল দুটো কে কে করেছেন, তা বুঝতে পারলেন না শৈলেনবাবু।

(তেরো)

বৃষ্টির মধ্যেও কাস্টমস মাঠে এত লোক দেখে অবাক কালী মিত্তির। বাপ রে, এর অর্ধেক লোকও যদি তাঁদের সময়ে খেলা দেখতে আসত, তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আকাশের অবস্থা দেখে বাড়ির লোকেরা গড়ের মাঠে আসতে দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু লোক মারফৎ মন্মথবাবু বলে পাঠালেন, মাঠে থাকার জন্য। ম্যাচের রেফারি সার্জেন্ট হাসকিন্স। সে যাতে কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব করতে না পারে, তা দেখা দরকার। আইএফএ-র গর্ভনিং বডির সদস্য মাঠে হাজির থাকলে, হাসকিন্স জোচ্চুরি করার আগে দু'বার ভাববে।

কালী মিত্তিরের পাশেই বসে আছেন গণেন মল্লিক। এক হাতে ছাতা ধরে আছেন, অন্য হাতে নোটস নিচ্ছেন। সাংবাদিকের চাকরি। ঝড় হোক, ভূমিকম্প হোক—মাঠে ওঁকে বসে থাকতেই হবে। আড়চোখে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে কালী মিত্তির বললেন, 'আর ক'মিনিট বাকি আচে মল্লিক?'

'একনও কুড়ি মিনিট। মাঠের অবস্তা হয়ে আসচে, শিবেরা পারলে হয়!'

সত্যিই জল কাদায় মাঠের এমন খারাপ অবস্থা, দৌড়ানো দূরের কথা, প্লেয়াররা দাঁড়িয়ে থাকতে পর্যন্ত পারছে না। আর্ধেক প্লেয়ারকেই তো চেনা যাচ্ছে না। তাদের সর্বাঙ্গে কাদা। ছররা মারলে একেবারে লাইনের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফার্স্ট হাফেই দুটো গোল হয়ে গেছে। প্রথম গোলটা যে শিবদাস করেছে, সে ব্যাপারে কালী মিত্তির নিশ্চিত। রেঞ্জার্সের রাইট

ব্যাক চ্যান্ডলার একটা মিস কিক করল। বল পেয়ে শিবদাস ভুলচুক করেনি। বডি ফেইন্ট করে, গোলকিপার মোলে-কে বাঁ দিকে ফেলে দিয়ে, ডান দিকে প্লেস করে বল জালে পাঠিয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় গোলটা করল কে? গণেনও নিশ্চিত নন। একবার মনে হচ্ছে বিজয়দাস, আর একবার মনে হচ্ছে শিবদাস। দু'জনকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। কানু লাইন দিয়ে চড়চড় করে উঠে, লেফট ব্যাক ভাইনলে-কে ধোঁকা দিয়ে বল বক্সের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। জটলার মধ্যে থেকে গোলটা হয়। গোল করে, সাধারণত সে হাত তুলে বা অন্য অঙ্গভঙ্গি করে দৌড়তে দৌড়তে আসে। সবাইকে জানিয়ে দিতে চায়, সে গোল করেছে। কিন্তু শিবদাস বা বিজয়দাসকে কোনও দিন এটা করতে দেখেননি কালী মিত্তির। এই লাফালাফিটা করত ডোঙ্গা দত্ত। সেও মোহনবাগান টিমটাকে একটা সময় টেনেছে। কিন্তু তার সঙ্গে শৈলেনবাবুর যে কী ঝামেলা হল, ডোঙ্গা আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিল। শৈলেনকে একদিন তিনি জিজ্ঞেসও করেছিলেন ডোঙ্গার ব্যাপারে। কিন্তু ভদ্র ছেলে তো। শৈলেন শুধু বলেছিলেন, 'কোনও প্লেয়ার ক্লাবের থেকে বড় হতে পারে না কালীবাবু। যদি কেউ মনে করে, সে-ই সব, ক্লাব কিছু না, তা হলে তার এ অবস্থাই হবে। এ ছাড়া আর কী বলব, বলুন।'

শৈলেনের কথা মনে পড়ায় কালী মিত্তির হঠাৎ লক্ষ করলেন, আরে শৈলেন তো আজ মাঠে নেই! এত বড় ম্যাচ, অথচ সে নেই কেন? মাঠের চারপাশে একবার চোখ বোলালেন কালী মিত্তির। ছাতার ভিড়ে কোথাও শৈলেনবাবুকে তিনি দেখতে পেলেন না। কার মুখে যেন তিনি শুনেছিলেন, সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব অসুস্থ। তাঁর কিছু হল না তো? হয়তো শৈলেন সেখানেই গেছে। কেননা বোসবাড়ির খুবই ঘনিষ্ঠ ইন্দ্রনাথ।

ফের খেলার দিকে মন দিলেন কালী মিত্তির। পিছল মাঠে বডি ব্যালান্স রাখা যাচ্ছে না। প্লেয়াররা ধুপধাপ পড়ছে। বক্সের ভেতর অনিচ্ছাকৃত কারও সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেতে পারে। তা হলে ফাউল আর পেনাল্টি। সাহেব রেফারি এই সুযোগটা নিতে ছাড়বে না। কালী মিত্তির নিজে যখন খেলতেন, তখন রেফারিদের এই বদমাইশির শিকার হয়েছেন। অনেক জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে গেছে এই ভাবে। মোহনবাগানকে যেন ভুগতে না হয়! কিন্তু তিনি যে ভয়টা পাচ্ছিলেন, সেটাই হল। সার্জেন্ট হাসকিন্স দুম করে একটা পেনাল্টি দিয়ে বসলেন মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। 'এ কী, ফাউলটা করল কে গণেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মনে হয় সুকুল। মার্ক করার সময় ব্যালান্স রাখতে না পেরে...ও অ্যালেনের গলা জড়িয়ে ধরেছিল। অ্যালান ব্যাটা চোটের ভান করে... এমন গড়াগড়ি দিতে শুরু করেচে... দেকুন, যেন ওর পা দুটো ট্রেনে কাটা গ্যাচে।'

সারা মাঠে হায় হায় করে উঠেছেন মোহনবাগানের সাপোর্টাররা। জয়ের এত কাছাকাছি এসেও ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হবে নাকি? কালী মিত্তির একটু দমে গেলেন। তিনি শুনতে পেলেন, পাশ থেকে গণেন বলছেন, 'ব্যাটা হাসকিন্স জোর করে পেনাল্টি দিলে।

আমার রিপোর্টে ওকে কিন্তু আমি ছাড়ব না।'

পেনাল্টি স্পটের কাছে হাসকিন্স দাঁড়িয়ে। হাসাহাসি করছেন সেন্টার ফরোয়ার্ড অ্যালেনের সঙ্গে। কিক নেওয়ার জন্য স্পটে বল বসাচ্ছে লেফট ইনসাইড স্মার্ট। সারা মাঠে অস্বাভাবিক নীরবতা। গোলকিপার হীরালাল দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে। ডাইনে বাঁয়ে হেলছে। কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে কিক নিল স্মার্ট। কিন্তু কী দারুণ রিফ্লেক্স! পা দিয়ে সেই বল আটকে দিল হীরালাল। মাঠের চারপাশ থেকে উল্লাসে ফেটে পড়লেন দর্শকরা—'হীরে পেনাল্টি আটকেছে।' সেই আওয়াজ শুনে কালী মিত্তিরের মনে হল, কেল্লার তোপ ধ্বনিকেও হারিয়ে দেবে। মনে মনে তিনি বলে উঠলেন, সাবাস হীরে। আজ এক হাঁড়ি রাবড়ি তোর পাওনা রইল।

কিন্তু অবাক হওয়ার মতো আরও কিছু তখন বাকি ছিল। সেটা সেন্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষের একটা শট। প্রায় কুড়ি গজ থেকে ও একটা শট নিয়েছিল। বলটা লাগল গিয়ে ক্রশবারে। এত জোর ছিল সেই শটে, ক্রশবার খুলে বেঁকে গেল। হাসকিন্স সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দিলেন। এই রে, অ্যাবানডন্ট করে দেবে নাকি ম্যাচটা! উত্তেজনায় কালী মিত্তির উঠে দাঁড়ালেন। পায়ের ব্যথার কথা তিনি ভুলে গেলেন। অভিলাষের খেলা আগে কখনও তিনি দেখেননি। তবে কয়েকদিন আগেই তার সম্পর্কে খুব প্রশংসা শুনেছিলেন মন্মথ গাঙ্গুলির মুখে। কিন্তু যা শুনেছিলেন, তা খুবই কমই। এ তো তাঁদের সময়কার সেন্ট জেভিয়ার্সের নর্মান প্রিচার্ডের থেকেও বড় মাপের প্লেয়ার। মার খেয়ে ভয় পায় না, উল্টে মার দেয়। রেঞ্জার্স ব্যাক চ্যান্ডলারকে এমন একটা শোল্ডার চার্জ করল, চ্যান্ডলার ছিটকে পড়ল সাত হাত দূরে। কোত্থেকে একে ধরে আনল শিবদাস। নিশ্চয়ই ঢাকা বা ফরিদপুরের ছেলে।

কাস্টমস মাঠে কেয়ারটেকারকে ধরে এনে, গোল পোস্ট ঠিক করে, ফের যখন খেলা শুরু হল, তখন আর মিনিট পাঁচেক বাকি। হাসকিন্স খেলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই বুক থেকে একটা পাষাণ যেন নেমে গেল কালী মিত্তিরের। কিন্তু রিস্টার্ট হতেই রেঞ্জার্স টিমটা দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুকুল কর্নার করে একবার গোল বাঁচল। লেফট আউট ডুরান্ট ফাঁকা গোল পেয়েও বল বাইরে পাঠাল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই দু'দুবার গোলের সুযোগ নষ্ট করল রেঞ্জার্স। আগে এই টিমটার নাম ছিল ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স। জাহাজের নাবিকরা মিলেই এই টিমটা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু পরে গড়ের মাঠে চলে আসার পর ন্যাভাল ভলান্টিয়ার্স নাম বদলে, হয়ে যায় রেঞ্জার্স।

খেলা শেষ হওয়ার আর মিনিট খানেক বাকি। এই সময় গোল অ্যালেনের। খেলার ফল ২-১। রেফারি হাসকিন্স শেষ বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই হই হই করে মাঠের ভেতর ঢুকে পড়লেন দর্শকরা। কাদায় কেউ গড়াগড়িও খেতে শুরু করলেন আনন্দে। শিবদাসকে কয়েকজন কাঁধে তুলে নিয়েছেন। দেখে খুব খুশি হলেন কালী মিত্তির। এটা ওর প্রাপ্য। শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে চলে গেল মোহনবাগান। কম কথা? সত্যি সত্যিই, টিমটার খেলা দেখে কালী মিত্তির মোহিত হয়ে গেছেন। কী কম্বাইন করেছে শিবদাস! ওয়ান্ডারফুল। এই ফরোয়ার্ড লাইনটাকে তিনি যদি পেতেন, তা হলে দশ পনেরো বছর

আগেই সোনা ফলিয়ে দিতেন।

কাস্টমস মাঠের উত্তর দিকে তখন বিরাট জটলা। বৃষ্টির জমা জলে গা হাত পা থেকে কাদা ধুয়ে ফেলছে প্লেয়াররা। দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা-ই দেখছেন। ভিড় ঠেলে কালী মিত্তির এগোতে লাগলেন। শৈলেনের সঙ্গে দেখা করে যাবেন। এর পর টিম প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুতে ঢুকে যাবে। কালী মিত্তির তাঁবুতে ঢুকতে চান না। মোহনবাগানের সবাই তো আর শৈলেনের মতো নয়। ক্লাবগত রেষারেষি আছে। কেউ যদি টিপ্পনি কেটে কিছু বলে, সেটা ভাল লাগবে না। কয়েক পা এগোতেই তিনি দেখতে পেলেন শৈলেনকে। কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশনস।'

হ্যান্ডশেক করে শৈলেনবাবু বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। খেলাটা দেখলেন নাকি?'

'হ্যাঁ। গণেনের পাশে বসেচিলুম। ওয়েল প্লেড।'

'সার্জেন্ট হাসকিন্সের রেফারিংটা দেখলেন? আর একটু সময় থাকলে তো হারিয়ে দিতেন আমাদের। আপনি গভর্নিং বডিতে আচেন। এদিকটা একটু দেকুন।'

এই অনুরোধটা প্রায়ই শুনতে হয়। কিন্তু কালী মিত্তিরের কিছু করার নেই। কোন ম্যাচে কে রেফারি হবে, সেটা ঠিক করে সাহেবরা। তর্কে না গিয়ে একটু ঘুরিয়ে তিনি বললেন, 'আরে... আজ যা খেলেচ, তোমাদের কেউ হারাতে পারত না। একটা ইন্ডিয়ান টিম কোয়ার্টার ফাইনালে! আমি তো ভাবতেও পারচি না। খেলা দেকে কী মনে হল জানো? তোমরা আরও এগোবে। ঠিক পজিশনে ঠিক প্লেয়ারগুলো তোমরা পেলে কী করে?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'ও সব যা করার... করেচে শিবে। আশীর্বাদ করুন। আমরা যেন বাঙালির মান রাকতে পারি।'

'আলবাত পারবে।' বলে বটতলার দিকে এগোলেন কালী মিত্তির। ফিটন গাড়িটা ওখানেই তিনি রেখে এসেছেন। বাড়ি ফিরতে হবে।

রেঞ্জার্স প্লেয়াররা মাথা নিচু করে ফিরে যাচ্ছে। তাঁদের পিছনে ছোট্ট জটলা। দূর থেকে কালী মিত্তির দেখতে পেলেন, এক সাহেব আস্তিন গুটিয়ে অন্য এক সাহেবের দিকে তেড়ে যাচ্ছেন। উত্তেজিত সাহেবকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন... চেমসফোর্ড। রেঞ্জার্সের পুরনো প্লেয়ার। চেমসফোর্ড যাঁর উদ্দেশে হম্বিতম্বি করছেন, দূর থেকে দেখে তাঁকেও কালী মিত্তির চিনতে পারলেন। হোলি ল্যাংডেন। নেটিভেদের সামনে ইংরেজরা তো এ ভাবে ঝগড়া করে না। রগড় দেখার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। চেমসফোর্ড গালাগালি দিচ্ছেন, বাজে রেফারি পোস্টিং করার জন্য। দলবল নিয়ে গিয়ে রেফারিদের তাঁবু ভাঙচুর করবেন বলছেন। হোলি রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছেন। দেখে, কালী মিত্তির মনে মনে হাসলেন। সাহেবরা পরাজয় মেনে নিতে পারে না। বিশেষ করে নেটিভ ক্লাবগুলোর কাছে। এই চেমসফোর্ড আবার গন্ডগোল পাকাবেন না তো?

হাঁটতে হাঁটতে বটতলার কাছে এসে কালী মিত্তির দেখলেন, বাগবাজারের সেনবাড়ির জয়কৃষ্ণ তাঁর ফিটন গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। লাট সাহেবের দফতরে ক্লার্কের কাজ করেন জয়কৃষ্ণ। সমবয়সি, প্রায়ই দু'জনে আড্ডা মারেন সন্ধেবেলায়। জয়কৃষ্ণের কাছ

থেকে নানা খবর পাওয়া যায়। তবে তাঁর সব খবর বিশ্বাসযোগ্য নয়। গল্প করতে করতে বাড়ি ফেরা যাবে ভেবে, জোর করে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিলেন কালী মিত্তির। ফুটবলে জয়কৃষ্ণের কোনও আগ্রহ নেই। এই দুর্যোগের দিনে তাঁকে গড়ের মাঠে আশা করেননি কালী মিত্তির। তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, তুমি এখেনে?'

জয়কৃষ্ণ বললেন, 'চাকরি বাঁচাতে। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেচ, দু' তিনদিন আগে বাংলার লেঃ গভর্নর হয়ে এলেন এফ ডবলিউ ডিউক। তিনি খুব ফুটবল পাগল। তাঁর নির্দেশ, শিল্ডের ম্যাচে বাবুদের যে সব টিম খেলচে, তাদের প্রতি কোনও অন্যায় হচ্চে কি না দেকে, রোজ রিপোর্ট পাটাতে হবে। আমাদের হয়েচে মুশকিল। ফুটবলের কিচ্ছু জানিনে, অতচ রিপোর্ট দিতে হবে। তাই তোমার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলুম।'

কথাগুলো শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন কালী মিত্তির। হঠাৎ সাহেবদের এত উদার হওয়ার কারণটা তিনি বুঝতে পারলেন না। ফুটবল নিয়ে সরকারি স্তরে কেউ মাথা ঘামিয়েছেন বলে, তিনি কোনও দিন শোনেননি। ফুটবল যাঁরা চালান, সেই সাহেবরা হয় প্রশাসনে আছেন, না হয় বিচারব্যবস্থা অথবা ব্যবসায়। সরাসরি তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কারণটা কী বলো তো?'

'বেশি কতা কইতে পারব না কো। তবে... গত পাঁচ ছয় বছর ধরে পার্টিশন নিয়ে বাঙালিরা যা হট্টগোল শুরু করেচে, তারই ইমপ্যাক্ট কইতে পারো। সাহেবরা বুয়েচে, বাংলার ইন্টেলেকচুয়ালদের ঠান্ডা করতে হলে, নতুন চাল চালতে হবে। তাই কিচু ছাড় দেবে।'

'তোমার কতা কিচুই বুঝতে পারচি না কো জয়কৃষ্ণ।'

'পারচ না তো? বোঝার দরকার নেই। এ রাজনীতি।' বলে রহস্যময় হাসি হাসলেন জয়কৃষ্ণ।

(চোদ্দো)

ব্রজেন শীল ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন। ওখানে ইউনিভার্সাল রেসেস কংগ্রেস-এর সভা হবে। তাতে তিনি যোগ দেবেন। বোম্বাই থেকে জাহাজে করে রওনা হবেন ব্রজেনবাবু। সেই প্রসঙ্গেই কথা বলছিলেন ভূপেন বসু। তাঁর চেম্বারে আজ অনেকেই হাজির। এসেছেন ডাঃ নীলরতন সরকার, হেমেন সেন, সত্যানন্দ বসু, পৃথ্বীশ রায়, রায়বাহাদুর রাধারমণ পাল এবং মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন। রাজনীতির প্রেক্ষাপট দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। তা নিয়েই কথা বলেছেন ওঁরা।

হঠাৎ ভূপেনবাবুর মনে পড়ল, লিয়াকৎ হোসেনকে কী যেন একটা দেওয়ার কথা তিনি ভেবেছিলেন। ওহ হ্যাঁ, একটা কলম। ড্রয়ারে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। সেটা বের করে তিনি বললেন, 'লিয়াকৎ, এই পেনটা আমি তোমার জন্য রেকে দিয়েচিলুম। ব্যবহার করে জানাবে, কেমন করেচে?'

বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার সময় ভূপেনবাবুরা বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়েছিলেন। তার অন্যতম মন্ত্র ছিল, 'ইংরেজ বেনিয়াদের হাতে না পারলে, ভাতে মারো।'

তখন থেকেই দেশে নতুন নতুন পণ্য তৈরির উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সেগুলো বাজারে আনার জন্য উৎসাহও দেওয়া হচ্ছে। যেমন, এই কিছুদিন আগেও সাহেবরা নিজেদের দেশ থেকে ঝরনা কলম আর তার নিব নিয়ে এসে কলকাতায় বিক্রি করত। স্বদেশি পণ্য তৈরি করার ডাক যখন দেওয়া হল, তখন বেনারস থেকে এক বাঙালি ডা. আর এন সাহা ভূপেনবাবুর কাছে নিয়ে এসেছিলেন, নতুন ধরনের স্টাইলো পেন। একেবারে দেশীয় উদ্যোগে তৈরি। ডা. সাহা হ্যারিসন রোডে তাঁর কলম কারখানার শাখা খুলেছেন। দিন কয়েক আগে তিনি নিয়ে আসেন, আরও নতুন ধরনের কলম। সেটা কেমন হয়েছে, তা জানার জন্য দু' তিন ডজন কলম, তিনি দিয়ে গিয়েছেন। দেশীয় কলম যে কয়েকজনকে উপহার দেবেন ভেবেছিলেন ভূপেনবাবু, লিয়াকৎ হোসেন তাঁদের একজন।

লিয়াকৎ এত সব জানতেন না। তিনি বললেন, 'বাঃ, দেখতে ভারি চমৎকার তো কলমটা। পকেটে আটকে রাখাও যায় দেখছি।'

ভূপেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, বেনারস থেকে একজন গিয়ে গ্যাচে। আমরা যদি সার্টিফাই করি, তা হলে সে মার্কেট করবে।'

রায়বাহাদুর রাধারমণ পাল বললেন, 'জানো ভূপেন, আমার কাচে একজন এসেচিলেন। বোম্বাইয়ের এক ব্যাপারি। তিনি দিশি কায়দায় মোম তৈরি করেন। আমার তো বেশ ভালই লাগল। দাঁড়াও, তোমার কাচে কিচু পাঠিয়ে দেব।'

শুনে সত্যানন্দ বসু বললেন, 'রায়সাহেব, আমার কাচেও কিচু পাঠিয়ে দেবেন। মাস তিনেক পরেই দুগ্গা পুজো। তকন আমার কাজে লাগবে।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'সাহেবরা যে মোম বিক্রি করে, তাতে নাকি চর্বি মেশানো থাকে? কী নীলরতন, সত্যি?'

নীলরতন সরকার বললেন, 'বলতে পারব না কো। আমার কোনও আইডিয়া...।'

তিনি কথা শেষ করার আগেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন যদুপতি মুখার্জি। হাতের দুটো আঙুল ভি আকারে তুলে ধরে সহর্ষে বলে উঠলেন, 'ভিক্টরি ফর মোহনবাগান।'

ভূপেনবাবু বললেন, 'আরে...এসো যদুপতি, বোসো। এত উৎফুল্ল হওয়ার কারণটা কী?'

যদুপতি অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কেন, শৈলেনরা গড়ের মাঠ থেকে ফেরেনি? আমি তো মনে করলাম, খপরটা তোমরা সব জানো।'

নীলরতন বললেন, 'আহা...খপরটা কী, সেটা আগে বলো না।'

'চিৎপুরের মোড়ে দেকা হল কালী মিত্তিরের সঙ্গে। মোহনবাগানের খেলা দেকে বাড়ি ফিরচে। খপরটা তার কাছ থেকেই শুনলুম। ওর সঙ্গে দেখি বসে আচে, গোরাদের পা চাটা কুত্তা জয়কৃষ্ণটা। দেকেই আমার রাগ হয়ে গেল। তোমাদের মনে আচে, মানিকতলা বোমা মামলায়, সাহেবদের কী রকম হেল্প করেচিল শয়তানটা!'

ভূপেনবাবু ঠান্ডা মাথার লোক। নীলরতনবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে তিনি বিরক্তিপ্রকাশ করতে মানা করলেন। যদুপতি এ রকমই। একটা কথা বলতে গিয়ে, খেই হারিয়ে ফেলে। অন্য প্রসঙ্গে চলে যায়। আজ মোহনবাগানের খেলা ছিল, তিনি জানেন।

কিন্তু কী রেজাল্ট হবে, তাও তিনি জানেন। তাঁর অনুরোধে সাহেবরা মোহনবাগানকে শিল্ডে খেলতে দিয়েছে বটে, কিন্তু বাড়তে দেবে না। হেরেছে ধরে সরাসরি তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ক' গোলে হারল?'

যদুপতি বললেন, 'দুই-এক গোলে।'

'আমাদের গোলটা কে করলে?'

'আমাদের দুটো গোলই শিবদাসের।'

'মশকরা করচ নাকি যদুপতি।'

'তোমার সঙ্গে মশকরা করব, অমন মাতা আমার ঘাড়ে আচে? শিগগির বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করো। মোহনবাগান শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে গ্যাচে।'

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ভূপেন বসু। 'বলচ কী এই সুখবরটা এত ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে তুমি দিলে। তুমি তো মানুষ খুন করতে পারো হে।'

চেম্বারে খুশির হাওয়া বয়ে গেল। সবাই শিবদাসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আসরে হাজির সবাই বয়স্ক মানুষ। সবাই শিবদাসকে চেনেন দ্বিজদাসের ভাই হিসাবে। লিয়াকৎ হোসেন খেলায় তেমন উৎসাহী নন। কিন্তু তিনি পণ্ডিত মানুষ। বহমান ঘটনাকে তিনি সবসময়ই সমাজতত্ত্বের আঙ্গিকে বিচার করেন। কলকাতায় যত স্বদেশি মেলা হয়, তার প্রধান বক্তা তিনি এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। 'নিজ দেশ ও জাতি' সম্পর্কে লিয়াকৎ এত সুন্দর বলেন যে, লোকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শোনে। হঠাৎ তিনি বলেন, 'অ্যাদ্দিনে ইংরেজরা তা হলে আত্মশোধন করছে।'

লিয়াকৎ যখন কিছু বলেন, তখন সবাই চুপ করে যান। উস্কে দেওয়ার জন্য হেমেন সেন বললেন, 'আত্মশোধন মানে?'

'মোহনবাগানের এই ভিকট্রির মধ্যে আমি তো সিপাহি মিউটিনির ছায়া দেখতে পাচ্ছি। এই বার...বুঝলে হেমেন...এইবার সাহেবরা টের পাবে, একটা সময় বাঙালি জাতিটাকে ওঁরা কতটা আন্ডারএস্টিমেট করেছিল। বাঙালিকে এফিমিনেট ভাবার ভুলটা ওঁদের ভেঙে যাবে।'

'অত হেঁয়ালি কোরো না তো লিয়াকৎ। সোজাসুজি বল। তোমাদের মতো ইন্টেলেকচুয়ালদের নিয়ে এই মুশকিল। সব ব্যাপারে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ঢুকে পড়ো।'

শুনে বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না লিয়াকৎ। বললেন, 'বাঙালির ওপর ইংরেজদের রাগ কবে থেকে জানো? সেই সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকে। বিদ্রোহ দমন করার পর ব্রিটিশরা জানতে পেরেছিল, এই অশান্তির মূলে ছিল বাঙালিরা। তখনই ওরা ডিসিশন নেয়, এই জাতটাকে আর বাড়তে দেওয়া চলবে না। তদ্দিনে সাম্রাজ্য অনেকটা বাড়িয়ে ফেলেছে। বুঝতেই পারছে, জাহাজ ভর্তি করে সৈন্য নিয়ে এসে রাজত্ব চালানো যাবে না। আর্মিতে ভারতীয়দের সামিল করতে হবে। সেই সময় ব্রিটিশরা ভারতীয়দের দু'ভাগে ভাগ করে। একদল, যারা স্ট্রং আর লয়াল। এই দলে তারা রাখল, উত্তরপ্রদেশের মানুষদের, বিশেষ করে পঞ্জাবি আর গোর্খাদের। আর্মিতে এদের নেওয়ার আরও কারণ, এরা হুকুম তামিল করতেই অভ্যস্ত। কোনও প্রশ্ন তোলে না। আর অন্যদলটা হল, তুলনায় উইক আর

এফিমিনেট। এই দলে তারা রাখল, বাঙালিদের। এদের দিয়ে করণিকের কাজ করাও, ভুলেও এদের হাতে অস্ত্র তুলে দিও না। আর এইভাবে বাঙালিদের ওরা শিক্ষা দিল।'

হেমেন সেন চুপ করে সব শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'তা নয় হল, কিন্তু মোহনবাগানের জয়ে, তুমি সিপাহি বিদ্রোহের ছায়া দেখতে পেলে কীভাবে?'

থামিয়ে দিলেন ভূপেনবাবু, 'আহা, লিয়াকৎ কী বলতে চাইছে, সেটা শোনই না।'

লিয়াকৎ বললেন, 'বিদ্রোহ তো বটেই। খেলার মাঠে বিদ্রোহ। ব্রিটিশদের আমরা মানি না। ব্রিটিশদের আমরা হারাতেও পারি। দেখো, ফুটবলের মাঠে মোহনবাগানের এই বিদ্রোহ কিন্তু চট করে ওরা দমাতে পারবে না। আমি বলতে চাইছি, দীর্ঘদিন ধরে আর্মিতে বাঙালিদের গুরুত্ব ওরা কমিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লক্ষ করেছ ভূপেন, সিভিলিয়ান সাহেবদের মধ্যেও একটা ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন লক্ষ করা যাচ্ছে। ওদের একটা দল মনে করছে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুল বা কলেজগুলো থেকে যেসব বাঙালি বেরিয়ে আসছে, তারা কোনও অংশে কম নয়। তারা সবদিক থেকেই সমানে পাল্লা দিতে পারে ব্রিটিশদের সঙ্গে। সে প্রশাসনে হোক অথবা খেলার মাঠে। বাঙালিরাও ক্রমশ শক্তিমান হয়ে উঠেছে। আর তাদের এফিমিনেট তকমা দেওয়া যাবে না। একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুল-কলেজে খেলাটা কম্পালসারি করার ফয়দা পুরোপুরি তুলে নিচ্ছে এই প্রজন্মের বাঙালি ছেলেরা।'

তর্কের খাতিরে হেমেন সেন বললেন, 'তোমার ব্যাখ্যাটা পুরোপুরি মানতে পারচি না ভাই। বাঙালি জাতি হিসাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেচে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুল বা কলেজের জন্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র আর রবি ঠাকুরের জ্বালাময়ী নেখা পড়ে। ঋষি অরবিন্দের পথ অনুসরণ করে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ হেমেন। কিন্তু খেলার মাঠে সেই ভাবধারাটাকে নিয়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে, ওই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান স্কুল কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্রসমাজ। দেখো, ওরা কলেজে ফুটবল, রাগবি, ক্রিকেট আর বক্সিং শিখেছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে খেলাটাকে ছড়িয়ে দিয়েছে ক্লাব আর নানা ধরনের অ্যাসোসিয়েশন করে। ভূপেন, তোমার কথাই ধরো না কেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে তুমি পড়াশুনা না করলে কি কোনওদিন মোহনবাগান ক্লাব তৈরি করার কথা ভাবতে? এই যেমন নগেনের কথা ভাবো...নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী... শোভাবাজার রাজবাড়ির জামাই বা কালীচরণ মিত্তির, হরিদাস শীল...মন্মথ গাঙ্গুলি... এরা কিন্তু সবাই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কলেজের ছাত্র।'

'কিন্তু সংখ্যায় ওরা ক'জন? যারা ফুটবল খেলছে, তারা তো সব আসছে মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে।'

'বিপ্লব তো ওরাই করে হেমেন। যেটা আমি বলতে চাইছিলাম, সেটা বোঝার চেষ্টা করো। ব্রিটিশদের যে দলটা উদারপন্থী এবং বুঝতে পারছে, বাঙালিদের দূরে সরিয়ে রেখে বেশিদিন রাজত্ব করা চলবে না, তারাই কিন্তু এ দেশে শিক্ষাপ্রসারে অথবা খেলা শেখানোয়... এগিয়ে আসছে।'

ভূপেনবাবু বললেন, 'তুমি ঠিক বলচ লিয়াকৎ, মোহনবাগান তৈরি করার সময় খুব

সাহায্য করেচিলেন, আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রোফেসর এফ জে রো সাহেব। উনি আমাদের গ্রামার পড়াতেন। ক্লাবের ফাস্ট অ্যানিভার্সারির সময় উনি সভাপতিত্ব করতে এসেই, আমাদের ক্লাবের নাম আর ম্যাসকট বদলে দেন। আমরা নাম দিয়েচিলুম মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু উনি বললেন, তোমাদের ক্লাবে শুটিং বা অ্যাঙ্গলিং হয় না। তাই নাম দাও, মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। ওঁর কথা আমরা সবাই মেনে নিলুম। পরের বচর আমরা ডেকে এনেচিলুম, স্যার টমাস হল্যান্ডকে। উনিও খুব উৎসাহ দেন।'

হেমেন সেন বললেন, 'মোহনবাগানের ম্যাসকট ছিল বাঘ। রো সাহেব সেটা কেন বদলাতে বলেচিলেন, সে সম্পর্কে তোমার কোনও ধারণা আচে?'

ভূপেনবাবু আমতা আমতা করে বললেন, 'না... মানে... এ নিয়ে কখনও ভাবিনি।'

'জাত্যাভিমান ব্রাদার...ইগো। তোমরা তো জানই, এ দেশে সাহেবরা সবথেকে বেশি মার খেয়েছিল টিপু সুলতানের ফৌজের কাছে। টিপুর ফৌজের ম্যাসকট ছিল বাঘ। তাই বাঘ দেখলেই সাহেবদের ইগো ফুঁসে ওঠে। লক্ষ করে দেখবে, বাঘ শিকার করার পর, মৃত বাঘটাকে পায়ের তলায় রেখে সাহেবরা ছবি তুলতে ভালবাসে। রো সাহেব এই কারণেই চাননি, মোহনবাগানের ম্যাসকট বাঘ হোক। তা'লে তোমরা ওঁর জাতভাইদের আরও রোষের মুখে পড়তে। ভালই করেছ, বাঘের বদলে পালতোলা নৌকা ম্যাসকট করে। বেঁচে গেছ।'

হেমেন সেনের কথা শুনে সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। কারও মনে কখনও প্রশ্ন জাগেনি, এক বছরের মাথায় কেন মোহনবাগান ক্লাবের ম্যাসকট রাতারাতি বদলানো হয়েছিল? নীরবতা ভাঙলেন লিয়াকৎ হোসেন। বলে উঠলেন, 'রো সাহেব তো ভাল পরামর্শই দিয়েচিলেন হেমেন। ওদের মতো উদারপন্থীরা অবশ্য এখন একটু মুশকিলে পড়েচেন। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনটা টানা ছয় বচর ধরে চলচে বলে। ওদের যাঁরা বিরোধী, রাজার রিপ্রেজেন্টটিভদের তাঁরা বোঝাচ্চে, লাই দিয়ে বাঙালিদের মাথায় তুলেচে আমাদের একদল লোক। ফলভোগ তো করতেই হবে। এই দেকো, বাঙালিরা এখন জুডিসিয়ারিতেও ব্রিটিশদের সমান ক্ষমতা চাইচে। আমি ইলবার্ট বিল-এর কথা বলছি। ভেবে দেকো হেমেন, বাংলাকে ভাগ করার তাগিদ ওরা অনুভব করল কেন? ওরা বলচে বটে, প্রশাসনে সুবিধে হবে, আসল কারণ কিন্তু তা নয়। ওরা বুঝতে পারচে, ওদের ভিতরটা নড়বড়ে হয়ে যাচ্চে।

'কিন্তু লিয়াকৎ, নবজাগরণের ব্যাপারটা তো এখনও শুধু মাত্র ইন্টেলেকচুয়ালদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাঙালি জাতির গভীরে গিয়ে কি শেকড় গেড়েছে? থিঙ্ক অ্যাবাউট রুরাল বেঙ্গল। তোমার আন্দোলনের ঢেউ কতটা গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে? তোমার মুসলিম কমিউনিটির কথাই ভাব। গ্রাম বাংলাকে যারা জিইয়ে রেখেছে, সেই মুসলিম চাষি আর নিচু জাতির হিন্দু মজদুরদের কথা ভাব তো? বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে তোমরা পৌঁছতেই পারনি।'

'তোমার কথা মানছি হেমেন। হ্যাঁ, ওদের কাছে আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি। কিন্তু সেই সুযোগটা তো হাতের কাছে এসে গ্যাচে? ফুটবলের মাঠই আমাদের পৌঁছে দেবে রুরাল বেঙ্গলের কাছে।'

'আসলে তুমি কী বলতে চাইছ লিয়াকৎ।'

'আমি নিজে কিছু বলছি না। আমি ভবিষ্যৎটা দেখতে পাচ্চি ভূপেন। আমরা পলিটিসিয়ানরা দু'বেলা স্বদেশি সভা বা এক সপ্তাহ ধরে স্বদেশি মেলা করে মানুষের কাছে যতটা পৌঁছতে পারব, তার থেকে ঢের বেশি স্বদেশি চেতনা মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে মোহনবাগানের এক-একটা ভিক্টরি। ভূপেন এসো, আমরা এই সুযোগের পুরোপুরি সদব্যহার করি।'

লিয়াকতের শেষ কথাগুলো চেম্বারের আবহাওয়া বদলে দিল। চমকে উঠে সবাই গুম হয়ে গেলেন।

(পনেরো)

বেলা দশটায় বেলগাছিয়ায় তাঁর অফিসে পৌঁছলেন শিবদাস। ভেটেরেনারি কলেজের ইনসপেক্টর তিনি। সরকারী কর্মী। চাকরিটা পেয়েছেন তিনি ওই কলেজ থেকেই ডিপ্লোমা করে। ফড়েপুকুর থেকে বেলগাছিয়া এমন কিছু দূর নয়। ওই রাস্তাটুকু শিবদাস হেঁটেই মেরে দেন। কোনও কোনওদিন সকালে প্র্যাকটিস থেকে ফিরে আসতে দেরি হলে, শ্যামবাজারের মোড় থেকে তিনি কেরাঞ্চি গাড়ি ভাড়া করে নেন। ইদানীং প্র্যাকটিস হচ্ছে বিকেলে। তাই ঠিক টাইমেই অফিসে যেতে পারছেন তিনি। রোজ কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে আসছেন বেলা দু'টোয়। সহকর্মী সীতাপতি তাঁকে খুব ভালোবাসেন। বিকেলের দিকে কোনও কাজ থাকলে তিনিই সব সামলে নেন।

বেলগাছিয়া ভেটেরেনারি কলেজের ক্যাম্পাসটা বিশাল। চারদিকে গাছগাছালি। কলেজ হওয়ার আগে কারও বাগানবাড়ি ছিল বোধহয়। গেট থেকে মেন বিল্ডিংয়ে পৌঁছতে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়। আজ গেটে ঢোকার মুখে শিবদাস দেখতে পেলেন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছেন সীতাপতি। দেখা হতেই তিনি বললেন, 'এই শিবদাস, তোমার জন্যই গেটের মুখে দাঁড়িয়ে আচি ভাই। আজ তোমাকে আর আপিস করতে হবে না।'

শিবদাস অবাক হয়ে বললেন, 'কেন?'

'ওয়াটসন সাহেবের ঘরে তোমার ডাক পড়েচে। তোমায় বোধহয় আসামে পাটাবে।'

মাথায় যেন বাজ পড়ল শিবদাসের। এ তো সুধীরের মতো কেস হল। শিল্ডে যাতে তিনি না খেলতে পারেন, তার ষড়যন্ত্র নাকি? না, তা তো হতে পারে না। ওয়াটসন সাহেব, ভালমতোন জানেন, শিল্ডের খেলা চলছে। রেঞ্জার্সকে হারানোর পরদিন ডেকে কথা বলেছেন শিবদাসের সঙ্গে। জানতে চেয়েছেন, খেলার খুঁটিনাটি। এমন কী এও বলেছেন, সময় বের করতে পারলে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটা তিনি দেখতে যাবেন। তা হলে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা উঠছে কী করে। অবাক হয়ে শিবদাস বললেন, 'আসামে পাটাবে? কেন ভাই? তুমি কি ঠিক জানো?'

'তা নইলে গেটের মুকে দাঁড়িয়ে থাকব কেন তোমার জন্য? আসামে গোমড়ক লেগেচে। কাল সন্ধে বেলায় খবরটা এসেচে টেলিগ্রাম মারফৎ। আজ সকালে অফিসে এসেই ওয়াটসন

সাহেব তোমার খোঁজ করেচেন। আসামের টোপোগ্রাফিটা নাকি তোমার ভাল জানা আচে। তোমাকে পাটালে কাজ দেবে। শুনে এত খারাপ লাগল...'

শিবদাস সেই মুহূর্তেই নিঃসন্দেহ হয়ে গেলেন, ষড়যন্ত্র টাইপের কিছু নয়। বছর কয়েক আগে ওয়াটসন সাহেব তাঁকে পাঠিয়েছিলেন আসামে। গরুদের রেনডারপেস্ট বলে একটা রোগ হয়েছিল। এক ধরনের ভাইরাল ডিজিজ। কয়েক হাজার গরু-মোষ মারা পড়েছিল সংক্রমণে। শিবদাস ওষুধপত্তর আর লোকজন নিয়ে সেখানে গেছিলেন। মাসখানেক আসামে থেকে তার পর ফিরে আসেন। সেই সময় তিনি মিন্টো ফেটে টুর্নামেন্টে খেলতে পারেননি মোহনবাগানের হয়ে। পুরো পরিস্থিতিটা ভেবে নিয়ে শিবদাস বললেন, 'আবার ওকানে রেনডারপেস্ট হল নাকি?'

সীতাপতি বললেন, 'ঠিক তাই। আপিসে ঢুকলে ওয়াটসন সাহেবের ক্লার্ক তোমাকে... আসাম যাওয়ার চিঠি ধরিয়ে দেবেন। সেই চিঠি তুমি রিসিভ কোরো না।'

'কিন্তু সাহেব যদি বাড়িতে পাঠিয়ে দেন, তা'লে?'

'হ্যাঁ, সে একটা সম্ভাবনা আছে বটে, তবে সেটা আটকানোর রাস্তাও আমার ভাবা আচে। দরকার হলে, সাহেবকে রিকোয়েস্ট করে আমি আসামে চলে যাব। তুমি চিন্তা কোরো না ভাই। সাহেবের কানে আমি তুলে দিচ্চি, তুমি কলকাতায় নেই। চন্দননগর গ্যাচো। ফিরতে দু' তিনদিন দেরি হবে। তুমি এখন যাও ভাই। সাহেবদের ক্লার্করা এখুনি আসতে শুরু করবে। তোমাকে দেকে ফেলেই চিত্তির।'

অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন শিবদাস। কাজের ব্যাপারে সাহেবরা একশোভাগ সিরিয়াস। অনেক কিছু শেখার আছে ওঁদের কাছ থেকে। জীবজন্তুদের প্রতি ওয়াটসন সাহেবের মমতা দেখে এক এক সময় অবাক হয়ে যান শিবদাস। ভেটেরেনারি কলেজে কেউ অসুস্থ জীবন নিয়ে এলে, তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য কী আপ্রাণ চেষ্টাই না করেন ওয়াটসন সাহেব। বলেন, 'পশুপাখিরা ওদের ব্যথা বেদনার কথা জানাতে পারে না। ওদের প্রতি আমাদের অনেক বেশি যত্নবান হওয়া উচিত।' কথাটা মনে পড়ায় মন খচখচ করতে লাগল শিবদাসের। আসামে মড়কে হাজার হাজার গরু আর মোষ মারা যাবে, আর তার মোকাবিলা করার দায়িত্ব পেয়েও তিনি পালিয়ে যাবেন? তাই বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারচি না কো ভাই, আমি কী করব?'

সীতাপতি বললেন, 'বোঝাবুঝির মতো কিচু নেই। আসামে তুমি না গেলেও চলবে। তোমার বদলে আমি অন্য কোনও ইন্সপেক্টর... সামলে নিতে পারব। কিন্তু মোহনবাগান টিমে তোমার বিকল্প কেউ আচে, বলো? কেউ নেই। তুমি চলে গেলে টিমটা কানা হয়ে যাবে। ভাবো তো, তোমার মুকের দিকে কত লোক তাকিয়ে রয়েচে? এমনিতেই কুলতলির মাঠে লোকে তোমায় দুয়ো দিচ্চে। তুমি চলে গেলে তো বলবে, মুরোদ ফুরিয়ে গ্যাচে। শিবে পালিয়ে গেল। কত ছড়া বাঁধবে, কে জানে?'

শিবদাস বললেন, 'ওরা কী বলল, তা নিয়ে ভাবি না কো। আমি ভাবচি এপিডেমিকের কতা। ওয়াটসন সাহেব আমার সম্পর্কে কী ভাববেন, কে জানে?'

'কিচ্চু ভাববেন না। শিল্ড জিতে স্যারের কাছে এসো। দেখবে, উনি তোমার খুব

তারিফ করবেন।' কথাগুলো বলেই সীতাপতি ফের তাড়া লাগালেন, 'তুমি শিগগির যাও ভাই। আগুপিচু ভেবো না কো। আমি আচি। এ দিকটা সামলে নেব'খন।'

দ্রুত একটা কেরাঞ্চি গাড়ি ডেকে, শিবদাসকে তুলে দিলেন সীতাপতি। তারপর বললেন, 'আমার খুব ইচ্চে চিল, তোমার শিল্ড ভিক্টরি নিজের চোকে দেকার। কিন্তু তা হয়তো হবে না। আসামে যদি যাই, কবে ফিরতে পারব কে জানে? আমায় কতা দিয়ে যাও ভাই, শিল্ড যেন এবার হাতছাড়া না হয়। খবরটা যেন ওখানে বসেই পাই।'

আনমান হয়ে ঘাড় নাড়ালেন শিবদাস। গাড়িতে বসে, তিনি ভাবতে লাগলেন, এ ভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হল না। নিজেকে স্বার্থপর বলে মনে হতে লাগল। গোমড়ক তিনি নিজের চোখে দেখেছেন আসামে। অবলা, নিরীহ পশুগুলোকে চোখের সামনে মারা যেতে দেখেছেন। তাদের ঘিরে কত মানুষের কান্না। কত পরিবার গরুর ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে! গোমড়ক মানে, তাদের জীবনেও দুর্যোগ নেমে আসা। কিন্তু এ ভাবে পালিয়ে আসা ছাড়া আর উপায়টাই বা কী? বুধবার শিল্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল রাইফেল ব্রিগেডের বিরুদ্ধে। হাতে আর মাত্র দুটো দিন। আসামে যেতেই তো লেগে যায় তিন রাত্তির চারদিন।

বেলগাছিয়া খালের কাছে আসতেই শিবদাস দেখলেন, পাশের গাড়িতে বসে যাচ্ছে জ্যোতিষচন্দ্র সেন। স্কুলের বন্ধু, থাকে শ্যাম পার্কের কাছে। বেলগাছিয়ার দিকে ওদের বাড়িতে। তখন মনে মনে ওকে হিংসে করতেন শিবদাস। সাহেবদের সঙ্গে ব্যবসা করে বাবা প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। ইচ্ছে করলে সাত পুরুষ ওরা বসে খেতে পারে। কিন্তু জ্যোতিষ ছেলেটা খুব অদ্ভুত ধরনের। প্রচুর বই পড়ে। সব বিষয়ে ওর ভীষণ আগ্রহ। জানে না, এমন কোনও সাবজেক্ট নেই। নিজে কোনওদিন ফুটবল খেলেনি, তবু মাঝে মাঝে দেশ বিদেশের ফুটবল নিয়ে এমন সব কথা বলে, হাঁ করে তা শোনেন শিবদাস। মাঝে কিছুদিন উধাও হয়ে গেছিল। কবে ফিরল, কে জানে?

চোখাচোখি হতেই জ্যোতিষ উৎসাহভরে বলে উঠল, 'আরে শিবদাস তুমি! কাগজে তোমাদের খপর পড়চি। এই... শিগগির নেমে, আমার গাড়িতে এসো। জরুরি কতা আচে।'

এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে লাভ নেই। ভাড়ার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে শিবদাস উঠে পড়লেন জ্যোতিষের ফিটন গাড়িতে। বললেন, 'তুমি কোতায় ছিলে অ্যাদ্দিন?'

'ইংল্যান্ডে। ফোটোগ্রাফির একটা কোর্স করতে গেসলুম। খুব ইন্টারেস্টিং। ওদের মুভি ক্যামেরার প্রচলন হয়েচে। সেটাই শিকে এলুম।'

'ঠিক বুঝলুম না ভাই।'

'সায়েন্স কত এগিয়েচে জানো ভাই... সব মিরাকল হচ্চে। অ্যাদ্দিন ছবি তুললে... সেই ছবি চলাফেরা করত না। এখন এমন ক্যামেরা এসে গ্যাচে, সেই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুললে সব কিছু ইনট্যাক্ট ধরে রাকা যায়। এই যেমন আমরা গাড়ি করে যাচ্চি, এই ছবি তুলে রাকলে...পর্দায় ফেলে পরে তুমি দেখতে পাবে...গাড়িটা চলচে। রাস্তাঘাটের সব কিছু দেখা যাচ্চে।'

শুনে অবাক হয়ে গেলেন শিবদাস। বললেন, 'সেই ক্যামেরা তুমি কিনে এনেচ না কি?'

'হ্যাঁ ভাই। আশ্চর্য ক্যামেরা। আমি একন সেই ক্যামেরায় হাত পাকাচ্চি। কলকাতার বিভিন্ন পেশার মানুষ জনের ছবি তুলে বেরাচ্চি। পরে সে সব লন্ডনে পাটিয়ে দেব। যাক গে, যে কারণে তোমায় আমি খুঁজছিলুম। সেদিন গড়ের ঢালে গেসলুম। দেখলুম, শিল্ডের খেলায় খুব জনসমাগম হয়েচে। তখনই আমার মাতায় ক্লিক করে গেল। ফুটবল খেলার ছবি তুলে রাকলে কেমন হয়? ওদেশে আমি দেকেচি। এফ এ লিগের ম্যাচ দেকতে গিয়ে দেকলুম, ফোটোগ্রাফাররা মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলে রাকচে। সেই ছবি সারাজীবন কিন্তু থেকে যাবে।'

ক্যামেরার কথা ভুলে গেলেন শিবদাস। বললেন, 'তুমি এফ এ লিগের ম্যাচ দেকেচ? সত্যি, তোমার কী কপাল! কার কার ম্যাচ দেকলে ভাই?'

'লিভারপুর, শেফিল্ড ইউনাইটেড, বার্নলে, চেলসি, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ওফ, কী সব খেলা। তবে কী জানো ভাই, ফুটবল খেলাটা এখনও ওদেশে ওয়ার্কিং ক্লাসের মধ্যেই রয়ে গেল।'

'আচ্ছা ভাই, লিভারপুর, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড—এই টিমগুলো কি আমাদের একেনে যে সব গ্যারিসন টিম খেলতে আসে, তার থেকে ভাল?'

'ভাল মানে? একশো গুণ ভাল। ফুটবল কী গতিতে যে এগুচ্চে...সেটা তোমাদের জানা দরকার শিবদাস। কত পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্চে ওদেশে। জানো, এ ব্যাপারে ইংরেজদের থেকে এককদম এগিয়ে রয়েচে স্কটিশরা। ফুটবলে এই যে পাসিং গেম আজকাল তোমরা খেলো, তা কাদের আবিষ্কার জানো? স্কটল্যান্ডের। দেকবে, আর কিছুদিনের মধ্যে ওরা ডবলিউ এম সিস্টেম চালু করে দেবে।'

'ডবলিউ এম সিস্টেম মানে?'

'আমি কী ছাই অত জানি। আমার এক রুমমেট ছিল গিবসন। সে ভারি ফুটবল ফ্যান। সে-ই আমায় ইন্টারেস্ট ধরিয়েচিল। ইংল্যান্ড থেকে আসার সময় তোমার কতা একদিন মনে হল। তাই জাহাজে ওঠার আগে তোমার জন্য একটা ট্যাকটিকসের বই কিনে রাকলুম। বইয়ে ছবি দিয়ে দিয়ে সব বোঝানো আচে। তোমার বুঝতে অসুবিধে হবে না কো।'

'ভাগ্যিস তোমার সঙ্গে দেকা হয়ে গেল। আমরা তো সাহেবদের যা কিচু দেকি, তাই শিকি।'

'বই পড়ে অনেক শেকা যায় শিবদাস। আরে ফুটবলের যে সব টেকনিক আচে, তার কত ভ্যারাইটি, বই দেকলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। জাহাজে আসার সময় আমি এই বইয়ের পাতা উল্টে পাল্টে দেকতুম। আমারই অনেক শেকা হয়ে গেল।'

'তাই নাকি? যেমন?'

'এই ধরো... কিকিং দ্য বল। কীভাবে তুমি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে শট নেবে, কীভাবে সোয়ারভিং শট বা পেনাল্টি...সব খুব সুন্দরভাবে বোঝানো রয়েচে। ভলি শট কত রকম...ওভারহেড কিক, লো ভলি, হাফ ভলি, হাই ভলি। জানো, তোমরা একেনে বড্ড বেশি ড্রিবলিং নির্ভর ফুটবল খেলো। কিন্তু ওকানে ফিলোজফিটা আলাদা। ওদের ধারণা,

ফুটবলারের থেকে ফুটবল অনেক আগে গোলের কাচে পৌঁচয়। খুব বেশি সময় ওরা পায়ে বল রাকে না। বলটাকে বেশি দৌড় করায়।'

'বইটা তুমি আমার দেবে? আমি দুখীরামবাবুকে পড়তে দেব। উনি বেস্ট লোক।'

'তা তুমি দিও। কিন্তু আসল কতাটাই তোমাকে বলা হয়নি। জে এফ ম্যাডান নামে আমার এক বন্ধু আচেন। তিনি তোমাদের খেলার ডকুমেন্টারি ছবি তুলে রাকতে চান। উনি সিনেমা প্রোডাকসনেও নামচেন। এখন বলো, শিল্ড খেলার ছবি কী ভাবে তোলা যাবে?'

সিনেমা! খেলার ডকুমেনটারি ছবি! শিবদাস হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন জ্যোতিষের দিকে।

(ষোলো)

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড-এ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ম্যাকগ্রেগর। সেখানে শৈলেন বসুর সঙ্গে দেখা। এমনিতে শৈলেনবাবুকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু ফুটবল সমাজের লোক। তাই এড়িয়ে যেতে পারলেন না। ভদ্রতা করে তিনি বললেন, 'গুড মর্নিং মিঃ বাসু। হাউ আর ইউ?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'ফাইন...থ্যাঙ্ক ইউ। ভালই হল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।'

'কী ব্যাপারে বলুন তো?'

'শিল্ডের ব্যাপারে। রেঞ্জার্স ম্যাচের দিন আমাদের ওপর কী ইনজাস্টিস হয়েছে, নিশ্চয়ই...'

কথাটা শেষ করতে দিলেন না ম্যাকগ্রেগর। বললেন, 'ফুটবলের ব্যাপারে কোনও কথা থাকলে আপনি আইএফএ অফিসে আসতে পারেন। ও সব শোনার জায়গা এটা নয়।'

'কিন্তু আইএফএ অফিসে কি আপনাকে পাওয়া যায়? যখনই যাই, তখনই দেখি, আপনি ঘরের সামনে লালবাতি জ্বালিয়ে রেখেছেন।'

'দেখুন, আমি খুবই ব্যস্ত মানুষ। আমার পেশা আইনব্যবসা। ফুটবল নয়। কোর্টে সময় দিয়ে, খুব স্বল্প সময়ের জন্য আমি আইএফএ অফিসে যাই। তখন অভিযোগ শোনার সময় থাকে না। ও সব দেখার জন্য অন্য কর্তারা রয়েছেন। জয়েন্ট সেক্রেটারি মন্মথ গাঙ্গুলি আপনাদের লোক। অভিযোগটা তাঁর কাছে গিয়ে করছেন না কেন?' -

'করেছি। তিনি নিজেও সেদিন মাঠে ছিলেন। নিজের চোখে অবিচারটা দেখেছেন।'

'কী ইনজাস্টিস হয়েছে মোহনবাগানের ওপর?'

'রেফারি সার্জেন্ট হাসকিন্স অন্যায্য একটা পেনাল্টি দিয়েছেন।'

'উনি ক্যালকাটা রেফারি'জ অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। আমরা কী করতে পারি?'

'দয়া করে আমাদের আর কোনও ম্যাচে ওঁকে রেফারিংয়ের দায়িত্ব দেবেন না।'

'দ্যাট আই কানট অ্যাসিওর ইউ মিঃ বাসু। তা হলে প্রত্যেকটা টিম পছন্দের রেফারি চাইতে শুরু করবে। শিল্ডের খেলা শেষ করা যাবে না।' কথাগুলো বলেই পা বাড়ালেন ম্যাকগ্রেগর। এক পা এগিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনাদের বিরুদ্ধেও রেফারিরা অভিযোগ করে গেছে। আপনারা নাকি প্রচুর লোক অর্গানাইজ করে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন। তাদের দিয়ে রেফারির ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি করছেন?'

'টোটালি লাই। লোকে আমাদের খেলা দেখার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে মাঠে যাচ্ছে। বুধবারও দেখবেন, হাজার দশেক সাপোর্টার হাজির থাকবে ডালহৌসি মাঠে।'

'তাই নাকি? তা হলে তো আমাকে বেশি করে মাউন্টেড পুলিশ আনাতে হবে মাঠে। মিঃ বাসু, প্লিজ আপনাদের সাপোর্টারদের বলে দেবেন, তারা যেন সংযত আচরণ করে। যখন তখন মাঠে না-ঢুকে পড়ে। কেননা খেলাটা একটা মিলিটারি টিমের সঙ্গে। ডোন্ট ফরগেট, ওরা ফোর্ট উইলিয়ামের টিম। ওদেরও সতীর্থরা মাঠে খেলা দেখতে আসবে। কোনও ম্যাসাকার হোক, আমি চাই না।'

ম্যাকগ্রেগরের কথার প্রচ্ছন্ন হুমকি। সেটা লক্ষ করে শৈলেনবাবু বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। ম্যাচটা আমরা এগারোজনে খেলেই জিতব। চোদ্দোজনে খেলে নয়।'

শুনে মুখ কালো ম্যাকগ্রেগরের। দাঁত চেপে তিনি বললেন, 'আপনাদের শিল্ডে খেলতে দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে।'

'সরি মিঃ ম্যাকগ্রেগর, খেলতে দিয়ে আপনারা আমাদের কৃতার্থ করেননি। আমরা অতীতে ডালহৌসিকে হারিয়েছি, ক্যালকাটাকে হারিয়েছি। গর্ডন হাইল্যান্ডার্সের মতো আর্মি টিমও টানা ছয়দিন ম্যাচ খেলে আমাদের হারাতে পারেনি। মোহনবাগান এখন আপনাদের আতঙ্ক। শিল্ডে খেলতে না দিলে আপনারা অন্যায় করতেন।'

'আপনার আর কিছু বলার আছে?'

'না, শুধু এটুকুই বলতে চাই, আপনারা নিরপেক্ষ হোন। আফটার অল, আইএফএ ইজ আ পেরেন্ট বডি। দয়া করে খেলার মধ্যে রাজনীতি টেনে আনবেন না।'

লোকটার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর কথা না বাড়িয়ে ম্যাকগ্রেগর ব্যাঙ্কের ভেতর ঢুকে গেলেন।

বাবুদের আজকাল খুব বাড় বেড়েছে। এত কথা না বললেই ভাল হত। ম্যাকগ্রেগর গটগট করে ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে গেলেন। ম্যানেজার টমাস হার্ডিঞ্জ বন্ধুস্থানীয়। হাসিমুখে আপ্যায়ন জানিয়ে বললেন, 'ওয়েলকাম ম্যাক। অনেকদিন পরে এলে। আমি ভাবলাম, দেশে গিয়েছ।'

টুপিটা র‍্যাকে ঝুলিয়ে ম্যাকগ্রেগর বিরক্তি সহকারে বললেন, 'যা অবস্থা হচ্ছে, খুব শিগগিরই পাততাড়ি গুটিয়ে...আমাদের সবাইকে দেশে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন, তোমার আবার কী হল?'

শৈলেনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তাগুলো উগরে দিলেন ম্যাকগ্রেগর। তার পর বললেন, 'ব্ল্যাকি পাস্টার্ডদের শিল্ডে খেলতে দেওয়াই আমার উচিত হয়নি।'

হার্ডিঞ্জ বললেন, 'ধীরে বন্ধু ধীরে। এত উত্তেজিত হলে আমাদের চলবে? প্রায় দু'শো বছর রাজত্ব করা হয়ে গেছে। আরও দু'শো বছর আমরা থাকব। ব্রিটিশদের এত কাপুরুষ আর বুদ্ধিহীন ভাবছ কেন, সেটাই আমি বুঝতে পারছি না।'

'ভাবব না কেন বলো তো? এ দেশে থাকতে থাকতে আমাদের কিছু লোক সম্ভবত কাপুরুষ হয়ে গেছে। ভাবলেই ইরিটেশন হয়। বাবুদের জন্য তাঁদের দরদ উথলে উঠছে।'

'কার কথা তুমি বলছ?'

'মিঃ হোলি। তাঁকে তুমি চেনো নিশ্চয়। আবগারি দফতরের অফিসার। আফিম বেচে রাজার কোষাগারে টাকা এনে দিচ্ছে। নিজেকে কেউকেটা মনে করছে। সেদিন আইএফএ অফিসে এসে এই আইরিশ লোকটা আমার সঙ্গে তর্কাতর্কি করে গেল। তাও মোহনবাগানের মতো একটা নেটিভ ক্লাবের জন্য। কী হুমকি দিল, জানো? চিঠি দিয়ে লেফট্যানেন্ট গভর্নর ডিউককে সব জানাবে। তার পর তিনিও যদি কিছু না করেন, তা হলে রাজার কাছে চিঠি পাঠাবে। বাবুদের এত তোল্লাই দেওয়ার অর্থটা কী? এই কারণেই আইরিশদের আমি পছন্দ করি না।'

'তুমি কি শিল্ড খেলা নিয়ে অসন্তোষের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। মোহনবাগান টিমটা গলায় কাঁটা হয়ে গেছে এখন আমার। দুটো ম্যাচ জিতে ওরা ভাবছে শিল্ডে চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে।'

'ম্যাক, আমার প্রচুর ক্লায়েন্ট আছেন যাঁরা অর্থবান বাঙালি। তাই মুখ ফুটে কিছু বলা আমার সাজে না। তবে ভেতরের খবর আমি যা পাচ্ছি, তাতে বিরাট একটা এক্সপেক্টেশন তৈরি হয়েছে মোহনবাগানকে ঘিরে। এই তো কাল নাটোরের মহারাজার বাড়িতে বল নাচের পার্টি ছিল। তাতে কলকাতার এলিট সোসাইটির গণ্যমান্য প্রচুর লোক হাজির ছিলেন। অনেকের মুখেই মোহনবাগানের নামটা শুনলাম। বেঙ্গলি ইন্টেলেকচুয়ালস আর টেকিং ইন্টারেস্ট। এখন কিছু করে বোসো না, যাতে তোমার নাক কাটা যায়। প্লিজ, তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

'ড্যাম ইয়োর ইন্টেলেকচুয়ালস। দে হ্যাভ গট নাথিং টু ডু উইথ ফুটবল। আমি যা বলব, সেটাই শেষ কথা।'

'ম্যাক, তোমার প্রবলেমটা কী জানো, তোমার ইগো। তুমি মেনে নিতে পারছ না, এতদিন যাদের আমরা চাবুকের শাসনে রেখেছি, তারা এখন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ডোন্ট ফরগেট, দিস ইজ দেয়ার কান্ট্রি...মাদারল্যান্ড। দে আর সান'স অব দ্য সয়েল। ইউরোপ থেকে এসে আমরা উপনিবেশ স্থাপন করছি। এখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করে রাজার তহবিল ভর্তি করছি। রাজার যাঁরা পরামর্শদাতা, তাঁরা কোনওমতেই চাইবেন না, সেই অর্থাগমের সামনে কোনও রকম বাধা এসে দাঁড়াক। তাও সামান্য একটা খেলা...ফুটবলকে ঘিরে। স্বদেশি আন্দোলনের জন্য ইতিমধ্যেই বাংলা থেকে ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের প্রায় উঠেই গেছে। লোকে বিদেশি জিনিস কেনা কমিয়ে দিয়েছে। বুঝতেই পারছ, এ সব খবর আমাদের দেশে যাচ্ছেই। তার ওপর মিঃ হোলি...না কে, যাঁর কথা তুমি এখুনি বললে...তিনি যদি সত্যিই সত্যিই লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে অভিযোগ জানান, তা হলে তুমি প্রবলেমে পড়বে।'

হার্ডিঞ্জের কথায় যুক্তি আছে। তবু প্রকাশ্যে পাত্তা দিলেন না ম্যাকগ্রেগর। বললেন, 'তোমার এতদূর পর্যন্ত ভাবার কোনও কারণ নেই।'

'ভাবতে হয় বন্ধু। ইকনমিক ইন্টারেস্টের কাছে সব কিছুই যে শেষ পর্যন্ত মাথা নুইয়ে দেয়। তুমি আমার বন্ধু বলেই বলছি, সোস্যাল ইমপ্যাক্ট-এর কথা না ভেবে সমস্যাটা যদি ইকনমিক্যাল আর পলিটিক্যাল আসপেক্ট দিয়ে বিচার করো, দেখবে তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে যাচ্ছে। মোহনবাগান যদি শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়, তা হলে তোমার কী এসে গেল? দু'দিন পর তুমি কলকাতায় নাও থাকতে পারো।'

'তার মানে? তুমি কী বলতে চাইছ?'

'কিছু ইন্ডিগেশন পাচ্ছি, যাতে আমার মনে হচ্ছে, বছরের শেষে বড় একটা চমক তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেটা এই ক্রিসমাসের আগেই।'

'হেঁয়ালি না করে, খুলেই বলো না।'

'শোন বন্ধু, তোমাকে একটা গোপন কথা বলি। আমার ব্যাঙ্কের হেড কোয়ার্টার কলকাতা থেকে মাস চারেকের মধ্যেই দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার অর্ডার এসেছে। আমার মনে হয়, কলকাতার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হবে। আর তখন বাঙালির আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়বে। তার আগে, জেদাজেদি করে কেন তুমি দোষের ভাগী হবে বন্ধু? ভাল কথা, তুমি এখন যাবে কোথায়, কোর্টে?'

'না, আইএফএ গভর্নিং বডির একজন মেম্বারের বাড়িতে আজ লাঞ্চের নিমন্ত্রণ, বেলভেডিয়ারে। সেখানে যেতে হবে।'

'তা হলে আজ আমার বাড়িতে ডিনারে এসো না কেন?'

'না, আজ হবে না। ফুটবলের একটা মিটিং আছে সন্ধে সাতটায়। কখন সেই মিটিং শেষ হবে জানি না। অন্য একদিন দেখা হবে। তোমার সেই ইন্ডিয়ান খানসামাটি এখনও আছে? তার হাতের কাবাব খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমি কিন্তু এখনও ভুলিনি।' বলেই ম্যাকগ্রেগর হেসে উঠলেন।

...মিনিট দশেক পর ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলেন ম্যাকগ্রেগর। বাইরে চড়া রোদ্দুর। গরমে কোট-টাই, হ্যাট পরে থাকা খুব কষ্টের। কিন্তু পরতেই হবে। না হলে সিভিলিয়ান সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। প্রতি বছর গরমের সময় ম্যাকগ্রেগর সস্ত্রীক দার্জিলিং চলে যান। সেই সময় কোর্ট-কাছারি বন্ধ থাকে। সরকারি আমলারা সবাই ওখানে দৌড়ন। দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি পরিবেশে, ঠান্ডা আবহাওয়ায় মাস খানেক ছুটি কাটিয়ে আসেন। শিল্ডের খেলা শেষ হলেই ম্যাকগ্রেগরও রওনা হবেন শৈলশহরে। আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি।

বেলভেডিয়ারে যাওয়ার পথে ম্যাকগ্রেগর চিন্তা করতে লাগলেন, হার্ডিঞ্জ ঠিকই বলেছে। মোহনবাগান যদি শিল্ড জেতে, তা হলে তাঁর কী এসে গেল? বেঙ্গল পার্টিশন-এর জন্য বাবুরা খুব অসন্তুষ্ট। রোজ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এমন দুঃসাহস...কেউ কেউ বোমাও ছুড়ছে ব্রিটিশদের লক্ষ্য করে। কোর্টে উগ্রপন্থীদের ট্রায়াল চলছে রোজই। তখন তাঁদের মুখগুলো দেখে ম্যাকগ্রেগর অনেক সময় অবাক হয়ে যান।

এত অল্প বয়স, অথচ কী অকুতোভয়। কোর্টে দাঁড়িয়ে জজের সামনেই স্লোগান দিচ্ছে 'বনডে মাটরম' বলে।

আজ সকালেই ইংলিশম্যান কাগজে ম্যাকগ্রেগর একটা খবর পড়ে শিউরে উঠেছিলেন। ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি যুবককে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে গতকাল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পরে লালবাজারে জেরার মুখে সেই যুবকটি স্বীকার করে, জাস্টিস হ্যারিংটন ডানকানকে হত্যা করার জন্যই সে অপেক্ষা করছিল। খোঁজ নিয়ে সে জেনেছে, জাস্টিস হ্যারিংটন ডানকান রোজ ঠিক ওই সময়েই ওই পথ দিয়ে বাড়ি ফেরেন। পুলিশ ছেলেটির ধুতির খোঁট থেকে একটা পিস্তল উদ্ধার করেছে। সে নাকি আরও বলেছে, হাইকোর্টের কিছু আইনজীবীও তাদের হিটলিস্টে রয়েছে।

বেলভেডিয়ারে যাওয়ার পথে ম্যাকগ্রেগর ঠিক করে নিলেন, অতঃপর নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে অস্ত্র রাখতে হবে। কলকাতা আর তেমন নিরাপদ নয়।

(সতেরো)

প্র্যাকটিসের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুতে এসে শিবদাস দেখলেন, মনমোহন ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত। মনমোহন গেল কোথায়? টিমের লেফট হাফব্যাক। রেঞ্জার্স ম্যাচে খুব সুবিধে করতে পারেনি। গত দু'দিন ধরে মনমরা হয়ে ছিল, নীলু পেছনে লেগেছিল বলে। চটজলদি ছড়া বাঁধতে নীলুর জুড়ি নেই। মনমোহনকে খালি বলে যাচ্ছে, 'মনমোহন মনমোহন কেন তুই মনমরা, কোতায় গেল তোর বল ধরা আর বল ছাড়া।' মনমোহন এমনিতেই আত্মমুখী টাইপের ছেলে। লজ্জায় এখন মুখ লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

শিবদাস জানেন, মনমোহন যা-ই খেলুক না কেন, টিমের পক্ষে খুব জরুরি। অফুরন্ত দম। সারা মাঠ চষে বেড়াতে পারে। পর পর দুটো ম্যাচ খেলেও ও ক্লান্ত হয় না। আসলে ও রাইট হাফব্যাক পজিশনের প্লেয়ার। কিন্তু নীলুকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য এই টুর্নামেন্টে বাঁ দিকে খেলছে। মাঠটা মনমোহন পরিষ্কার দেখতে পায়। নিজের গোল থেকে বল জোগাড় করে নিয়ে...ও অপোনেন্ট গোল পর্যন্ত বল নিয়ে যেতে পারে। অসম্ভব ফুটবল বুদ্ধি।

পোশাক বদলে প্র্যাকটিসের জন্য শিবদাস তৈরি হচ্ছেন, এমন সময় নীলু বলল, 'ওই যে উনি এসে পড়েচেন। চল, এ বার নেমে পড়া যাক।'

শিবদাস পায়ে শাড়ির পাড় বাঁধতে বাঁধতে তাকিয়ে দেখলেন, মনমোহন তাঁবুতে ঢুকছে। জামাটা ঘামে ভিজে রয়েছে। বোধহয় অনেকটা হেঁটে এসেছে। মনমোহনকে তিনি বললেন, 'কী রে এত দেরি হল তোর আসতে? কোতাও আটকে গেচিলি নাকি?'

মনমোহন বলল, 'আর বোলো না কো শিবেদা। ঘাটে এসে দেকি, মাঝিদের ধর্মঘট। একটা নৌকোও নেই। তকন কী আর করি। নতুন ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করলুম। কিন্তু বালির এক ভদ্রলোক ফিটনে করে এ দিকে আসচিলেন। আমায় দেকে চিনতে পারলেন। বললেন, আপনি মোহনবাগানের প্লেয়ার। হেঁটে যাবেন কেন? উটে আসুন গাড়িতে। উনিই পৌঁচে দিয়ে গেলেন।'

মনমোহন থাকে উত্তরপাড়াতে। রোজ গঙ্গা পেরিয়ে এ পারে আসে। কোনও অসুবিধে হয় না। যাত্রী নৌকো চালায় ক্যালকাটা ল্যান্ডিং অ্যান্ড শিপিং কোম্পানি। দু'সপ্তাহ আগে মাঝিরা মাইনে বাড়ানোর দাবি তুলেছিল। কোম্পানি তাতে কান দেয়নি। কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত চারশো মাঝি। সবাই মিলে এ বার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ফলে বালি, উত্তরপাড়া, কোন্নগরের লোকদের কলকাতায় আসতে খুব সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ছয় সাত বছর আগে সাহেবরা হাওড়া ব্রিজ করে দিয়েছে। কিন্তু লোকে এখনও সেই ব্রিজ দিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করে। অত বড় ঝোলানো ব্রিজ, যদি খুলে পড়ে যায়? শিবদাস দাদার মুখে শুনেছেন, একেবারে শুরুর দিকে, ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে আসার...উৎসাহ দেওয়ার জন্য নাকি একটা করে রসগোল্লা উপহার দেওয়া হত।

নীলু ফিসফিস করে বলল, 'মনমোহন স্টার হয়ে গ্যাচে। ওকে নিয়ে এইমাত্তর একটা ছড়া বাঁধলুম। বলব নাকি, শিবে?'

শিবদাস ধমকে উঠলেন, 'চুপ মার। আজ বাদে কাল খেলা। ফক্কড়ি করা হচ্ছে।'

নীলু হার মানার ছেলে নয়। ও বলল, 'ঠিক আচে। প্র্যাকটিসের পর বলব। তকন কিন্তু মানা করতে পারবি নে।'

গতকাল শিবদাসের জীবনে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে, মনের ভেতরটা বুদবুদের মতো ফুটছে। কখন সহখেলোয়াড়দের কাছে তা উগরে দেবেন, তিনি তার অপেক্ষাতেই আছেন। জ্যোতিষের আনা ওই বইটা...বৈঠকখানায় বসে কাল রাতে উল্টে পাল্টে তিনি দেখেছেন। বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো এসে গেছে। তাই সুবিধে। পড়তে পড়তে যেন একটা অজানা জগৎ চোখের সামনে খুলে গেছে। ড্রেস করার পর সবাইকে গোল হয়ে বসতে বললেন শিবদাস। তার পর বললেন, 'একটা ভাল খবর আচে। আমার এক বন্ধু জ্যোতিষ ইংল্যান্ড থেকে নতুন ধরনের ক্যামেরা নিয়ে এয়েচে। আমাদের খেলার ছবি তুলবে। পরে নাকি সেই খেলা আমরা দেকতে পাব।'

নীল পুট করে ফোড়ন কাটল, 'তা'লে তো সাহেবদের মুশকিল হয়ে গেল। রেফারি যদি পার্সিয়ালিটি করে, পরে আমরা ধরতে পারব।'

অবাক হয়ে শিবদাস তাকিয়ে রইলেন নীলুর দিকে। সত্যিই তো, কত ম্যাচে সাহেব রেফারিরা জোর করে পেনাল্টি বসিয়ে দেয়, প্রোটেস্ট করা যেতে পারে! কী বুদ্ধি নীলুটার। শিবদাস বললেন, 'তুই ঠিক বলেচিস, আমাদের খুব সুবিধে হবে।'

নীলু ফের বলল, 'না রে শিবে, ছবি তুলে রাখা ঠিক হবে না। ভুতি যে সব বাজে বাজে গোল খাইয়ে দেয়, সেগুলোর ডকুমেন্ট থেকে যাবে। জ্যোতিষকে তুই বারণ করে দে।'

ভুতি সুকুল ছাড়া বাকি সবাই হেসে উঠল নীলুর কথা শুনে। সুকুল রেগে বলল, 'আর তুই যে বাজে বাজে গোল মিস করিস?'

শিবদাস থামিয়ে দিলেন দু'জনকে। 'মস্করা নয়। মনে রাকিস, কাল কিন্তু খেলা মিলিটারি টিমের সঙ্গে। সোমবার রাইফেল ব্রিগেডের সেকেন্ড রাউন্ডের ম্যাচটা আমি আর সুধীর...এসে দেকে গেচি। ওদের অপোনেন্ট ছিল ব্রিস্টল ইউনাইটেড। সাহেবদের সবথেকে

দুর্বল টিম। রাইফেল ব্রিগেড ম্যাচটা জিতল এক গোলে। কিন্তু ওদের খেলার স্টাইল দেকে মনে হল, আমাদের ঝামেলায় ফেলে দেবে। ওদের বদলে আমাদের দিকে যদি মিডলসেক্স টিমটা থাকত, তা হলে সুবিধে হত। ফার্স্ট মিডলসেক্স টিমটার কথা আমি বলচি না। ওরা বেশ স্ট্রং টিম। আমি থার্ড মিডলসেক্স...মানে দমদমার টিমটার কথা বলচি। মেসারার্সের এগেনস্টে ওরা জিতেছে এক শূন্য গোলে।'

ইনসাইড রাইট হাবুল সরকার কম কথা বলে। ওর ভাল নাম শ্রীশচন্দ্র সরকার। কিন্তু সবাই ওকে হাবুল বলেই ডাকে। ও জিজ্ঞেস করল, 'কেল্লার দল আমাদের ঝামেলায় ফেলে দেবে বলচিস কেন?'

শিবদাস বললেন, 'ওদের দু'টো ব্যাক একেবারে থামের মতোন। ম্যাডেন আর ক্লার্ক। ম্যাডেনকে আমি আর বিজেদা বুঝে নেব। কানু তোকে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস খেলতে হবে। ক্লার্ক ব্যাটাচ্ছেলে ভীষণ হার্ড ট্যাকলার। ওকে সামলে। ওর খেলার ধরনটা আমি ভাল করে দেকে রেকেচি। তোকে একটা টিপস দিয়ে রাকি। সেদিন দেকলুম, ক্লার্ক একটু লেট ট্যাকল করে। বলটা একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চোকে চোকে রাখে। তুই কিন্তু ড্রিবলের টাইমটা সেইভাবে ঠিক করবি। ও যত তোকে ঠেলতে ঠেলতে লাইনের দিকে নিয়ে যাবে, তুই ততই ওকে ফোর্স করবি ভেতরে কাট করতে। সেই সময় মনমোহন তুই চেষ্টা করবি ডান দিকের লাইন বরাবর থাকতে। কানু ভেতরে ঢোকার ভান করে বাঁ পায়ে তোকে ডান দিকে পাস বাড়াবে। বুঝলি, তকন অনেকটা জায়গা তুই কিন্তু ফাঁকা পেয়ে যাবি।'

কানু ঢাকার ছেলে। ভাল নাম যতীন্দ্রনাথ রায়। টিমের অন্যদের থেকে ও একটু আলাদা। বেশ লম্বা, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কানু ধনী পরিবারের ছেলে, তার ওপর লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভাল। ওর বাবা রায়বাহাদুর অক্ষয় রায়কে ঢাকায় একডাকে সবাই চেনেন। ঢাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ডিভিশনে পাশ করে কানু পড়তে এসেছে প্রেসিডেন্সি কলেজে। দেশে থাকার সময় খেলত উয়াড়ি ক্লাবে। কলকাতায় এসে মোহনবাগানে সুযোগ পেয়ে যায়। লোকে বলে, দক্ষতার বিচারে শিবদাসের পরেই রাখতে হবে কানু রায়কে। ওর অসম্ভব গতি। শিবদাসের থেকেও বেশি। কানু একবার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেলে ওকে আর ধরে যায় না। স্পিড ছাড়া ওর আর যেটা ভাল, সেটা হল সেন্টারের অ্যাকুরেসি। লাইন থেকে চোখ বুজে ও সেন্টার করে গোলমুখে। একেবারে প্লেয়ারের মাথায়।

শিবদাস ওকে ভেতরে কাট করার কথা বলছেন দেখে, অভিলাষ বললেন, 'দাদা, কানুরে ভিতরে ঢোকানের কথা কইত্যাসেন, তাইলে অ্যাকুরেট সেন্টারটা করব কে? আমি তো বল পামু না।'

'ঘাবড়াস না। এই একটা ম্যাচ ওকে এই স্ট্র্যাটেজিতে খেলতে বলচি। রাইফেল ব্রিগেডের গোলকিপার নর্টনকে আমি দেকেচি। ওপরের বলে কোনও চান্স দেয় না। স্পট জাম্পটা ওর এত ভাল। বলে বলে তোর মাতা থেকে বল কেড়ে নেব। সেই সুযোগ আমি ওদের দেব না। ওকে আমি গ্রাউন্ডে বিট করতে চাই, বুঝলি। তা ছাড়া ব্যাটাচ্ছেলে লাফিয়ে বল ধরার সময় বিশ্রী কনুই চালায়। সেদিন ব্রিস্টলের সেন্টার ফরোয়ার্ডটাকে এমন গুঁতো মারল, বেচারি হাফ টাইমের পর আর খেলতেই পারল না। তোরও সেই অবস্থা হোক, আমি চাইনে।'

শিবদাস প্রত্যেক প্লেয়ারকে ডিউটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সাগ্রহে সবাই শুনছে। ম্যাচের আগের দিন কড়া প্র্যাকটিস করান না শিবদাস। খেলা নিয়ে আলোচনা করার পর আধ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট হালকা ব্যায়াম করে...শুটিং, কিকিং। এ দিকে, ক্লাবের কর্তারা এসে হাজির হয়েছেন। শৈলেন বসু, মণিলাল সেন, প্রফুল্ল রায়রা। তবুও তাঁবুতে পিনড্রপ সাইলেন্স। কেউ কোনও কথা বলছেন না। বাইরেও জড়ো হয়েছেন বেশ কিছু সাপোর্টার। বেশিরভাগই উত্তর কলকাতার লোক। কোচিং ক্লাস শেষ করে, শিবদাস এ বার জ্যোতিষের আনা ট্যাকটিকসের বইটার কথা বললেন। বোঝাতে শুরু করলেন, বইতে তিনি দেখেছেন, অঙ্ক কষে কীভাবে ফুটবল খেলা যায়।

একটু পরে প্র্যাকটিসের জন্য টিম নিয়ে বাইরে বেরিয়ে শিবদাস দেখলেন, আকাশে বেশ মেঘ। যে কোনও সময় বৃষ্টি আসতে পারে। মনে মনে তিনি প্রার্থনা করলেন, ভগবান যা বৃষ্টি হওয়ার, আজ হয়ে যাক, কাল খেলার সময় যেন বৃষ্টি না আসে। শুকনো মাঠে কেল্লার দলটাকে তিনি বুঝে নেবেন। কিন্তু মাঠ পেছল হয়ে গেলে...জেতা কঠিন।

'আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছ শিবদাস? বৃষ্টিটা আজই হয়ে যাক?'

প্রশ্নটা শুনে ঘাড় ঘোরালেন শিবদাস। গণেন মল্লিক। অমৃতবাজার কাগজের রিপোর্টার। মনের কথাটা বলে দেওয়ায় মৃদু হেসে শিবদাস বললেন, 'ঠিক এই কতাটাই আমি ভাবছিলুম।'

'তোমার টিমের অবস্থা কী র'ম বুঝছ?'

'ঠিক আচে। এখন লাক বিট্রে না করলে হয়।'

'করবে না। দেখো আমি বলছি, তোমরাই চ্যাম্পিয়ন হবে। বিধির বিধান। সব লেখা হয়ে আচে।'

'ওদের টিমটা তো ভাল। তাই একটু চিন্তায় আচি। সে যাক, আপনি কোত্থেকে?'

'ম্যাচ কভার করতে এসেচিলুম। ইস্ট ইয়র্কশায়ার ভার্সাস রয়াল স্কটের ম্যাচ।'

'ম্যাচটা কাল ড্র হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ, আজ ইস্ট ইয়র্কশায়ার তিন-দুই গোলে জিতেছে। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে গেল কি না বলতে পারব না। রয়াল স্কট কী একটা প্রোটেস্ট করতে আইএফএ-তে গেচে। মনে হয়, সলিড কোনও গ্রাউন্ড আচে। আবার রিপ্লে হবে।'

'একটা ম্যাচ তিনবার করে খেলতে হবে?'

'কী আর করা যাবে। শোন শিবদাস, তোমাকে একটা খবর দেওয়ার আচে। কাল গভর্নিং কাউন্সিলের মিটিং ছিল। তোমাদের হয়ে খুব লড়লেন রেঞ্জার্সের মিঃ রসার।'

'কী বলচেন আপনি? শৈলেনবাবু স্যারের মুখে তবে যে শুনলুম, রেঞ্জার্সের ওরা আমাদের এগেনস্টে কমপ্লেন করেচিল।'

'আমারও তাই জানা ছিল। কিন্তু কাল মিটিংয়ে গিয়ে মনে হল, কথাটা রটিয়ে দেওয়ার পিচনে রয়েছে ডালহৌসি অথবা ক্যালকাটা ক্লাব।'

'না না, ক্যালকাটা নয়। ওরা অত আনস্পোর্টিং নয়। আমাদের সঙ্গে একবার অসভ্যতা

করেচিল বটে, পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েচে। মনে হয়, ডালহৌসি হবে। ওরা ভীষণ আনস্পোর্টিং।'

দু'জনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, এমন সময় দেখলেন সাদা-কালো জার্সি পরা একদল প্লেয়ার কাস্টমস মাঠের দিক থেকে আসছে। খুব লম্বা চওড়া, ভাল স্বাস্থ্যের ছেলে সব। মুসলমানদের ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং নাকি! কলকাতার আসরফি মুসলমানদের এই টিমটাকে ঢাকার নবাব নাকি প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। খুব দ্রুত উঠে আসছে টিমটা। কিন্তু না, মহমেডান তো শিল্ডে খেলার সুযোগ পায়নি। শিবদাস তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন টিম গণেনবাবু? চেনেন?'

গণেন মল্লিক বললেন, 'মনে হয়, মোসলেমস ক্লাব হবে। আজ ওদের খেলা ছিল গর্ডন হাইল্যান্ডার্স টিমের সঙ্গে। মনে হয়, গর্ডন টিম দেয়নি। মোসলেমস ক্লাবটার পেডিগ্রি নেই বলে।'

শুনে মনে মনে শিবদাস হাসলেন। সাহেবরা ভাঙবে, তবু মচকাবে না। কিসের পেডিগ্রি? ক'দিন পর তো হারতে হারতে হারাধন হয়ে যাবে। ওদের গুমোরটা প্রথম মোহনবাগানই ভাঙবে। আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। কথাটা ভাবতে ভাবতেই শিবদাস প্র্যাকটিসে নেমে গেলেন।

(আঠেরো)

কুমুদিদির বাড়িতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন লাবণ্যপ্রভা। কাজের মেয়ে মেনকা এসে বলল, 'দিদি তোমায় কত্তাবাবু ডাকচেন।'

কত্তাবাবু মানে বাবা। জগদীশচন্দ্র মিত্র। কয়েকদিন ধরে বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। জ্ঞাতিদের সঙ্গে মামলা করে করে তিনি ক্লান্ত। ইদানীং আর বাইরে বেরতে চান না। আসলে পরিচিতদের মুখ দেখতে চান না। বাবা হঠাৎ কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেছেন। উদ্বিগ্ন হয়ে লাবণ্যপ্রভা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাবা এখন কোতায় রে?'

মেনকা বলল, 'বৈঠকখানা ঘরে। বসে কাগজ পড়চে।'

'তুই গিয়ে বল, দিদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসচে।'

চট করে হালকা প্রসাধন সেরে নিলেন লাবণ্যপ্রভা। বাবা কাগজ পড়ছে মানে...শরীর ঠিক আছে। সুস্থ থাকলে রোজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ে বাবা। সমসাময়িক রাজনীতির খবর রাখে। প্রচুর বই ও ম্যাগাজিন কেনে। মিত্তিরবাড়ির পুরুষরা মদ আর মেয়েমানুষে প্রচুর টাকা উড়িয়েছে। সত্যি বলতে কী, মোহন ভিলার আর্থিক দুরবস্থার আসল কারণই তাঁদের বিলাসী জীবন। বাবা কিন্তু ব্যতিক্রম। সারা জীবন বইয়ের দিকে মুখ গুঁজেই কাটিয়ে দিল।

মিনিট কয়েক পর বৈঠকখানায় ঢুকলেন লাবণ্যপ্রভা। 'আমাকে ডেকেচ বাবা?'

চোখের সামনে থেকে কাগজটা সরিয়ে জগদীশ বললেন, 'কোতায় বেরুচ্চিস না কি মা?'

'হ্যাঁ বাবা। কুমুদিদির বাড়ি যাচ্চি। আজ ওকেনে রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সাধু আসার কতা। ওঁদের কী সমস্যা হয়েচে। উনি কথা বলবেন অনুশীলন সমিতির মেম্বারদের সঙ্গে।'

'তোকে একটা কতা বলার ছিল মা। তুই কি ভাদুড়িদের বাড়িতে একনও যাস?'

'হ্যাঁ বাবা। এই তো কয়েকদিন আগেই গেচিলাম। চারুদিদির কাচ থেকে সুতো আনতে। কেন, তোমার কি কোনও দরকার আচে?'

'শিবদাসকে একবার আমার কাচে আসতে বলবি? কাগজে ওদের সম্পর্কে পড়চি। আর গর্বে বুক ভরে উঠচে। মোহনবাগান শিল্ডে এত ভাল খেলচে, ওকে একবার প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে চাই।'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে লাবণ্যপ্রভা একটু বিষণ্ণবোধ করলেন। এই মোহন ভিলাতেই মোহনবাগান ক্লাবের জন্ম। সেই ক্লাব এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্লাবের কথা বাবা ভুলবে কেমন করে? জন্মের পর মাত্র তিন বছর ক্লাব এই বাড়িতেই ছিল। কিন্তু পরে মনোমালিন্য হওয়ায় না কি লাহা কলোনির মাঠে উঠে যায়। বোসবাড়ির লোকজন তখন ক্লাবের হাল ধরে নেন। লাবণ্যপ্রভা সেই ইতিহাস জগদীশের মুখেই শুনেছেন। বাবাকে তিনি বললেন, 'বোসবাড়িতে একবার যাও না বাবা। ওকেনে গেলেই তো শিবদাসদাদাকে তুমি পেয়ে যাবে। তোমাকে দেকলে ওরা খুব খুশিও হবে।'

জগদীশ বললেন, 'না রে। অ্যাদ্দিন পর হঠাৎ আমার যাওয়া ভাল দেকাবে না। তুই একবার শিবদাসকে বলে দেকিস। ও এলে আমার ভাল লাগবে। তা ছাড়া ওকে একটা জিনিসও দেওয়ার আচে। আমার বাবা রেকে গেচিলেন। আমি ছাড়া সে কথা আর কেউ জানে না।'

'কী জিনিস বাবা?'

'সে কতা ওকেই আমি বলব। বাবার কত স্বপ্ন ছিল মোহনবাগানকে নিয়ে। আমায় বলত, দেখবি, একদিন না একদিন মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড জিতবে।'

'মোহনবাগান কি শিল্ড জিতে গেছে বাবা?'

'না একনও জেতেনি। তবে আমার মন বলচে, এ বার জিতবে। সেই কারণেই তো শিবদাসকে আসতে বলচি। সে দিন হেমবাবু এয়েচিলেন আমার কাচে। উনি রোজ মোহনবাগানের খেলা দেকচেন। আমায় বলে গেলেন, মিত্তিরমশাই একাদশে সূর্যোদয় হবেই। শিবদাসরা যা খেলচে, ওরা নতুন ইতিহাস গড়ে দেবে। তুই একবার শিবদাস বাবাজিকে আসতে বলবি মা।'

লাবণ্যপ্রভা বললেন, 'নিশ্চয় বলব বাবা। আজই ও বাড়িতে গিয়ে কয়ে আসব। কিন্তু উনি কি আসতে পারবেন? খেলা নিয়ে নিশ্চয়ই ব্যস্ত আচেন। একন আসি তা'লে?'

'আয় মা। তাড়াতাড়ি ফিরিস। তোর জন্য এদানীং আমার খুব অ্যাংজাইটি হচ্চে মা। বিয়ে থা করলি না। কী, না মনের মতো ছেলে না পেলে বিয়ে করবি না। তাই দেশের কাজে নেমে পড়লি। তোকে আমি বাধা দিইনি। তোর কতায় সখী সমিতিকে আমি জায়গা দিয়েচিলুম। কিন্তু এখন বাড়িতে পুলিশ আসা যাওয়া করচে। সাহেবদের পুলিশকে জানিস। কী বর্বর ওরা। সমিতির জন্য তোর যদি কোনও ক্ষতি হয়, আমি সহ্য করতে পারব না মা।'

'তুমি চিন্তা কোরো না বাবা। পুলিশ আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।'

কথাগুলো বলে লাবণ্যপ্রভা বাইরে বেরিয়ে এলেন। সখী সমিতির আপিসে এখনও মেয়েরা আসেনি। ওদের হাতের কিছু কাজ এ দিক সে দিক পড়ে আছে। একটা পট-এর দিকে চোখ গেল লাবণ্যপ্রভার। মাটির গোল সরায় মা লক্ষ্মীর ছবি। বাঃ, খুব সুন্দর হয়েছে তো! এ নিশ্চয় তারাসুন্দরীর কাজ। মেয়েটা এমন বেখেয়ালে, পট মেঝেয় ফেলে রেখে চলে গেছে। লাবণ্যপ্রভা পট তুলে রাখলেন বেঞ্চের ওপর। বেঞ্চের দিকে তাকাতেই তাঁর মনে পড়ল নেবুতলার মেয়েটার কথা। সে দিন সে এই বেঞ্চেই শুয়েছিল। নাম হরিমতী। সারাটা দিন ওই মেয়েটাকে নিয়েই ঝক্কি পোহাতে হয়েছিল।

কুমুদিদির বাড়ি সেই আহিরীটোলার দিকে। সারদাচরণ আর্য বিদ্যালয়ের কাছে। গাড়িতে উঠে সেদিকে যাওয়ার সময়ও লাবণ্যপ্রভার মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল হরিমতীকে নিয়ে। সে দিন ওর স্বামী সঙ্গে পুলিশ নিয়ে এসেছিল। সখী সমিতিতে না কি হরিমতীকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। লোকটা কী করে জানল, ওর বউ সখী সমিতিতে আশ্রয় নিয়েছে? পুলিশ হরিমতীকে থানায় নিয়ে যেতে চাইছিল, অথচ সে যেতে চায় না। চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছে। একবার পুলিশের, আর একবার লাবণ্যপ্রভার পায়ে ধরছে। শ্বশুরবাড়িতে গেলে না কি ওকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে। লোকলজ্জার মাথা খেয়ে শেষে হরিমতী পুলিশকে...ওর সারা গায়ে মারের চিহ্ন দেখায়। ইতিমধ্যে কুমুদিদি এসে পড়েন একজন ল'ইয়ার নিয়ে। তার পরই পুলিশ পিছু হাঁটতে শুরু করে।

হরিমতীকে কলকাতায় রাখতে ভরসা পাননি কুমুদিদি। গোপনে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন জয়রামবাটি বলে একটা জায়গায়। মা সারদাদেবীর কাছে। পরমহংস শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের স্ত্রী সারদাদেবী। কালই খবর এসেছে, হরিমতী মা সারদার আশ্রমে খুব ভাল আছে। এ ব্যাপারে কুমুদিদিকে যিনি খুব সাহায্য করেছিলেন, তিনি হলেন অনুশীলন সমিতির মাখনলাল সেন। তিনি আজ কুমুদিদির বাড়িতে আসবেন রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক সারদানন্দকে নিয়ে। অনুশীলন সমিতির কয়েকজন মেম্বারও থাকবেন। মা সারদার না কি কলকাতায় আসার কথা। এখানে এলে তিনি কার বাড়িতে উঠবেন, তা নিয়ে আলোচনা আছে।

মোহন ভিলায় হরিমতী দিন তিনেক ছিল। ওই অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েটা মন জয় করে নিয়েছিল সবার। কী সুন্দর গান গায়! একদিন সন্ধেবেলায় হল ঘরে বসে হরিমতী সবাইকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা স্বদেশি গান শুনিয়েছিল। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' হল ঘরে হাজির সব মেয়ের চোখে জল এসে গিয়েছিল, ওর দরদভরা কণ্ঠস্বর শুনে। লাবণ্যপ্রভা খুব অবাক হয়েছিলেন এটা ভেবে, মেয়েটা কোত্থেকে এত ভাল গান শিখেছে? ছয় বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন এই গানটা গিরিডি থেকে লিখে পাঠান, তখন লাবণ্যপ্রভা বেথুন স্কুলের ছাত্রী। স্কুলের মিউজিক টিচার গায়ত্রীদিদি সেই সময় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মোট তেইশটা স্বদেশি গান লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি চান, বাংলার ঘরে ঘরে এই গানগুলো ছড়িয়ে পড়ুক।

গিরিডিতে থাকায় রবীন্দ্রনাথ নিজে গানগুলোতে সুর দেওয়ার সময় পাননি। তাই

বলেছিলেন, জনপ্রিয় এবং প্রচলিত কোনও লোকসঙ্গীতের সুরে গানগুলো গাওয়া হোক। লাবণ্যপ্রভার এখনও মনে আছে, গায়ত্রীদিদি বলেছিলেন, গগন হরকরার একটা গান আছে, 'আমি কোথায় পাব তারে'...সেই গানের সুরেই 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটা গাইতে হবে। গানের ক্লাসে সেই গান দল বেঁধে গাইতেন লাবণ্যপ্রভারা। পরে গিরিডি থেকে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এলেন। নিজের লেখা স্বদেশি গানে নিজেই সুর দিতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয়, ফোনোগ্রাফে রেকর্ডও করতে লাগলেন সেই গান। সেই সময় ফোনোগ্রাফ রেকর্ড তৈরির ব্যবসা করতেন হেমেন্দ্রমোহন বসু। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই তাঁর এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়িতে গানের রেকর্ড করতে যেতেন।

লাবণ্যপ্রভা যখনই সময় পান, তখনই মোমের রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে ভালবাসেন। বছর দুয়েক আগে বাবা ধর্মতলার মার্বেল হাউসে গিয়ে এইচ বসুর রেকর্ড আর ফোনোগ্রাফ কিনে এনেছেন।

রেকর্ডগুলো গ্লাসের মতো দেখতে। তবে আওয়াজ গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডের থেকে অনেক ভাল। রবীন্দ্রনাথের গাওয়া 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' গানটা, লাবণ্যপ্রভা রোজ অন্তত একবার করে শোনেন। গানটা তাঁর এত ভাল লাগে। সখী সমিতির অনুষ্ঠানে লাবণ্যপ্রভা নিজেও এই গানগুলো কখনও সখনও গান। তিনি নিশ্চিন্ত, সমিতিতে আরও একজন ভাল গায়িকা এসে গেছে...হরিমতী। সেদিন লাবণ্যপ্রভা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছিলেন, হরিমতী ডন সোসাইটিতে গিয়ে স্বদেশি গান শিখেছে! তার মানে সে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। কেননা, স্বদেশি গান শেখানোর জন্য ডন সোসাইটি মিউজিক ক্লাস চালু করেন সিস্টার নিবেদিতা। লাবণ্যপ্রভার খুব ইচ্ছে ছিল, সেখানে গিয়ে গান শেখার। কিন্তু বাবা যেতে দেননি।

হরিমতীর কথা ভাবতে ভাবতেই লাবণ্যপ্রভা পৌঁছে গেলেন কুমুদিদির বাড়িতে। সিংদরজার দু' তিনটে ফিটন গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মানে রামকৃষ্ণ মিশনের লোকজন এসে গেছেন। ইস, খানিকটা দেরি হয়ে গেল। কুমুদিদি কী মনে করবেন, কে জানে? গাড়ি থেকে নেমে, প্রায় দৌড়েই বৈঠকখানায় ঢুকলেন তিনি। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হচ্ছে দু'জনের মধ্যে। শুনেই দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়ালেন লাবণ্যপ্রভা। সারদানন্দজিকে চিনতে পারলেন। অনুশীলন সমিতির মাখনলাল সেনকেও। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছেন যিনি, সেই ভদ্রলোককে লাবণ্যপ্রভা চিনতে পারলেন না। কুমুদিদি চুপ করে বসে আছেন। তাঁর দিকে চোখ যেতেই, ইশারায় ভেতরে যেতে বললেন।

ভেতরের ঘরে গিয়েও কৌতূহল দমাতে পারলেন না লাবণ্যপ্রভা। কথাবার্তা সবই শোনা যাচ্ছে। পর্দা সরিয়ে তিনি বৈঠকখানা ঘরের দিকে তাকালেন। মাখনবাবু খুব উত্তেজিত। বললেন, 'তুমি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ জীতেশ। একজন সাধুকে অপমান করছ!'

ওহ, ইনি তা হলে জীতেশচন্দ্র লাহিড়ী! অনুশীলন সমিতির একজন স্তম্ভ। লাবণ্যপ্রভা ভাল করে তাকালেন তাঁর দিকে। বোমা মেরে এঁরাই তা হলে সাহেবদের তাড়ানোর চেষ্টা করছেন! জীতেশচন্দ্র কী উত্তর দেন, তা শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলেন

লাবণ্যপ্রভা। জীতেশচন্দ্র বললেন, 'মাফ করবেন, অনুশীলন সমিতিকে আপনি রামকৃষ্ণ মিশনের লেজুড় করে রাখবেন, আর আমি মুখ বন্ধ করে বসে থাকব, তা হয় না। জয়রামবাটি বা বেলুড় থেকে ওঁরা যা বলেছেন, আপনি সেইমতো চলছেন।'

'ভুল ধারণা।' প্রায় গর্জে উঠলেন মাখনবাবু। 'জয়রামবাটির মা সারদা আমাদের কনস্ট্রাকটিভ স্বদেশি করতে বলছেন। উনি তো অন্যায্য কিছু বলেননি।'

'সরি। আপনার কথা মানতে পারলাম না। স্বাধীনতা বিপ্লবের সঙ্গে আধ্যাত্মিক মিশেল দেবেন না প্লিজ। আমাদের পথ আলাদা। দেশকে স্বাধীন করার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের মদতের দরকার নেই আমাদের। কিছু দিন ধরে দেখতে পাচ্ছি, জয়রামবাটির সংস্পর্শে আসার পর থেকে আমাদের অনেকেই লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছেন। মা সারদা তাঁদের কী পরামর্শ দিচ্ছেন, কে জানে?'

'উনি আমাদের সঠিক পথই দেখাচ্ছেন।'

'বেশ তো, আপনাদের মধ্যে কারও যদি আশ্রমে গিয়ে সাধু হওয়ার ইচ্ছে জাগে, তা হলে সেখানেই পার্মানেন্টলি চলে যান না কেন? অনেকেই গিয়েছেন...দেবব্রত বসু, শচীন্দ্রনাথ সেন, প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, অতুল গুহ, রাধিকামোহন গোস্বামী...কত নাম আর বলব। আমাদের সমিতির এই বিপ্লবী মানুষগুলো কেউ এখন প্রজ্ঞানন্দ, চিন্ময়ানন্দ, অভয়ানন্দ অথবা সত্যানন্দ। কিন্তু আমাদের সমিতি যে ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সে কথা কেউ ভেবেছেন? আপনাকে আমরা আলটিমেটাম দিচ্ছি মাখনলালবাবু, হয় বিপ্লব করুন, নয়তো আধ্যাত্মিক চর্চা। দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না।'

জীতেশচন্দ্র এমন হুমকির সঙ্গে কথাটা বললেন, লাবণ্যপ্রভার বুকটা কেঁপে উঠল। বিশিষ্ট মানুষরা নিজেদের মধ্যে এমনভাবে ঝগড়া করেছেন! কী হবে স্বদেশি আন্দোলনের? প্রতিদিন একটা করে সংস্থা গজিয়ে উঠছে। একটা করে সংস্থা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। অথচ সবার লক্ষ্য এক। দেশ থেকে ইংরেজদের তাড়ানো। বাবার একটা কথা লাবণ্যপ্রভার মনে পড়ে গেল। 'পারবি তোরা লক্ষ্যে পৌঁছতে? বাঙালির ইতিহাসটা জানার চেষ্টা করিস মা। আমার তো মনে হয়, তোরা পারবি না।'

(উনিশ)

প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন যদুপতি মুকুজ্জে। বোসবাড়ি কাঁপিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'অরবিন্দের পথই আমার পথ। শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। ইংরেজদের তাড়াতে হবে বোমা মেরে।'

ভূপেনবাবু মিটিমিটি হাসছেন। সত্যি সত্যি যদুপতি রেগেছেন। এমনিতে কথা বলেন জোরে। রাগলে তার মাত্রা আরও ছাড়িয়ে যায়। সান্ধ্য বৈঠকে নিয়মিত যাঁরা আসেন, তাঁদের অনেকেই হাজির। একমাত্র লিয়াকৎ হোসেন আসতে পারেননি কুমারটুলি পার্কে স্বদেশি সভা আছে বলে। তবে আজ একজন বিশিষ্ট অতিথি রয়েছেন। অনুশীলন সমিতির বরদা মিত্র। গোপনে অনুশীলন সমিতিকে অর্থসাহায্য করেন ভূপেনবাবু। এ কথা একমাত্র জানেন, তাঁর ভাইপো দ্বিজেন।

বরদা মিত্রর পরিচয়টা অবশ্য কাউকে দেননি ভূপেনবাবু। নানা ধরনের লোক আসে তাঁর এই বৈঠকখানায়। বারো তেরো বছর আগে ম্যাকেঞ্জি বিলের প্রতিবাদে তিনি কর্পোরেশনের পদ থেকে অব্যাহতি নেন। তার পর থেকেই ইংরেজ প্রভুরা তাঁকে পছন্দ করেন না। তার পর জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ভূপেনবাবু ক্রমশই গুরুত্ব পাচ্ছেন সমাজে। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ নীতির প্রচণ্ড সমালোচনা করেছেন। বরিশালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পর তো ভূপেনবাবু ঘোষণাই করেছেন, 'আজ থেকে ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সূত্রপাত হল।' এই সব কারণে পুলিশের চরও বসে থাকে বৈঠকখানায়। কী কথা হচ্ছে, তার খবর পৌঁছে দেয় গোয়েন্দা দফতরে।

মজলিসী বৈঠকে মুখ খুললে চলে না। তাই বরদা মিত্রের কথা কাউকে বলেননি ভূপেনবাবু। লোকে জানে, তিনি নরমপন্থী রাজনীতি করেন। বোমা-গুলি গোলায় তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু লোকে এ কথাটা জানে না, বছর তিনেক আগে নিদ্রিত অবস্থায় অরবিন্দ যেদিন পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন, সেদিন গভীর রাতে ভূপেনবাবু গ্রে স্ট্রিটে ছুটে গেছিলেন। পুলিশ অরবিন্দকে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। ভূপেনবাবু সে সব খুলে দিতে বলেন। কিন্তু পুলিশ বলে, অরবিন্দের ভাই সব স্বীকার করে নিয়েছেন। তারা কিছু করতে পারবে না। তখন জামিনের জন্য ভূপেনবাবু শেষে পুলিশ কমিশনার মিঃ হ্যালিডে-র কাছে যান। সেখানে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল। তার পর থেকেই স্বদেশিদের সঙ্গে ভূপেনবাবুর যোগাযোগ।

বৈঠক যদুপতিকে উসকে দেওয়ার জন্য কে একজন বললেন, 'বোমা মেরে ইংরেজদের উড়িয়ে দিতে গিয়ে অরবিন্দের কী হল, তা তো দেখলে ভায়া। চিত্তরঞ্জন পাশে গিয়ে না দাঁড়ালে এতদিন তাঁকে আন্দামানে জেলে গিয়ে পচতে হত।'

উত্তেজিত যদুপতি বললেন, 'পচতে হলে...হত। তোমাদের মতো কাওয়ার্ড তো উনি নন। তোমরা ভাবচ, আবেদন নিবেদন করে স্বরাজ পাবে? কখখনও নয়। যুগান্তর কাগজে কী লিকেচে, তোমরা কেউ পড়নি? ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ষাট কোটি হাত কাজে লাগাতে হবে। বাহুবলের দ্বারাই বাহুবলে মোকাবিলা করা সম্ভব।'

ঘরের একপাশে চুপ করে বসে আলোচনা শুনছেন বরদা মিত্র। দু' তিনটে পত্রিকা ইদানীং খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। যুগান্তর আর বন্দেমাতরম। বরোদা থেকে ফিরে এসে অরবিন্দ বের করেছিলেন বন্দেমাতরম।

আর তাঁর ভাই বারীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ মিলে প্রকাশ করেছেন বিপ্লবীদের মুখপাত্র যুগান্তর। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সন্ধ্যা পত্রিকা অবশ্য কিছুদিন হল বন্ধ রয়েছে। বরদা মিত্র অবশ্য যদুপতিকে চেনেন না। তবে তাঁর কথা বেশ উপভোগ করছেন। বাঁশি ছেড়ে অসি ধরার কথা তো বলছেন তাঁরাই। এ ছাড়া ইংরেজদের তাড়ানোর আর কোনও উপায় নেই।

কৃষ্ণকুমার মিত্র বললেন, 'তোমার কতা পুরোপুরি মানতে পারলুম না ভাই। বোমা টোমা এক্সট্রিম ব্যাপার। মাঝামাঝি পথও আছে। আমরা যে কতা বলচি। বয়কট করার কতা। ওদের হাতে না মেরে ভাতে মারার কতা।' কৃষ্ণকুমার ভূপেনবাবুর সমবয়সি। সঞ্জীবনী

বলে একটা পত্রিকা চালান। লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের কথা বলার অনেক আগেই বিলেতি জিনিস বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন কৃষ্ণকুমার। অমৃতবাজার পত্রিকার লালমোহন ঘোষ তাঁকে তখন সমর্থন জানান।

যদুপতি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন কৃষ্ণকুমারকে, 'পাঁচ ছয় বছর ধরে তো বয়কট করে দেখলেন। কোনও লাভ হল তাতে? মাঝখান থেকে বিলিতি জিনিস পোড়াতে গিয়ে...কিছু লোক পুলিশের পিটুনি খেল, ঘরছাড়া হল। এই লোকগুলোর দেশপ্রেম নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তবে আপনাদের পথ নিয়ে আমার আপত্তি আছে। আপনারা কাগজে নরমগরম কতা লিকবেন, আবার সাহেবদের সঙ্গে দহরম মহরম চালাবেন, ওদের কাছ থেকে খেতাব নেওয়ার জন্য আকুলি বিকুলি করবেন, ব্যবসার জন্য মক্কেল ধরবেন, আবার দেশোদ্ধারও করবেন, এ গুলো আমার পচন্দ নয়।'

শুনে কৃষ্ণকুমার চটে গেলেন। বললেন, 'তোমাদের মতো কিছু অর্বাচীন লোকের জন্যই বাংলার এই অবস্থা। দুটো বোমা মেরে যদি ইংরেজদের তাড়ানো যেত, তা'লে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ওরা পালিয়ে যেত। ওদের অস্ত্রবল অনেক বেশি। আমরা পারব কেন?'

কিন্তু যদুপতিকে আজ তর্কে ভর করেছে। ঝোঁকের মাথায় তিনি বলে বসলেন, 'জারের রাশিয়াকে যদি জাপানের মতো ছোট্ট একটা দেশ হারিয়ে দিতে পারে, তো আমরাই বা পারব না কেন? আরে দাদা, হাতের কাছেই তো একটা একজাম্পল আচে। এই তো ভূপেনের মোহনবাগান খেলার মাঠে ওদের হারিয়ে দিচ্ছে...এটাই তো প্রমাণ করে...খেলার মাঠে যদি ওদের আমরা হারাতে পারি, তা'লে দেশ থেকেও তাড়াতে পারি।'

কথাটা শুনে বৈঠকের সবাই চুপ করে গেলেন। কয়েকদিন আগে লিয়াকৎ হোসেন এ রকম একটা কথা বলেছিল বটে, তখন ততটা গুরুত্ব দেননি ভূপেনবাবু। কিন্তু এ ক'দিনে বাইরে থেকে অনেক তার পেয়েছেন তিনি, দূরদূরান্ত থেকে। মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা জানানো তার। হিন্দু মুসলমান সব ধরনের মানুষের কাছ থেকে। সব থেকে তিনি অবাক হয়েছেন, মুসলিম পত্রিকাগুলোতে প্রশংসাসূচক লেখা বেরচ্ছে। এটাই সবথেকে বড় প্লাস পয়েন্ট। লর্ড কার্জন বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করেছেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য নষ্ট করার জন্য। তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলার লিগ গভর্মেন্টের সহ্যাতীত জুলুম, জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব এবং হিন্দু মহাসভা থেকে আলাদাভাবে কোনও কিছু করার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা, বাংলার জাতীয়তাবাদীদের নিষ্ক্রিয়তা...একটা অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে। তার মাঝে মুসলমানদের এই উৎসাহ আশাই করেননি ভূপেনবাবু।

সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে যদুপতি বুঝতে পারলেন, তিনি মোক্ষম জায়গাতেই আঘাত দিয়েছেন। নিজের বক্তব্যকে আরও জোরালো করার জন্য তিনি বলে উঠলেন, 'লোকে মোহনবাগানের খেলা দেকতে যাচ্চে কেন জানেন, সাহেবদের হার দেখার জন্য। কৃষ্ণকুমার...টাউন হলে একশোটা মিটিং করেও আপনারা যা পারেননি, মোহনবাগান দুটো ম্যাচ খেলেই, তার থেকে বেশি স্বদেশি চেতনা ছড়িয়ে দিয়েচে। আসুন, বিপ্লবটা আমরা খেলার মাঠ থেকেই না হয় শুরু করি। মোহনবাগানকে জেতাই, আর পেটাই ইংরেজ কুত্তাদের।'

যদুপতির ভাষা শুনে ভূপেনবাবু ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। চিরদিনই ধীরস্থির প্রকৃতির যদুপতি। পেশায় আইনজীবী। কোর্টেও খুব সংযত থাকেন। হঠাৎ কী এমন হল, এমন সন্ত্রাসবাদী কথাবার্তা বলছেন? প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্যই তিনি বললেন, 'তোমার কী হল যদুপতি? এমনতর বলছ?'

যদুপতি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কেন, কোর্টে তোমার আজ সেই মেয়েটাকে চোখে পড়েনি? কোলে একমাসের বাচ্চা ধরে রাখা যে মেয়েটার ট্রায়াল হচ্চিল? পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে এসেছে ইউনিয়ন জ্যাক পোড়ানোর অভিযোগে। মেয়েটার মুক আমি ভুলতে পারচি না ভূপেন। আমার মেয়েরই সমবয়সি। পুলিশ কী অত্যাচারই না ওর ওপর করেচে। আমার হাতে বোমা থাকলে আমি আজই পুলিশকে মেরে দিতুম।' শেষদিকে যদুপতির গলা ধরে এল। ধুতির খোট দিয়ে তিনি চোখের কোণ মুছলেন।

বৈঠকখানায় যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরা সবাই চুপ। হঠাৎ যেন সবাই কথা হারিয়ে ফেলেছেন। এরকম অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে বরদা মিত্র বলে উঠলেন, 'ওই মেয়েটাকে আমি চিনি ভূপেনবাবু। মাণিকতলার মেয়ে। পুলিশ ওর হাসবেন্ডকে গুলি করে মেরেছে। বাচ্চাকে নিয়ে যখন মেয়েটা পালিয়ে যাচ্ছিল, তখন পুলিশ ওকে ধরে। থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশ ওকে রেপ করেছে। এই জঘন্য কাজটা করেছে ইনসপেক্টর প্রমোদ গুপ্ত। আপনি চিন্তা করবেন না যদুপতিবাবু। আমরা ওকে শাস্তি দেবই।'

যদুপতি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, আপনি কে? তাকে চাপা দেওয়ার জন্য ভূপেনবাবু বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হে যদুপতি, ইন্দ্রনাথের কোনও খবর পেয়েছ? ও কিন্তু গুরুতর অসুস্থ।'

সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দু'জনেরই বিশেষ বন্ধু। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তাঁর জুড়ি নেই। তিনি লেখেন পাঁচু ঠাকুর ছদ্মনামে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, বাংলা সাহিত্যে 'হোলির ধূমকেতু'। তাঁর অসুস্থতার খবর শুনে যদুপতি বিচলিত হয়ে উঠলেন। বরদার কথা ভুলে গিয়ে তিনি বললেন, 'আরে...আজই কোর্টে খবরটা দিলে না কেন? তা হলে কোর্ট ফেরত ওর বাড়িতে যেতুম। কাল তুমিও চলো না, আমার সঙ্গে।'

'না, কাল আমার যাওয়া হবে না। কাল মাঠে যেতে হবে।' কথাগুলো বলতে বলতেই তিনি দেখতে পেলেন, শিবদাস আসছেন। আড্ডা সবে ভাঙতে শুরু করেছে। যে কৃষ্ণকুমার এতক্ষণ গুম হয়ে ছিলেন। তিনিও উঠে পড়েছেন অন্যদের সঙ্গে। বিদায় সম্ভাষণ করে একে একে সবাই বেরিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু শিবদাসকে দেখে ভূপেনবাবু এত খুশি যে, প্রত্যুত্তর দিতেও তিনি ভুলে গেলেন। মুখে প্রসন্নতার রেশ ছড়িয়ে তিনি বললেন, 'এসো শিবদাস, কী হে...কাল পল্টনদের হারাতে পারবে তো?'

শিবদাস প্রণাম করে বললেন, 'আজ্ঞে...আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই পারব। একটা আর্জেন্ট দরকারে আপনার কাচে এলুম। আজ আপিস থেকে এই চিঠিটা বাড়িতে পাটিয়েচে। দু'দিনের মধ্যে আমাকে আসামে যেতে হবে। ম্যাচ ফেলে যাওয়া কি সম্ভব?'

'দেকি কী চিটি?' বলে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন ভূপেনবাবু। তার পর চোখ বুলিয়ে

বললেন, 'তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। একটা ছুটির দরখাস্ত পাটিয়ে দিয়ে তুমি বাড়িতে বসে থাকো। কেউ তোমায় কিচু করতে পারবে না। আমি আচি।'

'আজ্ঞে' বলে শিবদাস চলে যাচ্ছেন, এমন সময় ভূপেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয়, আসামে পাঠানোর পিচনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য আচে?'

'ঠিক বুঝতে পারচি না।'

'ঠিক আছে যাও।' যা বোঝার ভূপেনবাবু বুঝে গেলেন। ইংরেজ জাতটাকে তিনি ভালভাবে চেনেন। দিনরাত ওদের সঙ্গে ওঠাবসা করছেন। কোত্থেকে ওরা কলকাঠি নাড়ে বোঝা যায় না। এই কয়েকদিন আগে বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাষ্ট্র জুড়ে প্রচণ্ড মুভমেন্ট করছেন। তাঁকে দেখে মুসলিম সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হচ্ছে। সারা দেশে এই প্রথম মুসলমানরা আন্দোলনের দিকে ঝুঁকছেন। ইংরেজরা ওদের মধ্যেই দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিলেন। শিয়া আর সুন্নি—দু' সম্প্রদায়েরই প্রচুর লোক মারা গেলেন তাতে। ভূপেনবাবু নিশ্চিত, শিবদাসকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ইংরেজদেরই কারসাজি। কিছুতেই তা হতে দেবেন না তিনি।

শিবদাস চলে যাওয়ার পর বৈঠকখানায় মুখোমুখি বসে বরদা আর যদুপতি। একই টেবলের দু'পাশে। এই গরমেও বরদার গায়ে একটা কালো চাদর। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি অসুস্থ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুল উস্কোখুস্কো। এক পলক তাঁর দিকে তাকিয়ে ভূপেনবাবু শেলফ থেকে একটা মোটা বই বের করে আনলেন। তারপর সেটা বরদা মিত্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই বইটা প্রমথ চাটুজ্জের বাড়ি পৌঁছে দিও।'

উঠে দাঁড়িয়ে বরদা মিত্র বইটা হাতে নিলেন। তিনি জানেন বইয়ের ভেতর কী আছে। বিপ্লবের রসদ কেনার রসদ। তাঁর মেদহীন দীর্ঘ দেহটার দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন যদুপতি। সেটা বুঝে বরদা মজা করার লোভ সামলাতে পারলেন না। চাদরের তলা থেকে একটা গোলাকার জিনিস বের করে, টেবলের ওপর রেখে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'একটু আগে আপনি বোমা চাইছিলেন না? এই নিন বোমা। পরে জেনে নেব, কোনও কাজে লাগাতে পারলেন কী না।'

কথাটা বলে চাদরের তলায় বইটা অদৃশ্য করে দিয়ে বরদা মিত্র বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

(কুড়ি)

সকালে ঘুম থেকে উঠে পেনেটিতে গিয়েছিলেন বিজয়দাস। তাঁর দোকানের কর্মচারীটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ফিরে আসতে বেলা দশটা বেজে গেল। ম্যাচের দিন কোথাও যাওয়া পছন্দ করেন না বিজয়দাস। মনসংযোগ করেন বাড়িতে। কিন্তু কর্মচারী ছেলেটা বহুদিন ধরে কাজ করছে। তার টাকা পয়সা দরকার থাকতে পারে ভেবে, তিনি দৌড়ে গেছিলেন পেনেটিতে। যাক, ঠিক সময়ে ফিরে আসা গেছে। খেলার এখনও ঘণ্টা ছয়েক দেরি।

ফড়েপুকুরের মোড়ে পৌঁছতেই বিজয়দাস দেখলেন, ঘোষবাড়ির সামনে প্রচণ্ড ভিড়।

খাকি উর্দি পরা দু' একজন পুলিশকেও দেখা যাচ্ছে। কী হয়েছে, তা জানার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। ঘোষবাড়ির ছেলে প্রাণকৃষ্ণ তাঁর ছেলেবেলাকার বন্ধু। লাহা কলোনির মাঠে দু'জনে একসঙ্গে ফুটবলও খেলেছেন। প্রাণকৃষ্ণ এখন পৈতৃক ব্যবসা দেখাশুনো করেন। স্কুল থেকে পাশ করে বেরনোর পরই ওঁর বাবা ওঁকে ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে ওঁর ফুটবলপ্রীতি বিন্দুমাত্র কমেনি। বিজয়দাস যখন এরিয়ানে খেলতেন, তখন থেকেই প্রাণকৃষ্ণ রোজ খেলা দেখতে যান। রোজ গড়ের মাঠ থেকে দু'জনে ফেরেন একসঙ্গে।

প্রাণকৃষ্ণর সঙ্গে কথা বলার জন্যই, ভিড় ঠেলে বিজয়দাস ঘোষবাড়ির উঠোনে ঢুকে এলেন। দেখলেন, খোল করতাল নিয়ে একদল হরিনাম করতে বসে গেছে। উঠোনে প্রচুর মহিলা। তার মধ্যে রয়েছে মিত্তির বাড়ির লাবণ্যপ্রভা? তাকে বিজয়দাস জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েচে?'

'এরা বলচে, প্রাণকেষ্টদাদার বউ শৈবলিনী আজ সতী হল। আমার মনে হচ্চে, খুন।'

শুনে চমকে উঠলেন বিজয়দাস। সতী হল মানে? তা হলে কি প্রাণকৃষ্ণ নেই? হিন্দু মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেত... সে তো অনেককাল আগের কথা। সেই কুপ্রথা রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগররা মিলে বন্ধ করে দিয়েছেন। তা হলে প্রাণকেষ্টর বউ সতী হল কী করে? বড় কথা, প্রাণকৃষ্ণ কি মারা গেছে? এত অল্প বয়সে ও মারাই বা গেল কীভাবে? ওর বয়স তো সাতাশ-আঠাশের বেশি নয়? এই রেঞ্জার্স ম্যাচের দিনও প্রাণকেষ্ট খেলা দেখতে গেছিল। ম্যাচ জেতার পর কাস্টমস মাঠে দেখা করে গেল। রবিবার দু'জনে মিলে 'বাজীরাও' নাটক দেখার কথা ছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। কিন্তু সেদিন মাকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বর গেছিলেন বিজয়দাস। ফলে নাটকটা দেখা হয়নি। প্রাণকেষ্টর সঙ্গে কথা হল, আগামী রবিবার দেখে নেবেন। এই দু'দিনের মধ্যে এমন কী হল, প্রাণকৃষ্ণ নেই?

অবাক চোখে বিজয়দাস তাকিয়ে রইলেন লাবণ্যপ্রভার দিকেও। মেয়েটা বলছে, শৈবলিনী খুন হয়েছে। তার মানে? সম্পত্তির লোভে না কি? হতেও পারে। লাবণ্যপ্রভা সোশালওয়ার্ক করে। ও খবরটবর রাখে। প্রশ্নটা বিজয়দাস করেই ফেললেন, 'খুন হয়েছে, তুমি ঠিক জান?'

'আমি সিওর বিজেদাদা। পুলিশকে খবর দিয়েছি। কুমুদিদিও আসছেন।'

প্রাণকৃষ্ণের ভাই কালীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে বিজয়দাস এগিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর দাদার কী হয়েছিল রে?'

'জ্বর। গেল তরশু রাতে দাদা বাড়ি ফিরে এলেন। গায়ে একশো পাঁচ জ্বর। ডাঃ নীলরতন সরকারকে ডেকে আনলুম। বললেন, রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। মনে হচ্চে, কালাজ্বর। কিন্তু দাদা ভয়ে রক্ত দিতে রাজি হলেন না। কাল রাতে দেকে ডাক্তারবাবু বললেন, কিচু করার নেই। দশ-বারো ঘণ্টার বেশি আয়ু নেই। আজ সকাল থেকেই অবস্থা খুব খারাপ। এই যায়...এই যায়। ডাক্তার রায় দিয়ে গেল। শুনে বউমণি গুম হয়ে গেলেন। দাদা অসুস্থ, এদানীং আমায় দোকানে গে বসতে হচ্চে। বাড়ির কাজের লোক দোকানে গে খপর দিল,

গায়ে আগুন জ্বালিয়ে বউমণি সতী হয়েচেন।' কথাগুলো বলে কালীকৃষ্ণ দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল।

'প্রাণকেষ্ট মারা গেল কখন?'

'বউমণি সতী হওয়ার দশ মিনিট পরে। কী সমস্যা বলুন তো বিজেদা। পুলিশ এসে এখন মাকে ধরে টানাটানি করচে। মা তকন ঠাকুর মন্দিরে। বউমণি সতী হওয়ার ব্রত নিয়েচে, মা জানবে কী করে? বাবা বেঁচে থাকলে না হয় একটা কতা ছেল। বউমণিকে রিকোয়েস্ট করতে পারত।'

কথাগুলো কালীকৃষ্ণ এমন সহজভাবে বলে গেল, বিজয়দাস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। বাড়িতে দু'দুটো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে একটা আবার অপমৃত্যু, তাও কোনও হেলদোল নেই। বউমণি সতী হয়েচেন বলে গর্ব করে বেড়াচ্ছে। লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি। বোকাটা জানবে কী করে, সতীদাহ প্রথা ইংরেজ সরকার আইন করে বন্ধ করে দিয়েছে। ইচ্ছে করলে পুলিশ পুরো ঘোষ পরিবারকে নাকাল করতে পারে। প্রাণকৃষ্ণর বউ শৈবলিনীকে বিজয়দাস ভাল করে চেনেন। ওদের বিয়েতে তিনি বরযাত্রী গেছিলেন বরানগরের দিকে। বিয়ের রাতেই বউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণকৃষ্ণ, 'এই হল বিজে, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড।' তখনই বিজয়দাস জানতে পারেন, শৈবলিনী বেথুন স্কুলে পড়া মেয়ে, কথাবার্তায় কোনও জড়তা নেই। অন্য মেয়েদের মতো লজ্জাবতী লতা নয়। সেই মেয়ে স্বেচ্ছায় সতী হবে, এটা বিশ্বাস করতে পারলেন না বিজয়দাস।

কিন্তু ম্যাচের দিন কোনও ঝুটঝামেলায় থাকবেন না। সেই কারণেই প্রাণকৃষ্ণর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন বিজয়দাস। বাড়িতে ফিরে দেখলেন, শৈবলিনীর সতী হওয়ার খবর অন্দরমহলেও পৌঁছেছে। বৈঠকখানা ভর্তি প্রতিবেশী মহিলায়। সবার কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। সতী হওয়ার খবর শুনে সধবারা সিঁদুর খেলেছেন। কান্নাকাটির জন্য অনেকেরই চোখমুখ ফোলা। ঘরে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন মা। তাঁকে দেখেই বললেন, 'বিজে, প্রাণকেষ্টর খপরটা শুনেচিস?'

বিজয়দাস ঘাড় নাড়লেন। মহিলাদের এড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যাচ্ছেন। অঘোরসুন্দরী বললেন, 'মেয়েরা বলচে বটে, ঢঙি বউটা সতী হয়েচে, আমার তা মনে হয় না বাপু।'

শুনে থমকে দাঁড়ালেন বিজয়দাস। হতে পারে। তাঁর মনেও এই সন্দেহটা হচ্ছে বৈকি। ঘোষদের বাড়িতে পুরো সম্পত্তির মালিক এখন হয়ে যাবে কালীকৃষ্ণ। শয়তান ছেলে। প্রাণকৃষ্ণর মুখে বিজয়দাস প্রায়ই শুনতেন ইদানীং জুয়া, রেস খেলে কালীকৃষ্ণ পয়সা ওড়াচ্ছে। কিন্তু সবার সামনে মায়ের এই সব কথা বলা উচিত নয়। তাই মায়ের পেছনে লাগার জন্য তিনি বললেন, 'প্রাণকেষ্টর বাড়িতে পুলিশ এয়েচে দেকলুম। তোমার কতাগুনো পাঁচকান কোরো না কো। কেউ যদি গিয়ে পুলিশকে বলে, তা'লে কিন্তু তোমায় জেরা কর্তে আসবে।'

অঘোরসুন্দরী কিন্তু দমে গেলেন না। উল্টে তেজ দেখিয়ে বললেন, 'আসুক পুলিশ, প্রাণকেষ্ট হতচ্ছাড়া আমার কাছ থেকে ব্যবসা করার জন্যি পাঁচশো ট্যাকা ধার নে গেসল,

সেটা ফেরত দেবে কে? বউটা যদি বেঁচে থাকত, তা'লে তার কাচ থেকে আদায় করতে পারতুম। তা, তাকেও তো সরিয়ে দিলে। সম্পত্তির লোভে ঢণ্ডি বউটার গায়ে আগুন নাগিয়ে মেরে ফেললে।'

উত্তর কলকাতায় পরিবারে পরিবারে পরনিন্দা-পরচর্চা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দুপুরে মেয়ে মহলে কেচ্ছা নিয়ে আলোচনার আড্ডা বসে। লেখাপড়া জানা মেয়ে বলে শৈবলিনীকে পল্লীর বয়স্ক মহিলারা দেখতে পারেন না। তার শাড়ি পরার ধরন, মেক আপ নিয়েও কটাক্ষ শুনেছেন বিজয়দাস। তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, শৈবলিনীর সতী হওয়া নিয়ে এর পর নানা গুজব রটবে। আজকেই তার আন্দাজ পাচ্ছেন। শৈবলিনী সম্পর্কে মায়ের বক্রোক্তি শুনে বিজয়দাস বিষণ্ণ বোধ করলেন। মা সুদের কারবার করেন। মায়ের রাগের কারণ..টাকা। ছেলেটা যে মরে গেল তার জন্য কোনও দুঃখ নেই। আর কথা না বাড়িয়ে তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

... বেলা দু'টোর সময় বোসবাড়ি থেকে টিমের সবাই মিলে যখন বেরচ্ছেন, তখন প্রাণকৃষ্ণর শবযাত্রা সবে বেরিয়েছে। বিজয়দাস দেখতে পেলেন, খোল করতাল বাজিয়ে শবদেহ নিমতলার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পর পর দুটো শব। তার মানে পুলিশ কোনও ঝামেলা করেনি। শৈবলিনীর দগ্ধ দেহটা নিয়ে ট্যানাহ্যাচড়া করেনি। ওদের ম্যানেজ করে নিয়েছে কালীকৃষ্ণ। ও সব পারে। কে যেন বলে উঠল, 'প্রণাম কর। শুভ কাজে যাওয়ার সময় মরা দেখা ভাল। এ যে ডাবল মরা। ম্যাচ আজ জিতবই।' দেখে সুধীর বুকে ক্রশ আঁকল। কিন্তু কথাটা শুনে বুক ধক করে উঠল বিজয়দাসের। মনে হল, কীসের লড়াই, কীসের খেলা, কীসের ঝগড়াঝাঁটি। আজ আছি, কাল নেই?

গড়ের মাঠে পৌঁছে, ড্রেস করে মাঠে যাওয়া পর্যন্ত বিজয়দাস গুম হয়ে রইলেন। ডালহৌসি মাঠে পৌঁছে তিনি দেখলেন, প্রচুর দর্শক হয়েছে। চিয়ার আপ করছে মোহনবাগান টিমকে। 'ভাদুড়ি ব্রাদার্স আজ পল্টনদের হাগিয়ে দেবে।', 'গোলে হীরে আচে, আমাদের কোনও চিন্তা নেই।', 'পল্টনরা সুধীর আর সুকুলকে টপকাতে পারবে না।', 'আমাদের পিছলবাবু আচেন...।'। পিছলবাবু মানে শিবদাস। টুকরো মন্তব্য। বিজয়দাস ভুলে যেতে চাইলেন প্রাণকৃষ্ণকে। কিন্তু পারলেন না। বছর কয়েক আগে এই মাঠেই খেলা ছিল মোহনবাগানের। কোচবিহার কাপের ম্যাচ, ফ্রি স্কুল টিমের এগেনস্টে। ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন প্রাণকৃষ্ণ। মনে আছে, সারাক্ষণ নাম ধরে চেঁচিয়ে ও উৎসাহ দিয়েছিলেন, 'ডান দিকে মার, 'ব্যাটা ফিরিঙ্গিটাকে কাটিয়ে নে'। খেলার শেষে শৈলেনবাবু জানতে চেয়েছিলেন, ছেলেটা কে?

...কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ শুরু হয়ে গেছে, বিজয়দাস সেটা হঠাৎ টের পেলেন। শিবদাস প্রথম বলটা বাড়ানোর সঙ্গেসঙ্গে তিনি পা বাড়ালেন বটে, কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারলেন না। রাইফেল ব্রিগেডের সেন্টার হাফ ওল্ড টুক করে বলটা কেড়ে নিল। পেছন থেকে নীলুর গলা শুনতে পেলেন বিজয়দাস, 'এই বিজে, তুই এত ভিজে রইচিস কেন?' খেলতে খেলতে নীলু মজার মজার সব কথা বলে। অন্য দিন তিনি উপভোগ করেন। কিন্তু আজ মজাটা নিতে পারলেন না।

খেলা জমে উঠল। রাইফেল ব্রিগেড কম্বাইনড টিম। ওরা কেল্লার ভেতর প্রতিদিন প্র্যাকটিস করে। তাই ফরোয়ার্ড লাইনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং খুব ভাল। সবার নাম বিজয়দাস জানেন না। তবে চ্যাপম্যান আর পন্সফোর্ডকে তিনি চেনেন। চ্যাপম্যানের দু'পায়ে ভাল শট আছে। বল যেন মাটি ফুঁড়ে উড়ে যায়। গিয়ে জড়িয়ে পড়ে জালে। খেলার ছন্দে বিজয়দাস নেমে এসেছেন সেন্টার সার্কেলের কাছে। তিনি দেখলেন, চ্যাপম্যানের একটা শট ফিস্ট করে বাঁচিয়ে দিল হীরে। রাইফেল ব্রিগেড খুব চেপে ধরেছে। কর্নার থেকে গোল হয় হয়। কিন্তু সুধীর লম্বা কিক করে বল মাঝ মাঠে পাঠিয়ে দিল। অন্যদিন সেই বল ধরে চড়চড় করে উঠে যান বিজয়দাস। কিন্তু আজ তিনি বল ধরার আগেই ঘাড়ের কাছে লাফিয়ে পড়ল রাইট ব্যাক ম্যাডেন। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন বিজয়দাস।

দর্শকরা হায় হায় করে উঠল। নীলু দৌড়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ রে, তোর দোকানের সব আফিম কি তুই একাই খেয়ে এয়েচিস?'

শুনে হাবুল হাসছে। সে দিকে একবার তাকিয়ে বিজয়দাস গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। না, এটা ঠিক হচ্ছে না। খেলায় মন দেওয়া উচিত। ভূপেনবাবু আজ খেলা দেখতে এসেছেন। প্রাণকৃষ্ণর কথা ভুলে বিজয়দাস একবার চারপাশে তাকিয়ে নিলেন। রাইফেল ব্রিগেড ক্রমাগত আক্রমণ শানাচ্ছে। যে কোনও সময় গোল হয়ে যেতে পারে। আর একবার ওরা গোল পেয়ে গেলে, এমন ডিফেন্সিভ খেলবে, সেই গোল শোধ দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

হাফ টাইমে মাঠের এক পাশে গোল হয়ে রেস্ট নিচ্ছে প্লেয়াররা। নুন, চিনি, লেবুর রস মেশানো জল খাচ্ছে। এমন সময় ভূপেনবাবু এসে সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন, 'বিজে, তোমার কী হয়েছে?'

উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে বিজয়দাস বললেন, 'কিছু না, কাকামশায়।'

পাশ থেকে শিবদাস বললেন, 'দাদার এক বন্ধু আজ মারা গেচে কাকামশায়। সে রোজ দাদার খেলা দেকতে আসত। দাদা সেজন্য খুব আপসেট।'

কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে ভূপেনবাবু বললেন, 'জন্ম মৃত্যু তো মানুষের হাতে নেই। ভগবানের হাতে। আমরা কী করতে পারি। বড় জোর...তার আত্মার শান্তি কামনা করতে পারি। আজ একটা গোল করো বাবা। তা হলে তোমার বন্ধুর আত্মা শান্তি পাবে।'

কথাগুলো কারেন্টের মতো ঝটকা দিল। সেকেন্ড হাফে মাঠে নামার আগে বিজয়দাস একবার আকাশের দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন, 'তুই চিন্তা করিস না প্রাণকেষ্ট। দেখিস, অন্তত একটা গোল আমি করবই।' নতুন উদ্যমে খেলা শুরু করলেন তিনি। মোহনবাগান পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। কানুর শট গোলকিপার নর্টন খুব কষ্ট করে আটকাল। শিবের ফ্রিকিক গোলপোস্ট ছুঁয়ে বাইরে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পর গোলের সুযোগটা হঠাৎ এসে গেল। বল বাড়িয়েছিল শিবে। সেই বল ধরে ক্লার্ককে এক ঝটকায় কাটিয়ে নিলেন বিজয়দাস। বাঁ দিক থেকে দৌড়ে এল লেফট ব্যাক ম্যাডেন। তাকে ড্রিবল করে ফেলে দিলেন তিনি। এ বার নর্টন দু'হাত ছড়িয়ে ছুটে আসছে। তখনই মনে হল, প্রাণকৃষ্ণর গলা শুনতে পেল বিজয়দাস, 'বিজে, ডান দিকে মার'। ঘোরের মাঝে ডানদিক

দিয়েই বল গোলে প্লেস করে দিলেন তিনি। ওই এক গোলে জিতেই শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান শিল্ডের সেমিফাইনালে গেল। খেলা শেষ হওয়ার পর দর্শকদের কাঁধে চড়ে ট্রাম গুমটিতে পৌঁছলেন বিজয়দাস।

(একুশ)

বোসবাড়িতে আনন্দের আজ শেষ নেই। বৈঠকখানা জুড়ে আজ প্রচুর লোক। তাঁদের সামলাচ্ছেন মণিলাল সেন। বোসবাড়ির জামাই। ভূপেনবাবুর মেজ মেয়ে নীরজবালার স্বামী। মণিলাল নিজেও একটা সময় খেলেছেন মোহনবাগানের হয়ে। প্রথম ক্যাপ্টেনও ছিলেন। তবে তিনি ক্রিকেটেই বেশি দক্ষ ছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম রাউন্ড আর্ম বোলিং শুরু করেন।

মণিলাল মধ্যবয়সি। কর্পোরেশনের ল অফিসার। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু সময়ে সময়ে গাম্ভীর্যের খোলসটা খুলে রাখেন। বৈঠকখানার পাশের ঘরটি তিনি খুলে দিয়েছেন। ফরাসপাতা শয্যার ওপর প্লেয়াররা সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। একমাত্র উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছেন হীরালাল। তাঁর পিঠে গোত্তা লেগেছে। তাতে কবরেজি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছেন একজন। সেই সময় মণিলালবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মিঃ হোলি, আপনি এখানে? আসুন আসুন।'

বলতে না বলতেই ঘরে ঢুকে এলেন হোলি সাহেব। হাতে প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া। সঙ্গে দ্বিজদাস। হোলি সাহেব বললেন, 'শিবডাসকে কনগ্রাচুলেশন জানাইটে ফড়িয়াপুকুর গিয়াছিলাম। ডিজদাস বলিলেন, বাগান টিমকে বোসবাড়িতে পাওয়া যাইবে। তাই উহাকে লইয়া আসিলাম।'

ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে শিবদাস বললেন, 'আজ ম্যাচ দেখেছেন?'

'নোপ। আই ওয়াজ টোল্ড বাই দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, নট টু অ্যাটেন্ড বাগান'স ম্যাচ। শুনিলাম, টোমরা নাকি আউটপ্লেড করিয়া দিয়াছ।'

সত্যি কথাই বললেন শিবদাস, 'হ্যাঁ, সেকেন্ড হাফে'।

'নাউ ইউ হাভ টু প্লে এগেনস্ট ওয়ান অব দ্য টু মিডলসেক্স টিম। বি কেয়ারফুল। দে আর ভেরি ভেরি গুড টিম মাই বয়।'

কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটা জেতার আনন্দে শিবদাস ভুলেই গেছিলেন, সেমিফাইনালে কাদের মুখোমুখি হতে হবে। শিল্ডে এ বার মিডলসেক্স-এর দুটো রেজিমেন্ট নাম দিয়েছে। ফার্স্ট মিডলসেক্স আর থার্ড মিডলসেক্স। ফার্স্ট মিডলসেক্সের খেলা আছে কাল ওয়াই এম সি এ-র বিরুদ্ধে। আর দু'দিন পর থার্ড মিডলসেক্সের ম্যাচগুলো দেখে নিতে হবে। শিবদাস শুনেছেন দমদমার মিডলসেক্স দলটা নাকি খুব ভাল। হোলি সাহেবকে তিনি বললেন, 'আমরা চেষ্টা করব সাহেব, ওদের হারাতে।'

'সেদিন টোমাডের জন্য সিআরএ-তে তাঁবুতে গিয়া আমি ঝগড়া করিয়াছিলাম। তাহাতে ফল হইয়াছে। আর রেফারি ম্যাকিন্টশ নাকি শুনিলাম ইম্পার্শিয়াল ছিলেন?'

শিবদাস ঘাড় নাড়লেন। সত্যি, ম্যাকিন্টশ কোনওরকম জোচ্চুরি করেননি। উফ্, আজ যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। ম্যাচটা জেতার কথা নয়। কপাল জোরে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। শিবদাস হোলি সাহেবের সঙ্গে বসে কথা বলতে লাগলেন। শিল্ডে মোহনবাগানের সাফল্য ভাল চোখে দেখছে না ইউরোপীয় সমাজ। হোলি সাহেব সেই সব কথাই বলছেন। মাঝে মাঝে শিবদাসের মনে হয়, হোলি সাহেব যেন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিছুক্ষণ কথা বলে হোলি সাহেব উঠে পড়লেন। যাওয়ার আগে বললেন, 'টোমাডের নেক্সট ম্যাচ কামিং মানডে। আশা করি, ডেখিতে পাইব। গভর্নর্স কাউন্সিলের একজন মেম্বারকে রিকোয়েস্ট করিয়াছি। উনি ব্যান তুলিয়া ডিবেন।'

হোলি সাহেব চলে যাওয়ার পরই প্লেয়ারদের জন্য সুরুয়া আর ফলের রস এসে গেল। হই হই করে সবাই উঠোনে নেমে গেলেন। শিবদাস একা বসে আছেন ঘরে। এমন সময় অনুভব করলেন, কে যেন হাত রেখেছেন কাঁধে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন শৈলেনবাবু। চেয়ার ছেড়ে উঠেই শিবদাস বললেন, 'আজ একটা বড় গাঁট পেরিয়ে এলাম স্যার।'

বলার অপেক্ষা রাখে না। শৈলেনবাবুও তা জানেন। রুপোর সরু ফ্রেমের চশমা চোখ থেকে খুলে, রুমাল দিয়ে উনি কাচ মুছতে লাগলেন। তার পর বললেন, 'আরও দুটো গাঁট পেরুতে পারলে তোমার টিম ইতিহাস সৃষ্টি করবে। আজ জেতার পর আমার কী মনে হচ্চে জানো শিবে, এ বার শিল্ড আমাদের কপালে লেখা আচে।'

শিবদাস কোনও উত্তর দিলেন না। কী-ই বা দেবেন? ক্লাব সেক্রেটারির অন্তরের ব্যথার কথা তিনি জানেন। দু'বছর আগে, এই ঘরে দাঁড়িয়েই দু'জনে মিলে শপথ নিয়েছিলেন, শিল্ড জিততেই হবে। সে দিন আহত বাঘের মতো ছটফট করেছিলেন শৈলেনবাবু। তুলনায় আজ তিনি শান্ত। যেন একটা লক্ষ্যে ধীর স্থির। হয়তো সেই দিনের কথা শৈলেনবাবুও ভাবছিলেন। বললেন, 'সেই দিনটার কথা তোমার মনে আচে শিবে। প্রথমবার শিল্ডে খেলতে নেমে যেদিন আমরা হেরে গেচিলাম? শোভাবাজার আর বাগবাজারের ওরা আমাদের নামে কী ছড়া লিকেছিল? এ বার কিন্তু আমি ওদের ছাড়ব না। শিল্ড জিতে ওদের মুখ ভোঁতা করে দেব।'

মনে আছে, সবই মনে আছে শিবদাসের। এবার শিল্ডের প্রথম ম্যাচের দিনও পাড়ায় পাড়ায় ওরা হ্যান্ডবিল বিলি করেছে। মোহনবাগান সম্পর্কে নানা রকম ব্যঙ্গাত্মক ছড়া লিখে।

আলমারি থেকে একটা হ্যান্ডবিল বের করে আনলেন শৈলেনবাবু। তার পর বললেন, 'এটা আমি তুলে রেকেচি। যতবার পড়ি, মনের ভেতর একটা জ্বালা হয় শিবে। তুমি একবার পড়ে শোনাবে? যাতে সেই জ্বালাটা কমে না যায়?'

শিবদাস বললেন, 'থাক না স্যার। হাতি হেঁটে গেলে কুকুর ঘেউঘেউ করেই।'

'না না, তবুও তুমি পড়ে শোনাও।'

অগত্যা শিবদাস নিচু স্বরে পড়তে শুরু করলেন, যাতে কোনও প্লেয়ারের কানে না যায়...

'ঘুচেচে কারেন্সি আপিস
জুটচে না আর শিক্ষানবিশ
তাই ভোলা পালা গিয়ে
এ বার খোদা জুটেচে।
পোঙা উলটে ডোঙ্গা গেল
তার বদলে নীলে এল
গয় গবাক্ষ বাকি ছেল
ভেটেরেনারি তা দিয়েচে।
আহা কিস্কিন্ধা কী বা মানিয়েচে॥
অন্নদা তো রইল বসে
তুমি কেন এলে কষে
প্রাণটা কি হারাবে শেষে
ও তোর একটা ঠ্যাং যে গিয়েচে।'

ছড়ার প্রতিটি লাইনে বিদ্রুপ। কারেন্সি অফিসে বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন শৈলেনবাবু। মতান্তর হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দেন। পরে কিছুদিন তিনি ব্যাঙ্কে শিক্ষানবিশিও করেন। এর পরের লাইগুলোতে আক্রমণ খেলোয়াড়দের। ...টিমে ডোঙ্গা দত্ত আগে খেলতেন হাফ ব্যাকে। তার বদলে শিবদাস নিয়ে আসেন নীলুকে। বলা বাহুল্য, ডোঙ্গা দত্ত তাতে খুশি হননি। 'গয় গবাক্ষ বাকি ছেলে, ভেটেরেনারি তা দিয়েচে'...এটা শিবদাসের প্রতি কটাক্ষ। অধিনায়ক হওয়ার পর প্রবীণ কয়েকজনকে বাদ দিয়ে তিনি টিম নিজের মনের মতো সাজিয়ে নিয়েছেন। মোহনবাগান এখন কিস্কিন্ধা। শেষ ক'টা লাইন সুধীরকে উদ্দেশ্য করে লেখা। তাঁর জায়গায় আগে খেলতেন অন্নদা বসু। তিনি এখন বাদ পড়েছেন দল থেকে। সুধীর গর্ডন হাইল্যান্ডার্সের বিরুদ্ধে সেই খেলায় পায়ে চোট পেয়েছিলেন। সাহেবদের সঙ্গে ফের পাঞ্জা লড়তে যাচ্ছেন শিল্ডে, তাঁর কি প্রাণের ভয় নেই?

ছড়া পড়া শেষ হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শৈলেনবাবু বললেন, 'হ্যান্ডবিলটা আমায় দাও। তুলে রাখি। আর হ্যাঁ শিবে। কাকামশায় রাতে তোমাদের খাওয়ার আয়োজন করেছেন। সবাইকে সেটা বলে দিও।' বলে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

শিবদাস বাইরে উঠোনের দিকে তাকালেন। নীলু ফের সুকুলের পেছনে লেগেছে। সবাই মজা পাচ্ছে ওর রসিকতায়। দূর থেকে সতীর্থদের হাসিখুশি মুখ দেখে ভাল লাগল শিবদাসের। এক এক করে তিনি সংগ্রহ করেছেন এক একটি রত্ন। মালা গেঁথেছেন। দু'বছর আগে আসাম থেকে ফিরে তিনি দেখলেন, ট্রেডস কাপ জেতার হ্যাটট্রিক করে কিছু খেলোয়াড়ের পায়া ভারি হয়ে গেছে। দলকে চাঙা করার জন্য কয়েকটা নতুন মুখ দরকার। যাঁরা শুধু তাঁর কথা শুনবেন। সামর্থ্যের চেয়েও বেশি কিছু করার জন্য সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

সুকুল সে সময়ে খেলতেন ফরোয়ার্ডে। তাঁর পায়ে লম্বা আর জোরাল শট আছে। সেই সঙ্গে হেডিংয়ে পারদর্শিতা। শিবদাস তাঁকে নামিয়ে আনলেন ব্যাকে। দলে একজন

অ্যাটাকিং ব্যাক হয়ে গেল। সুকুলের পজিশনাল খেলায় ত্রুটিবিচ্যুতি আছে। সেটা ঢাকা পড়ল সুধীরের জন্য। লেফট ব্যাক সুধীর জায়গা ছেড়ে বেশি ওঠেন না। দল যখন বিপদে পড়ে, তখন তিনিই উদ্ধার করার জন্য ঠিক টাইমে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যান। সকলে আক্রমণে উঠে গেলেও তিনি ডিফেন্সটা সামলান। এ ভাবে একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠেন।

মাঝ মাঠ শিবদাস গুছিয়ে নিলেন রাজেন সেনগুপ্ত আর মনমোহন মুখার্জিকে দলে এনে। রাইট হাফব্যাক মনমোহন উত্তরপাড়ার ছেলে। মেদহীন শরীর, অসাধারণ পরিশ্রমী। সুযোগ পেলেই সিক্সথ ফরোয়ার্ড হয়ে যান। আবার প্রয়োজনে ক্ষিপ্র গতিতে নেমে এসে হয়ে যান থার্ড ব্যাক। জটলার মধ্যে থেকে অদ্ভুতভাবে বল বের করে আনার কৌশল জানেন মনমোহন। সেন্টার হাফব্যাক রাজেনকে শিবদাস পান স্কটিশচার্চ কলেজে। দারুণ ট্যাকলার। টেরিয়ারের গোঁ নিয়ে খেলেন। ফরোয়ার্ড আর ডিফেন্সের মধ্যে সেতুর কাজটা করেন এই রাজেন। নীলু আগে থেকেই দলে ছিলেন। প্রখর ফুটবল বোধের জন্য তিনিও চমৎকার মানিয়ে গেলেন বাকি দুই হাফব্যাকের সঙ্গে। তিন হাফব্যাকের মধ্যে তিনিই সব থেকে স্টাইলিশ। পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলেন। তাড়াহুড়ো করেন না। মিসপাস দেন না। নিজের পায়ে বেশি সময় বলও রাখেন না। টিমের তিন হাফব্যাকের এক-এক জনের এক-এক রকম গুণ। একজন পরিশ্রমী, একজন ব্লকার কাম ট্যাকলার, একজন গেমমেকার। শিবদাসের টিম ভাল খেলবেই বা না কেন?

গত দু'বছর ফরোয়ার্ড লাইন নিয়ে অনবরত পরীক্ষা চালিয়েছেন শিবদাস। রাজেনই একদিন ধরে নিয়ে এলেন তাঁর কলেজের বন্ধু অভিলাষকে। ফরোয়ার্ডে খেলেন, ভয়ডর কম। কয়েকটা দিন তাঁকে বাজিয়ে নিলেন শিবদাস। শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের জায়গা অভিলাষকে ছেড়ে দিয়ে, নিজে চলে গেলেন লেফট আউট পজিশনে। লেফট ইনসাইডে বিজয়দাস, রাইট ইনসাইডে হাবুল। দুই ইনসাইডই ফরোয়ার্ড লাইনে চোখা অস্ত্র। রাইট আউট পজিশনে কানু। তিলে তিলে এই দলটা গড়েছেন শিবদাস। এখন শেষরক্ষা হলে হয়।

জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবছেন শিবদাস। মনের গহনে ডুব দিয়েছেন। এমন সময় নিবারণ এসে খবর দিল, 'শিবদাসবাবু, দুখীরামবাবু দেকা কর্তে এয়েচেন।'

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। এই সময় দুখীরামবাবু বোসবাড়িতে? শিবদাস একটু অবাকই হলেন। দুখীরামবাবু এরিয়ান ক্লাবের লোক। সেই অর্থে বিপক্ষ শিবিরের। তবে মানুষটা খুব ভাল। শৈলেনবাবুর সমবয়সি। এবং শৈলেনবাবুর মতো ফুটবল অন্ত প্রাণ। দুখীরামবাবু বোসবাড়ির খুব কাছেই থাকেন। এই রামধন মিত্তির লেনে। দুখীরামবাবুর ধারণা, খালি পায়ে ফুটবল খেলে লাভ নেই। সাহেবদের সঙ্গে খেলতে গেলে বুটবল খেলতে হবে। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে শৈলেনবাবুর মতান্তর। শিবদাস মোহনবাগানে আসার আগে এরিয়ান ক্লাবে খেলেছেন। দুখীরামবাবুর কাছে খেলা শিখেছেন। তাঁকে খুব শ্রদ্ধাও করেন মনে মনে।

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে শিবদাস দেখলেন, দুখীরাম হেঁটে আসছেন। সঙ্গে দশ এগারো

বছর বয়সি একটা ছেলে। মনে মনে তিনি প্রমাদ গণলেন। শৈলেনবাবু ওপরে উঠে গেছেন। তাঁর নীচে নামার আর কোনও চান্স নেই। তিনি যদি না নামেন, তা হলে দুখীরামবাবু মনে কষ্ট পেতে পারেন। কী হবে?

(বাইশ)

ব্যাঙ্কার টমাস হার্ডিঞ্জের বাড়িতে পার্টি। সেখানে হাজির হয়েছেন কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের গণ্যমান্য বেশ কয়েকজন। রাজকর্মচারী, আইনজীবী, ডাক্তার, ফুটবল কর্তা। কেউ সস্ত্রীক এসেছেন, কেউ বা একা। ঝলমলে তাঁদের পোশাক। হুইস্কি, শ্যাম্পেনের ফোয়ারা চলছে। মদ্যপান করতে করতেই ছোট ছোট দলে তাঁরা কথাবার্তায় মশগুল। ভারতীয় খানসামারা তাঁদের খিদমত খাটতে ব্যস্ত। হলঘরের এক কোণে বাজনা বাজাচ্ছেন একদল বাদক। কেউ কেউ নাচছেন।

সুন্দর সুখী পরিবেশ। পার্টিতে এসে তবুও মনে স্বস্তি নেই ম্যাকগ্রেগরের। একটু আগে ক্যালকাটা ক্লাবের চার্লস হেস্টনের মুখে তিনি শুনেছেন, শিল্ডে মোহনবাগান সেমিফাইনালে গেছে। রাইফেল ব্রিগেডের মতো দলও ওদের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারেনি। শিল্ডে কে জিতল-হারল, তা নিয়ে মাথা ঘামানোই উচিত নয় তাঁর। তবুও কেন জানেন না, মোহনবাগানের খবরটা কানে যাওয়ার পর থেকে মনে হচ্ছে, রাইফেল ব্রিগেড নয়, তিনিই হেরেছেন। শৈলেন বসুর মুখটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আসলে শৈলেন বসুকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করেন বলেই, মোহনবাগানের সাফল্যকে ম্যাকগ্রেগর মেনে নিতে পারছেন না। লোকটা সে দিন মুখের ওপর বলেছিল, আমরা এগারো জনে খেলে জিতব। সত্যিই তা হলে জিতল!

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে ম্যাকগ্রেগর দেখলেন, হাসিমুখে তাঁর দিকেই আসছেন উচ্চপদস্থ দুই রাজকর্মচারী স্যার ক্লেমেন্স এবং ডগলাস ল্যাম্ব। স্যার ক্লেমেন্স বছর খানেক হল ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন। একটু আগে এক কোণে দু'জনকে নিচু স্বরে কথা বলতে দেখেছেন ম্যাকগ্রেগর। হাসিমুখে তিনিও স্বাগত জানালেন দু'জনকে। স্যার ক্লেমেন্স বললেন, 'আপনার ফুটবলের খবর কী ম্যাক?'

ম্যাকগ্রেগর বললেন, 'স্যার শিল্ডের খেলা চলছে।'

ডগলাস জানতে চাইলেন, 'কী শুনছি ম্যাক, একটা নেটিভ টিম নাকি খুব ভাল খেলছে? টিমটা কি সত্যিই ভাল?'

মোহনবাগানের প্রশংসা করবেন না। ম্যাকগ্রেগর বললেন, 'যতটা লাফালাফি হচ্ছে ততটা নয়।'

'আমরা শুনলাম, এই টিমটা নাকি ন্যাশনাল কংগ্রেস নেতা মিঃ বোসের? সেই কারণেই বাঙালি হিন্দুরা সমর্থন করছে? ইন্টেলিজেন্স বলছে, পলিটিক্যাল মোটিভেশনও রয়েছে এর পিছনে?'

'ইউ আর রাইট স্যার। মাঠে প্রচুর লোক ওদের ম্যাচ দেখতে যাচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের লোকেরা তাদের মোবিলাইজ করছে।'

'কিন্তু বেঙ্গলি বাবুরা আমাদের মিলিটারি দলগুলোর সঙ্গে লড়ছে কী করে? আমি তো শুনেছি, ওরা বেসিকেলি এফিমিনেট টাইপের।'

'না স্যার, এই টিমটা খুব অ্যাগ্রেসিভ।'

'এই টিমটার কারও কারও সঙ্গে নাকি টেররিস্ট গ্রুপের যোগাযোগ আছে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স বলছে, টিমের দু'জন প্লেয়ারের সঙ্গে টেররিস্টদের নাকি যোগাযোগ আছে?'

এই খবরটা জানা ছিল না ম্যাকগ্রেগরের। শুনে কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। শৈলেন বসুকে টাইট দেওয়া যাবে। তাই তিনি বললেন, 'আই হ্যাভ নো আইডিয়া স্যার। বাট ফরগিভ মি মাই সেয়িং, যদি তা হয়... তা হলে তাদের অ্যারেস্ট হচ্ছে না কেন?'

স্যার ক্লেমেন্স বললেন, 'আমরা নজরে রাখছি। তার আগে ম্যাক বলুন তো, বাবুদের এই টিম কতদূর যেতে পারে? ওদের থামিয়ে দেওয়া যায় না? আমাদের রেফারিরা করছেটা কী?' বলেই চোখ টিপে স্যার ক্লেমেন্স হাসতে শুরু করলেন।

প্রশ্নটা শুনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন ম্যাকগ্রেগর। এই রাজকর্মচারী ভীষণ ধুরন্ধর। পেট থেকে কথা বের করে নেবে। তার পর সেটা কীভাবে ব্যবহার করবে, কেউ জানে না। স্যার ক্লেমেন্সকে তিনি খুব ভালভাবে জানেন না। তাই পাশ কাটিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন, 'স্যার, আমাদেরই কিছু লোক মদত দিচ্ছেন বাবুদের। রেফারিং নিয়ে অযথা কন্ট্রোভার্সি করছেন।'

ডগলাস ল্যাম্ব বললেন, 'না না, কোনও রকম কন্ট্রোভার্সির মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল নয়। বেঙ্গলি হিন্দুরা ক্রমশ ভায়োলেন্ট হয়ে উঠছে। ইন্টেলিজেন্স বলছে, ওরা নিজেরা বোমা বানাতে শিখে গেছে। বার্মায় গিয়ে বোমা বানানো শিখে আসছে। অস্ত্রাগার লুঠপাঠ করছে। পশ্চিমে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে মরাঠিরাও আন্দোলনে নেমে পড়েছে। খেলার মাঠে যদি ওরা ইউরোপীয়দের হারায়, তা হলে আরও ডেসপারেট হয়ে যাবে। বাবুদের বাড়তে দেওয়া যাবে না ম্যাক। ওদের আটকানোর অন্য উপায় ভাবুন।'

আশপাশ তাকিয়ে ম্যাকগ্রেগর চাপা স্বরে বললেন, 'স্যার আমিও সে কথা ভেবেছি। বেঙ্গলি হিন্দুরা যাতে পুরো ক্রেডিটটা না পায়, তার জন্য একটা মুসলিম দলকেও শিল্ডে নিয়েছি। স্রেফ এটা বোঝানোর জন্য যে, শুধু তোমাদেরই খাতির করছি না। মুসলমানরাও আমাদের চোখে সমান।'

'এক্সিলেন্ট', স্যার ক্লেমেন্স বলে উঠলেন, 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল। বাট ম্যাক, হাউ ইজ দিস মুসলিম টিম? আর দে স্ট্রং এনাফ?'

'সেটা দু'দিন পরে বোঝা যাবে স্যার। পরশু ওদের থার্ড রাউন্ডের খেলা আছে গাজিয়াবাদের ইস্ট ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে।'

ডগলাস ল্যাম্ব বললেন, 'এই টিমটার পেছনে কি মুসলিম লিগের আশরফরা আছেন?'

ম্যাকগ্রেগর বললেন, 'নট টু মাই নলেজ স্যার। মুসলমানদের মধ্যে যারা খুব সম্ভ্রান্ত, তাদের বেশিরভাগই রয়েছেন নতুন একটা টিম মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে। আর আমরা

যাদের খেলতে দিয়েছি, সেই মুসলিম ক্লাবটা পুরনো। কিন্তু যতদূর জানি, তাদের পিছনে জনসমর্থন কম।'

স্যার ক্লেমেন্স জানতে চাইলেন, 'ডগলাস, আশরফ মুসলমান কারা?'

ডগলাস বললেন, 'স্যার, এঁরা রেসিয়লি পিওর। মুসলিম জগৎ যাঁরা চালান, তাঁদেরই বংশধর। এঁরা ইন্দো পারসিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আর কালচার-এর ধারক বাহক। সংখ্যায় এঁরা কম। কিন্তু এঁদেরই আমরা মুসলিম সমাজের নেতা বলে মনে করি। তবে স্যার এঁদের মধ্যেও তিন শ্রেণি আছে। আপার ক্লাস আশরফরা হলেন নবাবদের বংশধর। যেমন মাইশোর, অযোধ্য, মুর্শিদাবাদ নবাবদের। এঁরা উর্দুতে কথা বলেন। মিডল ক্লাস আশরফরা হচ্ছেন গ্রামীণ জমিদার, প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক। এঁরা উর্দু-বাংলা দুই ভাষাতেই পারদর্শী। আর লোয়ার ক্লাস আশরফরা তুলনায় কম ধনী বাঙালি গ্রামীণ মুসলিম। তবে এই তিন ধরনের আশরফরা হলেন টোটাল মুসলিম জনসংখ্যার মাত্র দেড় পার্সেন্ট।'

'মুসলিমদের মধ্যে তা হলে সংখ্যায় বেশি কারা?'

'তাঁদের বলে আতরফ। এঁরা কনভার্ট মুসলিম। নিচু জাতের হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছেন। এঁরা সমাজের বিভিন্ন পেশার কাজ করেন—কৃষক, তাঁতি, কলু, কামার, ছোট ব্যবসায়ী। আগে আশরফরা পাত্তা দিতেন না আতরফদের। দূরে দূরে রাখতেন। এখন নিজেদের আইডেন্টিটি সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন আতরফরা। হিন্দু ভদ্রলোকদের দেখাদেখি তাঁরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছেন।'

'ম্যাক যে মুসলিম ক্লাবটার কথা বলল, কারা চালান?'

'সেটা খোঁজ নিয়ে বলতে হবে।'

'বাবুদের টিমের বিরুদ্ধে এদের খেলিয়ে দেওয়া যাবে না?'

ম্যাকগ্রেগর বললেন, 'এখনই বলা মুশকিল স্যার। তবে পিকিউলারিটি অব দ্য সিচুয়েশন হচ্ছে, মুসলিম কমিউনিটির একটা বড় অংশ কিন্তু বাবুদের টিম অর্থাৎ কি না মোহনবাগানকে সমর্থন জানাচ্ছে। ভাষা একটা বন্ধন। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলো লক্ষ করলেই সেটা টের পাবেন। মোহনবাগানের জয়ে ওরাও খুব উল্লসিত।'

'ডগলাস, আপনার কি মনে হয়, কংগ্রেসের মুসলিম লিডাররা এর পিছনে রয়েছেন।'

'হতে পারে। শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত মুসলমানরা এতটা ধর্মান্ধ নয়। এদের মাথাতেও ঢুকেছে, দেশ থেকে আগে ইউরোপীয়দের তাড়ানো দরকার। পিকিউলিয়ার সিচুয়েশন। মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে কিন্তু চলবে না।'

'হুম। লেফটন্যান্ট গভর্নর ডিউক সেদিন আমার কাছে পরিস্থিতিটা জানতে চাইছিলেন। বুঝতে পারছি, খেলার মাঠ থেকেই এরা আন্দোলনটা আরও ছড়িয়ে দেবে।'

ডগলাস বললেন, 'আমার কিন্তু মনে হয়, আমরা বড্ড বেশি উতলা হয়ে পড়েছি। খেলার মাঠ থেকেই যদি আন্দোলনটা শুরু হত, তা হলে সেটা শুরু হত পাতিয়ালা থেকে। পাতিয়ালার মহারাজা রণজিৎ সিংজির টিমের কাছে আমাদের ইউরোপীয়ান দল ক্রিকেটে প্রায়ই হারছে। কই, সেখানে তো অশান্তি নেই। তা হলে?'

'পাতিয়ালার মহারাজা টিম নিয়ে এখন ইংল্যান্ডে গেছেন, তাই না? কাগজে রোজ

ক্রিকেটের খবর দেখছি। উনি এখন আমার কাউন্টিতে খেলছেন..., সারে। হি ইজ আ নাইস জেন্টলম্যান। আমার সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছিল বোম্বাইয়ে...।'

প্রসঙ্গ পাল্টে স্যার ক্লেমেন্স চলে গেলেন ক্রিকেটে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ম্যাকগ্রেগর। ধীরে ধীরে সরে এলেন নাচ-গানের আসরের দিকে। ক্যালকাটা ক্লাবের কর্তা চার্লস ফাইফকে তিনি দেখতে পেলেন। এক বিলেতি জয়েন্ট স্টক কোম্পানির বড়কর্তা। হার্ডিঞ্জ তাঁকে খুব খাতির করে। সেজন্য প্রত্যেক পার্টিতে নেমতন্ন করে। ইউরোপীয়দের দুটো বড় ক্লাব কলকাতায়। ক্যালকাটা আর ডালহৌসি। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক জীবনে উচ্চস্থানের ইউরোপীয়ানরা ক্যালকাটা ক্লাবকে সমর্থন করে। যেমন হার্ডিঞ্জ পাঁড় সাপোর্টার ক্যালকাটা ক্লাবের। অন্য দিকে, ডালহৌসি ক্লাবটা হল পাতি ইউরোপীয়ানদের আড্ডা। ম্যাকগ্রেগর শুনেছেন, বাবুরা ডালহৌসির কর্তাদের বলে, চটকলের সাহেব। সত্যি, ওঁদের অনেকেই জুট মিলের সঙ্গে যুক্ত।

দূর থেকে দেখতে পেয়ে ফাইফ বললেন, 'হাই ম্যাক, থ্যাঙ্কস।'

কাছে গিয়ে ম্যাকগ্রেগর বলেন, 'হোয়াট ফর?'

'ডালহৌসির সঙ্গে আমাদের ম্যাচের দিন সার্জেন্ট হপকিন্সকে রেফারি হিসাবে পাঠানোর জন্য। উনি শক্ত হাতে ম্যাচটা না খেলালে আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে যেতে পারতাম না।'

'রেফারিং নিয়ে সব টিম প্রবলেম করছে। এই দেখো না, বাবুদের দলটাও চেল্লামেল্লি করছে।'

'ওরা কি মুকার্জিকে রেফারি চাইছে না কি? না না, বেঙ্গলি রেফারি তোমাকে ডুবিয়ে দেবে ম্যাক। এখনও প্রেসার নেওয়ার জন্য তৈরি হয়নি।'

রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনে একমাত্র ভারতীয় রেফারি অক্ষয় মুখার্জি। ফাইফ তাঁর কথা বলছেন। 'না না, বাবুদের ম্যাচে মুকার্জিকে দিলে মিডলসেক্স মাথা খেয়ে ফেলবে। শিল্ড একটা প্রেস্টিজিয়াস টুর্নামেন্ট।'

বিলেতের কাগজেও এই টুর্নামেন্টের ফলাফল প্রকাশিত হয়। যাঁর তাঁর হাতে সেমিফাইনাল ম্যাচ দেওয়া যায় না। ম্যাকগ্রেগর বললেন, 'কী করা যায় বল তো ফাইফ?'

'আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি। রাখা না রাখা তোমার ব্যাপার।'

'আরে বলই না। অত ফর্মালিটি করার দরকার নেই।'

'আমাদের টিমের প্লেয়ার এইচ জি পুলারকে তুমি চেনো?'

'কেন চিনব না? ও রেফারি সংস্থার সদস্য।'

'বাবুদের ম্যাচ ওকে করতে দাও। ওর সঙ্গে বাবুদের ভাল সম্পর্ক আছে। ওকে ম্যাচ করতে দিলে বাবুরা আপত্তি করবে না।'

'কিন্তু ফাইফ, নিয়মে আটকাবে না তো? হি ইজ স্টিল আ প্লেয়িং মেম্বার অব ক্যালকাটা টিম। অ্যান্ড ইউ আর অলসো অন দ্য রান। তোমরা এখনও শিল্ডে খেলছ।'

'তাতে কী হয়েছে? নিয়মে আটকাবে না। নিয়ম দেখাতে পারবে না তুমি।'

'যদি প্রোটেস্ট হয়, তা হলে?'

'আমরা আছি তোমার সঙ্গে। দেখো, কাউন্সিলে চেঁচামেচি করতে পারে ডালহৌসি। কিন্তু ওরা আর টুর্নামেন্টে নেই। ওদের ইন্টারেস্টও চলে গেছে। আমি যা বলছি, তাই করো। দেখবে, পুলার ম্যাচটা ভাল খেলাবে।'

ফাইফের কথা শুনে তবুও ম্যাকগ্রেগর সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। পুলারকে রেফারি করবেন কী না।

(তেইশ)

ঘরে ঢুকেই দুখীরামবাবু বললেন, 'আমার এই ভাইপোটার জন্য তোদের এখেনে আসতে হল। মাথা খেয়ে ফেললে। বলে কি না... শিবদাস ভাদুড়িকে সামনাসামনি দেকব।'

শিবদাস হেসে বললেন, 'আসুন স্যার, বসুন। শৈলেনবাবুকে খপর পাটিয়েছি।'

সঙ্গী ছেলেটার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দুখীরামবাবু বললেন, 'ছোনে, এই হল গে শিবদাস। মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন। তোকে এর মতো প্লেয়ার হতে হবে।'

ওহ, এই ছেলেটাই ছোনে! ছেলেটাকে দেখেই চিনতে পারলেন শিবদাস। আগে একদিন দেখেছেন। সকালে গড়ের মাঠে যাওয়ার জন্য শ্যামবাজার থেকে ট্রামে উঠেছেন তিনি ও বিজয়দাস। হঠাৎ দেখেন, সেকেন্ড ক্লাসের একেবারে পিছনের সিটে বসে আছেন দুখীরামবাবু। ট্রামের পিছন পিছন দৌড়চ্ছে বাচ্চা একটা ছেলে। ট্রামে বসে দুখীরামবাবু তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন তার দিকে। মাঝে ক্লান্ত হয়ে ছেলেটা রাস্তায় একবার দাঁড়িয়ে পড়লে, দুখীরামবাবু মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'দৌড়ো, দৌড়ো হারামজাদা, নইলে বাড়ি ফিরে তোকে জুতোপেটা করব।' শুনে ফের দৌড়তে শুরু করেছিল এই ছেলেটা। খুব খারাপ লেগেছিল সেদিন ছোনের জন্য।

শিবদাস নিজে এরিয়ান ছেড়ে মোহনবাগানে চলে এসেছিলেন এই কারণে। পান্তির মাঠে দুখীরামবাবু রোজ কুড়ি পঁচিশ পাক দৌড় করাতেন। এটা শিবদাসের ভাল লাগেনি। শুধু ফ্রন্ট রানিং। সামনের দিকে দৌড়। তখনই মনে হত, ফুটবল তো শুধু ফ্রন্ট রানিংয়ের খেলা নয়। কখনও সামনের দিকে দৌড়তে হয়, কখনও আড়াআড়ি, কখনও পিছনের দিকে। সব রকম দৌড় প্র্যাকটিস করলে, পায়ের মাসল সেভাবে তৈরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, এনডিওরেন্সের জন্য দৌড় দরকার। কিন্তু তা যেন শরীরকে ক্লান্ত করে না দেয়। এ ছাড়া বুট পরে খেলা নিয়ে দুখীরামবাবুর জোরাজুরিও শিবদাস মেনে নিতে পারেননি। জল কাদার মাঠে, বুটের ওজন খুব ভারী হয়ে যায়।

দুখীরাম তক্তপোশের ওপর জাঁকিয়ে বসেছেন। শৈলেনবাবু ওপর থেকে নেমে এসেছেন। উঠোন থেকে বেশ কয়েকজন প্লেয়ার ভেতরে ঢুকে এসেছে। দুখীরামবাবু বললেন, 'শিবে, আজ তোদের খেলা দেকলুম। সেমিফাইনালে এই ম্যাচ খেললে কিন্তু সাহেবরা তোদের হাগিয়ে দেবে। তোদের বোধহয় খেলতে হবে দমদমার মিডলসেক্সের সঙ্গে। জবর টিম।'

নিবারণকে ডেকে ততক্ষণে দু' রেকাবি রাবড়ি আনিয়ে ফেলেছেন শৈলেনবাবু। বাড়ির ভেতর থেকে। এ বাড়ির এটাই রেওয়াজ। ম্যাচ জিতলে রাবড়ি ভক্ষণ। সেই রেকাবি

দুখীরামবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটা মিডলসেক্স কী র'ম খেললে, দেকেছিস?'

'দেকেচি। দুটো প্লেয়ার তো খুবই ভাল। সেন্টার হাফ উথেন আর ইনসাইড বেভিন। সোমবার ওই দু'জনকে ফ্রি খেলতে দিলে তোরা মারা পড়বি। তবে ওদের টিমের সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট হচ্চে গে, গোলকিপার পিগট। এ বার ন'টা পেনাল্টি আটকেচে। সবাই বলে ইস্ট ইয়র্কের ক্রেসি নাকি এক নম্বর গোলকিপার। কিন্তু আমার মতে, পিগট আরও বেটার। যেমন হাইট, তেমন রিফ্লেক্স, ফিটনেস আর অ্যান্টিসিপেশন। ওকে গোল মারা কঠিন।'

শিল্ডের অন্য খেলাগুলো দেখার সময় পাচ্ছেন না শৈলেনবাবু। নিজেদের প্র্যাকটিস চলে ওই সময়। তবে কোন টিম কেমন খেলছে, খোঁজ রাখছেন। অন্য দিক থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে, ইস্ট ইয়র্ক আর ক্যালকাটা। গোড়ায় গোড়ায় সবাই বলছিল, রয়াল স্কট টিমটাই নাকি সবথেকে ভাল। ওরাই শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ন হবে। কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ডে তাদের হারিয়ে দিয়েছে ইস্ট ইয়র্ক। ইদানীং অন্য টিমের ম্যাচ দেখলেই টেনশন হয় শৈলেনবাবুর। মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের তুলনা শুরু করেন। কিন্তু দুখীরামের তো সে সব বালাই নেই। শিল্ডে ওর টিম খেলছে না। ফলে সাইকেল ঠেঙিয়ে রোজ ও গড়ের মাঠ চষে বেড়াতে পারছে।

তবে দুখীরাম ফুটবলটা বোঝেন। মতান্তর থাকা সত্ত্বেও তাঁর কথায় গুরুত্ব দিলেন শৈলেনবাবু। বললেন, 'আমার ভয়টা কোতায় জানিস দুখীরাম, গা জোয়ারি ফুটবল নিয়ে। আমার টিম এখন একটা রিদম-এ এসে গ্যাচে। একেবারে এগারো জনের সেট টিম। একজন চোট পেয়ে বসে গেলে, পুরো টিমটাই বরবাদ হয়ে যাবে। রিপ্লেস করার মতো কোনও প্লেয়ার আমার হাতে নেই। শুনলুম, মিডলসেক্স খুব মারকুটে টিম। জলকাদার মাঠে কী যে হবে, কে জানে?'

শুনে হঠাৎই যেন উৎসাহ পেয়ে গেলেন দুখীরামবাবু, 'শোন, ওদের সঙ্গে বুদ্ধি করে খেলতে হবে। দুম দড়াম অ্যাটাকে গেলে চলবে না কো। পেছন দিকটা সামলে, হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণে উঠতে হবে। সুকুল আর রাজেনকে বলিস, যেন খুব বেশি অ্যাটাকে না যায়। আর শিবে, ফরোয়ার্ড লাইনে তোদের খেলতে হবে বারবার জায়গা বদল করে। বিলেতে এখন এ সব হচ্চে। রাইট আউট কখনও সেন্টার ফরোয়ার্ড হয়ে যাচ্চে, লেফট ইনসাইড কখনও রাইট আউট। ফরোয়ার্ডরা যদি বারবার পজিশন বদলে খেলে, তা হলে তাদের ধরা কঠিন। ব্যাকেরা ধাঁধায় পড়ে যাবে।'

শিবদাস বললেন, 'কিন্তু হঠাৎ এ সব করতে গেলে...'

'আরে, একনও তো চারটে দিন তোদের হাতে আচে। প্র্যাকটিস করেই দ্যাক না। শোন তা'লে, অত জন মিলে শাফল করতে হবে না। তোরা দুইভাই জায়গাটা শাফল করে খেল। তোরা একই রকম দেখতে। তোরা দু'জন যদি জায়গা বদল করে করে খেলিস, তা'লে ওদের ব্যাকরা খেই পাবে না। আমি কী বলচি, বুঝতে পারচিস?'

বোঝার চেষ্টা করলেন শিবদাস। দুখীরামবাবু মন্দ বলেননি। মিডলসেক্স-এর লোকেরা

নিশ্চয়ই মোহনবাগানের খেলা দেখেছে। কে কী ভাবে খেলে, দেখেছে। ওরাও খেলতে আসার আগে প্ল্যান কষবে। পাল্টা প্যাঁচ মারলে মন্দ হয় না। শৈলেনবাবুর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলে শিবদাস। নাহ, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে।

চামচ দিয়ে দুখীরামবাবু রাবড়ি খাচ্ছেন, হঠাৎ বললেন, 'বুঝলি শৈলেন, তোদের টিমটার সব ভাল। প্লেয়ারদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া। মাঠে নামার পর মনে হয়, সাহেবদের বেশি খাতির করচে। অ্যাগ্রেসিভ হতে হবে। একমাত্তর অভিলাষ ছাড়া আর কাউকে দেখি না, পাল্টা তেড়ে যাচ্ছে। খেলতে খেলতে আরও বেশি কতা বল... তোরা নিজেদের মধ্যে। যেমন নীলু বলে। চেঁচিয়ে মাতা খারাপ করে দে ফিরিঙ্গি সাহেবদের। মেজাজ গরম করে দে। দেকবি, ওরা ভুল করচে।'

কথাগুলো শুনে প্লেয়াররা সবই হাসছে। দুখীরামবাবু বললেন, 'হাসিস না। তোদের ডোঙ্গা দত্ত এটা খুব করত। ও শুধু অপোনেন্ট প্লেয়ারদেরই তেড়ে যেত না, কনস্ট্যান্ট ডিসটার্ব করত রেফারিকে। কানের কাছে গে বাজে কতা বলত। যাতে কেউ শুনতে না পারে। সাদা চামড়ার কোনও রেফারি ওকে পচন্দ করত না। কত জন যে আমার কাছে কমপ্লেন করেচে...।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'না, না। আমিও এ সব প্লেয়ার পচন্দ করি না। আমাদের ঘরে বাইরে শত্তুর। জানিসই তো সব। রেফারিরা সব পারে। একবার দু'বার ওয়ার্নিং দেবে। তারপর মাঠ থেকে বের করে দেবে। ওদের বিশ্বেস নেই।'

'আসলে কী জানিস, ওদের আঁতে ঘা লেগেছে। এই যে তোরা সেমিফাইনালে উটেচিস, সেটা ওরা সহ্য করতে পারচে না। কিন্তু জানবি, লক্ষ লক্ষ বাঙালি তোদের মুকের দিকে তাকিয়ে আচে। এই তো পরশু দিন জাগুলিয়ায় গেচিলাম। গ্রামবাসীরা আমায় ঘিরে ধরে তোদের কতা জানতে চাইলে। ফুটবল কী, অর্ধেক লোকই তা জানে না। তবু, সোমবার ম্যাচটা দেকার জন্য অনেকে কলকেতায় আসবে। জাগুলিয়া কি কম দূর এখেন থেকে? সাইকেলে যেতে দু'ঘণ্টা লেগে গেল। সেখেনেও শুনলুম শিবে-বিজের নাম। বোঝ, গ্রামেগঞ্জেও কী এক্সপেক্টেশন তৈরি হয়েচে তোদের নিয়ে।'

প্লেয়ার খুঁজে আনার জন্য দুখীরামবাবু গ্রামগঞ্জে ঘুরে বেড়ান। শৈলেনবাবু তা জানেন। কোথাও কোনও ফুটবলারের সন্ধান পেলে, তিনি সাইকেলে করে ছুটে যান। সেই ফুটবলারকে নিয়ে এসে, ঘষে মেজে তাকে তৈরি করে নেন। এ ভাবে অনেক ফুটবলারকে তিনি গড়ের মাঠে উপহার দিয়েছেন। এই কারণে শৈলেনবাবু মনে মনে শ্রদ্ধাও করেন দুখীরামবাবুকে। কিন্তু এরিয়ান ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের সম্পর্কে মরচে ধরে গেছে। দুখীরামের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলেও তিনি তাই এড়িয়ে যান।

তক্তপোশ থেকে নেমে দুখীরামবাবু পায়ে চটি গলাচ্ছেন দেখে শৈলেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, এই যে তুই আমার বাড়িতে এয়েচিস, ধানী মিত্তির শুনলে তোর ওপর রাগ করবে না?'

ধানী মিত্তির এরিয়ান ক্লাবের জবরদস্ত কর্তা। তাঁর টাকাতেই ক্লাব চলে। মোহনবাগানের ওপর কেন তাঁর রাগ, দুখীরামবাবু তা জানেন। প্রশ্নটা শুনে তিনি ম্লান হেসে বললেন,

'দ্যাক শৈলেন, আমি হচ্চি গে বাগানের মালী। সার দিই, চারাগাছ পুঁতি, ফল ফলাই। আমি জানি বাগানের মালিক আমি না। এক বাগানে ঠাঁই না পেলে অন্য বাগানে চলে যাব। আমার ভয় কী?'

এক পা এগিয়ে ফের তিনি বললেন, 'তোরা ভাল খেলচিস, আমার খুব গর্ব হচ্চে রে শৈলেন। আফটার অল, বাঙালি যে ফুটবল খেলতে পারে, তা প্রমাণ হচ্চে। তোরা যদি চ্যাম্পিয়ন হোস, তা'লে জানবি, আমার থেকে বেশি আনন্দ আর কেউ পাবে না। তোদের জন্য যদি কিচু করতে পারি, তা'লে বলিস। হেজিটেট করিস না।'

এই কথাগুলো বলে ভাইপো ছোনের কাঁধে হাত রেখে দুখীরামবাবু বেরিয়ে গেলেন।

(চব্বিশ)

'হীরে, হীরে আচিস না কি রে?'

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শিবদাস হাঁক পাড়লেন। হীরালালের বাড়িতে এর আগে বেশ কয়েকবার এসেছেন। দেশবন্ধু পার্কের কাছে এক হ্যাজানো গলিতে ভাড়াবাড়ি। বেশ কিছুদিন আগে ভাড়াবাড়ি তিনিই খুঁজে দিয়েছিলেন। হাওড়ায় দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি থেকে বউকে নিয়ে তখন হীরে রাতারাতি কলকাতায় চলে এসেছিল। ওর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু এতটা খারাপ হয়ে গেছে, শিবদাস ভাবতেও পারেননি। সর্বত্র দারিদ্রের চিহ্ন।

'কে রে তোরা? আবার বল খেলার জন্যি ডাকতে এয়েচিস বুঝি?' বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। স্থূলকায়া, পরনে দামি শাড়ি, গা ভর্তি গয়না। কোমরে শাড়ির খোঁট গুঁজে, রণরঙ্গিনী হয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। কে এই মহিলা? হীরের বাবা-মা কেউ নেই। তাই মা হতেই পারেন না। সম্ভবত ইনি হীরের সেই ধনী শাশুড়ি, যাঁর সঙ্গে হীরের বনিবনা নেই।

বিষণ্ণমুখে শিবদাস জিজ্ঞেস করলেন, 'হীরে বাড়ি আচে?'

মহিলা বললেন, 'নেই। সকালে বেইরে গ্যাচে। বাড়িতে থাকবে কোন মুকে?'

'আমরা মোহনবাগান কেলাব থেকে এয়েচি।'

'তবে আর কী, আমায় কেতার্থ করে দিইচ। যাও যাও তো বাছা। হীরে আর বল খেলবে না। এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই কো, বল খেলা হচ্চে।'

নীলু ফিসফিস করে বলল, 'চল শিবে। আর কথা ক'স না। এর পর কতা বললে ঝ্যাটাপেটা করে দেবে। অবিশ্যি ঘরদোরের যা অবস্তা দেকলাম, তাতে ঝ্যাটা আচে কি না সন্দেহ।'

দু'জনে চুপচাপ বেরিয়ে এলেন। মুশকিল হল বটে হীরেকে নিয়ে। টিমের একমাত্তর গোলকিপার। অথচ রাইফেল ব্রিগেডের ম্যাচের পর দিন থেকে ওর কোনও হদিশ নেই। গত দু'দিন প্র্যাকটিসে যায়নি। কাল মিডলসেক্সের সঙ্গে খেলা। শৈলেনবাবু প্রচণ্ড রেগে গেছেন হীরের ওপর। কাল বিকেলে বলে দিয়েছেন, 'হীরেকে ডাকতে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। তেমন হলে নীলেকে আমি গোলে খেলাব।' শৈলেন বসু শৃঙ্খলায় বিশ্বাসী।

প্লেয়ারদের খেয়ালিপনা একদম বরদাস্ত করেন না। ডোঙ্গা দত্তের মতো প্লেয়ারকেও তিনি বের করে দিয়েছিলেন, বেনারস থেকে তিন দিন দেরিতে ফেরায়।

রাস্তায় নেমে শিবদাস অসহায়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'হীরেটাকে কোতায় পাব বল তো নীলে। শুনেচি, ও ঠিকেদারি করে। কোতায় লোক পাটাব, বুঝতে পারচি না।'

নীলু বললেন, 'তোর হীরে, তুই খুঁজে বের কর। আমি হচ্চি পেতল। আমি বাড়ি চললুম।'

গলি থেকে বেরচ্ছেন দু'জন, হঠাৎ দেখেন, সেনবাড়ির কাছে পায়চারি করছে হীরে। উসকো খুসকো চুল, শুকনো মুখ, গায়ে হাফ হাতা শার্ট, পরনে ময়লা ধুতি। ওর লম্বা শরীরটা কেমন যেন ঝুঁকে গেছে। প্রথমে নীলুই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই হারামজাদা, তোর আক্কেলটা কী রে? সামনে অত বড় ম্যাচ, অতচ তোর কোনও পাত্তা নেই?'

অপ্রত্যাশিতভাবে শিবদাস আর নীলমাধবকে দেখে হীরালাল হকচকিয়ে গেলেন। কোনও জবাব না দিয়ে তিনি শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলেন। বয়সের তুলনায় শিবদাস অনেক পরিণত। বুঝতে পারলেন, হীরে কোনও সমস্যায় পড়েছে। তিনি বললেন, 'তোর সঙ্গে কতা আচে। চ, আমার বাড়িতে।'

বেঁকে বসলেন হীরালাল, 'না রে, আমার মন ভাল নেই। আমি কোথাও যাব না। ফুটবল টুটবল আর খেলব না। তোরা অন্য কোনও গোলকি খুঁজে নে।'

থমকে দাঁড়ালেন শিবদাস। হীরে বলে কী? ও না খেললে, শিল্ড জেতা তো দূরের কথা, মোহনবাগান সেমিফাইনালের গাঁটও পেরবে না। হীরের হাতটা ধরে সহানুভূতি সুরে তিনি বললেন, 'তোর কী হয়েচে আমায় খুলে বল তো ভাই। যদি সহায় হতে পারি...।'

'কিচু হয় নে কো। তোরা যা। হীরে মুকুজ্জে আর ফুটবল খেলবে না।'

নীলু রেগে উঠল, 'শ্লা ন্যাকামো হচ্চে। হী-রে-মু-কা-র্জি আ-র ফু-ট-ব-ল খে-ল-বে না। শ্লা, গিরিশ ঘোষের অভিনয় করা হচ্চে।'

শুনে মুখ নামিয়ে নিলেন হীরালাল। তাঁর হাত ধরে টানলেন শিবদাস, 'আয়, দেশবন্ধু পার্কে বসে কতা কওয়া যাক। বুঝতে পেরেচি, তোর সমস্যা বাড়িতে।'

তিনজন মিলে দেশবন্ধু পার্কের ভেতর ঢুকে উত্তর-পূর্ব কোণে একটা গাছের নীচে বসলেন। এই গাছের তলায় শিবদাস অনেক বিকেল কাটিয়েছেন। দুই দাদা দ্বিজদাস আর রামদাস যখন খেলতেন, তখন তাঁদের জামাকাপড় আগলাতেন, এই গাছের তলাতে বসেই। দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছেন হীরালাল। তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। কয়েক মিনিট তাঁকে হালকা হওয়ার সময় দিয়ে শিবদাস বললেন, 'তোর সংসারের এই অবস্তা, আগে বলিসনি তো?'

ধুতির খোঁট দিয়ে চোখের কোণ মুছে হীরালাল বললেন, 'এ কী বলার কতা। আমার কি তোদের মতো অবস্তা রে? আমি পাথর চাপা কপাল নিয়ে জন্মেচি। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গ্যাচে। ছিলুম হাওড়ায় দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে। স্কুল থেকে বেরিয়ে ভর্তি হলুম শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। ওখানে কলেজ টিমে খেলতুম। একবার সাহেব ছাত্রদের

সঙ্গে মারপিট হল। শুনে জামাইবাবু রেগে গেলেন। বললেন, সাহেবরা হচ্চে গে রাজার জাত। ওদের সঙ্গে আর ফুটবল খেলতে হবে না। তবুও খেলার টানে পাঁচিল টপকে রোজ আমি পালাতাম। একদিন ধরা পড়ে গেলুম। জামাইবাবু বললেন, তোমাদের ভার আমি আর নিতে পারব না।'

শিবদাস বললেন, 'তা'লে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে গেলি কেন?'

'সেও জামাইবাবুর জন্যি। পাড়ার মেয়ের বিয়ে। নেমতন্ন খেতে গেচি। শুনি, বরের ওলাওঠা হয়েচে। সে বিয়ে করতে পারবে না। মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা হবে। জামাইবাবুই জোর করে আমায় বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিলেন। পরে শুনি, মেয়ে কালো বলে বর বিয়ে করতে চায়নি। ওই বিয়ে করেই আমি ফেঁসে গেচি শিবে। দ্যাক, আজ মাসের তেইশ তারিখ। অথচ ঘরে এক কণা চাল নেই। ইদিকে আবার বউয়ের অসুক। ওষুধ কেনার পয়সাটা পর্যন্ত নেই। এই দ্যাক, প্রেসক্রিপশন পকেটে নিয়ে ঘুরচি। শাউড়ি বলেচে, আমি আর খাই খরচ দিতে পারব না। ওষুধ কিনে তবে ঘরে ঢুকবে।'

শিবদাস বললেন, 'এ সব কতা আমাকে বলিসনি কেন হীরে?'

'কী বলব? রাতদিন শাউড়ির মুকঝামটা খাচ্চি। আমি যে কী মন নিয়ে রোজ খেলতে যাই, তোরা জানবি কী করে? বোসবাড়ি থেকে আসবার সময়, রোজ ভাবি, আর যাব না। কিন্তু ওখেনে পা দেওয়ার পর বাড়ির কতা আর মনে থাকে না। তখন মনে হয়, আমার জন্ম সার্থক, মোহনবাগানে খেলার সুযোগ পেইচি।' নাগাড়ে কথাগুলো বলে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন হীরে।

'শান্ত হ, তুই যদি আগে এ সব কতা বলতিস, তা'লে কাকামশায়কে দিয়ে একটা ব্যবস্তা করতাম। যাক গে, আগে বল তো, এই সাতসকালে সেনবাড়ির সামনে ঘুরঘুর করচিলি কেন?'

হীরে মুখ নামিয়ে বললেন, 'কাল রাত্তিরে ধানী মিত্তিরের লোক আমাদের বাড়িতে এয়েচিল। শাউড়িকে বলে গ্যাচে, হীরে যদি শিল্ডে আর না খেলে, তা'লে পনেরো টাকা দেবে। বউ তো অতশত বোঝে না। অত টাকা! বলচে, ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। ঘুম থেকে উঠেই পালিয়ে এয়েচি। ভাবচিলুম, সেনবাড়ির মণিবাবুর কাচেই না হয় হাত পাতি। হাতে টাকা পেলে ফিরিয়ে দেব। দেখা হল, কিন্তু নজ্জায় কইতে পারলুম না। জীবনটা আমার নষ্ট হয়ে গেল রে শিবে।'

শুনে চমকে শিবদাস তাকালেন নীলুর দিকে। ধানী মিত্তিররা এত নীচেও নামতে পারে? এতটা নোংরামি তিনি আশা করেননি। শৈলেনবাবুর কথা না শুনে ভাগ্যিস তিনি হীরের বাড়িতে এসেছেন। না হলে তো এ সব জানতেও পারতেন না। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'চল আগে তোর বউয়ের ওষুধগুলো কিনে আনি। তার পর অন্য ব্যবস্তা।'

দু'জনে মিলে জোর করে তুলে নিলেন হীরালালকে। একটা কেরাঞ্চি গাড়ি ডেকে তিনজনে চেপেচুপে বসলেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই তাঁরা পৌঁছে গেলেন হেদুয়ায়। বেথুন স্কুলের কাছেই বসাকদের মেডিসিন শপ। কৃষ্ণভামিনীর ওষুধ কেনার জন্য প্রায়ই শিবদাস এই দোকানে আসেন। কাউন্টারে বসে আছেন মালিক গৌরহরি বসাক। শশব্যস্ত হয়ে

তিনি নেমে এলেন, 'আসুন শিবদাসবাবু, আসুন। আমার সৌভাগ্য, আপনাদের মতো লোকের পদধূলি পড়েচে।'

এ ধরনের কথা শিবদাস মোটেই পছন্দ করেন না। গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, 'আমার কিচু মেডিসিন দরকার। দেখুন তো, আপনার কাচে আচে কি না।'

গৌরহরি হাঁক পাড়লেন এক কর্মচারীর উদ্দেশে। তার পর প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে বললেন, 'কার কী হয়েচে শিবদাসবাবু, এ তো আপনার স্ত্রীর প্রেসক্রিপশন না।'

শিবদাস বললেন, 'এ প্রেসক্রিপশন হীরালালের বউয়ের। এ আমাদের টিমের গোলকিপার হীরালাল, আর এ হচ্চে রাইট হাফব্যাক নীলমাধব ভটচায।'

খুশি যেন উপচে পড়ল গৌরহরির গলা থেকে, 'আরিব্বাস কী সৌভাগ্য! দোকান ধন্য হল আমার।' বলেই তিনি প্রেসক্রিপশনটা তুলে দিলেন কর্মচারীর হাতে। তার পর ফের শিবদাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'সেদিন পল্টনদের যে গোলটা আপনি দিলেন, মার্ভেলাস।'

ফের সেই ভ্রান্তিবিলাস। লোকে দাদার সঙ্গে তাঁকে গুলিয়ে ফেলে। শিবদাস বিরক্ত হয়ে বললেন, 'গোল সেদিন আমি করিনি। করেছিল আমার দাদা বিজয়দাস।'

শুনে গৌরহরি একটু অপ্রস্তুত হলেন। ইতিমধ্যে কর্মচারী ওষুধের প্যাকেট এনে দিয়েছেন। পকেট থেকে টাকা বের করে শিবদাস বললেন, 'কত দিতে হবে বসাকমশাই?'

জিভ কেটে, কানের লতিতে হাত দিয়ে গৌরহরি বললেন, 'ছি ছি, কী বলচেন শিবদাসবাবু। আপনার থেকে পয়সা নেওয়া পাপ। আপনারা হলেন গিয়ে দেশের গৌরব। সাহেবদের সঙ্গে লড়চেন। আমাদের জন্যই না। পরাধীন থাকার খুব কষ্ট। ফিরিঙ্গিদের অত্যাচার আর সহ্য করতে পারচি না মহাই। দয়া করে একদিন অন্তত মাঠ থেকে... মাথা উঁচু করে ফিরতে দিন।'

দোকানে অন্য ক্রেতারা দাঁড়িয়ে দেখছেন। শিবদাস বারকয়েক জোর করে দাম দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তা সত্ত্বেও টাকা নিতে রাজি হলেন না গৌরহরি। একটু লজ্জাই পেলেন শিবদাস। একটু আগে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। গায়ে পড়ে তোষামুদি তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। আসলে অন্যদিন গৌরহরি এত কথা বলেন না। কাউন্টারে বসে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। আজ আপ্যায়নের বহর দেখে শিবদাস প্রথমে ভেবেছিলেন, গৌরহরি অন্য ক্রেতাদের দেখানোর চেষ্টা করছেন, মোহনবাগানের প্লেয়াররা এই দোকান থেকে ওষুধ কেনেন। কিন্তু এখন তাঁর মুখে বিনয়, আচরণে শ্রদ্ধার ভাব দেখে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে উঠে তিনজনই বিহ্বল। মোহনবাগানের জয়, সাধারণ লোকের মনে কী রকম দাগ কেটেছে, সেটা এখন বুঝতে পারছেন। যেন বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন। এখন নামার চেষ্টা করলেও আর নামতে পারবেন না। তিনজনই বেশ কিছুক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। গাড়ি হাতিবাগানের কাছে পৌঁছনোর পর প্রথম মুখ খুললেন শিবদাস, 'দেকলি তো হীরে, লোকে কী র'ম তাকিয়ে রয়েচে আমাদের দিকে? ওদের পানে চেয়ে কি আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়?'

হীরালাল মুখ ফিরিয়ে বসেন। কোনও উত্তর দিলেন না। নীলু বলল, 'মোহনবাগানের জন্য যদি জান দিতে হয়, তাও দেব। সাহেবদের কাল ছাড়ব না।'

হঠাৎ ফোঁপানোর শব্দ শুনতে পেলেন নীলু আর শিবদাস। মুখ ঘুরিয়ে তাঁরা দেখলেন, দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন হীরালাল। ফুঁপিয়ে বলছেন, 'জীবনে আজ একটা বড় ভুল করতে যাচ্চিলুম রে শিবে। সামান্য একটু কষ্ট সহ্য করতে পারলুম না? জীবনে সম্মান বলে কিচু পাইনি। কিন্তু আজ দেকলুম, সব কিচু হারিয়ে যায়নি।'

ধুতির খোঁট দিয়ে চোখ মুছে নিলেন হীরালাল। বললেন, 'কাল আমি খেলব রে। কোনও কষ্টই আর কষ্ট বলে মনে করব না। আমি আর বাড়ি ফিরচি না শিবে। ফের বউয়ের সামনে গেলে দুর্বল হয়ে যাব। তোরা কেউ এই ওষুধটা আমার বাড়িতে দিয়ে আয়। আমায় বোসবাড়িতে নাবিয়ে দে। এই ক'টা দিন আমি বোসবাড়ির তক্তপোশেই কাটিয়ে দেব।'

(পঁচিশ)

যতীনের কাছে না কি পিস্তল আছে। সেটা আজ দেখাবে বলেছিল। বেলা দশটা বেজে গেল, এখনও এল না। বাদুড়বাগানের মেসে অভিলাষ উসখুস করছেন। সকালবেলায় রাজেনদা মেস থেকে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, 'তুই তৈরি হইয়া থাকিস। বেলা একডার সময় একলগে আমরা বোসবাড়িতে যামু। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি ফিইরা আইতাছি।' রাজেনদা বেরিয়ে যাওয়ায় অভিলাষ হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। ওর সামনে পিস্তলটা যতীন বের করত কি না সন্দেহ।

যতীন বলেছে, দু'হাতে পিস্তল চালাতে পারে। নাকি একেবারে নিখুঁত নিশানায়। মেদিনীপুরে কোন এক জঙ্গল আছে। সেখানে বিপ্লবীরা প্র্যাকটিস করে। গোপন ক্যাম্পের গল্প যতীন একদিন করেছিল। তার পর থেকে অভিলাষের প্রচুর কৌতূহল। ময়মনসিংহে তাঁদের বাড়িতে দুটো বন্দুক আছে জ্যাঠামশাইয়ের। মাঝে মধ্যে খুলনায় শিকার করতে যান। বাঘ, হরিণ মেরে আনেন। বাড়িতে বন্দুক আরও একটা কারণে রাখা হয়েছে। ডাকাতের আশঙ্কায়। বন্দুক দুটো ধরা বারণ। জ্যাঠামশাই কাউকে ধরতে দেন না। কেন না, লাইসেন্স তাঁর নামে।

সাড়ে দশটার সময় অধৈর্য হয়ে অভিলাষ মেস থেকে বেরিয়ে এলেন। না, যতীনের ডেরায় যাওয়া দরকার। ও সাধারণত কথার খেলাপ করে না। বোধহয় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও যেভাবে দিন কাটায়, তাতে সুস্থ থাকা কঠিন। স্নান-খাওয়ার ঠিক নেই। পুলিশের তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। যে কোনও দিন ধরা পড়তে পারে, পুলিশের গুলি খেয়ে মারা যেতে পারে। তবুও ওর ভয়ডর নেই। যতীন এক আশ্চর্য ছেলে।

মানিকতলায় নতুন এক আস্তানার কথা যতীন সেদিন কথায় কথায় বলেছিল। ৪৭ নম্বর বাড়ি। অভিলাষ হাঁটতে হাঁটতে সেই বাড়ির উল্টো দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। চট করে ঢোকা উচিত হবে না। পুলিশের নজর থাকতে পারে। বিপ্লবীরা আটকে দিতে পারে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করাই ভাল। একটা সরবতের দোকানের আড়ালে থেকে বাড়ির

দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন অভিলাষ। রাস্তা দিয়ে অনবরত গাড়ি যাচ্ছে। এই সময় ক্লাবের কেউ যদি দেখে ফেলেন, তা হলে মুশকিল। শিল্ডে খেলার পর থেকে অনেকেই তাঁকে চিনতে পারছেন। কেউ যদি শৈলেনবাবুর কাছে গিয়ে বলেন, অভিলাষকে আজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম, তা হলে উনি চটে যাবেন।

মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর অভিলাষ যা দেখলেন, তাতে অবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছেন রাজেনদা। এদিক ওদিক তাকিয়ে উনি জনস্রোতে মিশে গেলেন। রাজেনদা এই বাড়িতে? অভিলাষ ঠিক মেলাতে পারলেন না। পরক্ষণেই সিদ্ধান্তে এলেন, হয়তো এই বাড়িতে ওঁর কোনও আত্মীয় থাকেন। তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন। না, যতীনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ঠিক হবে না। কথায় কথায় এই বাড়ির কেউ রাজেনদাকে বলে দিতে পারেন, যতীনের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক আছে। কথাটা ভাবা মাত্রই অভিলাষ মেসের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন।

হেদুয়ার কাছে পৌঁছে হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলছেন, 'পা চালাইয়া পাশের গলিতে ঢুইক্যা পড়। পিছনে তাকাইস না।' খুব পরিচিত গলা। অবাক হলেও ঘাড় না ঘুরিয়ে অভিলাষ সোজা পাশের গলিতে ঢুকে পড়লেন। এই গলি দিয়ে বাদুড়বাগানে যাওয়া যায়।

মিনিট দশেক হেঁটে মেসে পৌঁছনোর পর পিছন ফিরে তিনি দেখলেন, রাজেনদা। ঘরে ঢুকে রাজেনদা প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কাসে গেসিলি?'

দু'বছরের সিনিয়র, ময়মনসিংহ থেকে রাজেনদাই অভিলাষকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। তাই মিথ্যে কথা বলতে পারলেন না অভিলাষ। বললেন, 'যতীনের কাছে।'

'তুই জানস না, যতীনের কী হইসে?'

'না,' অভিলাষ অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, 'যতীনের কী হইসে?'

'অহন পুলিশ কাস্টোডিতে। অরে দায়িত্ব দেওয়া হইসিল, ডালহৌসি স্কোয়ারে গিয়া এক জজের গাড়িতে বোমা মারতে অইব। তার আগেই পুলিশ অরে ধইর‍্যা ফ্যালে।'

'তুমি জানলা কী কইর‍্যা রাজেনদা? তুমিই বা ওহানে গেসিলা ক্যান?'

'যতীনের খবরডা কাগজে বাইর হইসে। তুই তো কাগজ পড়ার সময় পাস না। তাই জানস না। ক্লাবের কাউরে কইস না। আমি মুক্তি সংঘের মেম্বার হইসি। আমার মরাল সাপোর্ট আসে।'

'তোমার বাড়ির লোকেরা জানে?'

'না না। জানলে আর কইলকাতায় থাকতে দিব না। ঢাকায় লইয়া যাইব। একডা কথা ক'তো। যতীন তরে যাইতে কইসিল, না কি তুই নিজেই ওহানে গেসিলি।'

'হ্যার আসার কথা ছিল এহানে। আমারে পিস্তল দেখাইব কইসিল। আসে নাই বইল্যা, আমি ওহানে গ্যাসিলাম।'

'আর কুনদিন যাইস না। পুলিশ নজর রাখতাসে ওই বাড়িডার উপর। উল্টা দিকে একডা সরবুতের দোকান আসে, হেইডা পুলিশের। কে যায়, কে আহে, অরা নজর রাখে। তুই বাইচ্যা গেছস, ভিতরে যাস নাই।'

'যতীনের কী হইব রাজেনদা?'

'কী আর হইব। পুলিশ অর নামে অনেক কেস দিসে। ফাঁসি হইতে পারে, লাইফ সেনটেন্স হইতে পারে। কিছু কওন যায় না। কাকামশায়রে আমি কইসি। উনি যতীনের হইয়া কেস লড়বেন, কইসেন। যতীনরে নিয়া ভাইব্যা আর লাভ নাই। আইজকার ম্যাচ নিয়া ভাব। যা, চান-ডান কইর‍্যা নে।' কথাগুলো বলে রাজেনদা ওপরতলায় নিজের ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু প্রিয় বন্ধু যতীনের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না অভিলাষ। লক আপে বিপ্লবীদের ওপর পুলিশ কী রকম অত্যাচার চালায়, তার গল্প যতীনের কাছেই শুনেছেন তিনি। সে নাকি অমানবিক। পুলিশ নাকি চুরুটের ছ্যাঁকা দেয়, পায়ের তলায় গুঁতো মারে, হাত পায়ের নখ উপড়ে নেয়। যতীনের শরীরের তো ওই অবস্থা। ও সহ্য করবে কী করে? ভাবতেই শিউরে উঠলেন অভিলাষ। প্রথমে যতীনের জন্য আশঙ্কা, তার পর বাঙালের গোঁ চাপল মাথায়। সাদা চামড়ার লোকদের ওপর রাগ হতে শুরু করল। ভাগ্যিস, পিস্তল চালানো তিনি জানেন না। জানলে, গুলি করে ওদের মেরে ফেলতেন।

...বেলা পাঁচটার সময় টিমের সঙ্গে অভিলাষ যখন ডালহৌসি মাঠে পৌঁছলেন, তখনও যতীনের কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। ঘণ্টাখানেক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাঠ বেশ নরম। কাতারে কাতারে লোক এসে হাজির হয়েছেন। লোকে টাচ লাইনের কাছাকাছি বসে পড়েছে। আশপাশের গাছগুলো ফাঁকা নেই, লোকে ভর্তি। মাঠের চারপাশে চেয়ার, বেঞ্চ আর সাময়িক গ্যালারি। চার আনা দিয়ে সেই গ্যালারিতে বসার জন্যও লোকের হুড়োহুড়ি। সেই তুলনায় ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা খুবই কম। মাঠের ভেতর গা ঘামানোর সময় অভিলাষের মনে হল, মোহনবাগানের সমর্থকরা যদি ইউরোপীয়দের তাড়া করেন, তা হলে পালিয়ে ওরা কুল পাবে না।

মাঠে আসার আগে টিম মিটিংয়ে শিবেদা বলে দিয়েছেন, 'সেন্টার ফরোয়ার্ডে নয়, খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অভিলাষ তোকে রাইট আউটে সরে যেতে হবে। রাইট আউট কানু হয়ে যাবে লেফট আউট।' জায়গা বদল করে খেলা, দুখীরামবাবুর ট্যাকটিকস। পজিশন যা-ই হোক না কেন, অভিলাষ মনের ভেতর থেকে জোর তাগিদ অনুভব করলেন, গোরা পল্টনদের আজ ছিঁড়ে খেতে হবে। দরকার হলে গা জোয়ারি করেও।

মিডলসেক্স টিমের ক্যাপ্টেন ওদের গোলকিপার পিগট। টস জিতে রেড রোডের দিকে, অর্থাৎ পশ্চিম দিককার গোলটা তিনি বেছে নিলেন। সূর্য পশ্চিম আকাশে। রোদ গিয়ে পড়বে উল্টোদিকের পোস্টে। অর্থাৎ মোহনবাগানের দিকে। সূর্যের দিকে চোখ পড়বে বলে, দূর পাল্লার শট করতে গিয়ে ধন্ধে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে মোহনবাগান গোলকিপারের। ডালহৌসি মাঠ পূর্ব-পশ্চিম বরাবর বলেই এই অসুবিধা। ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন পিগট। টস জিতলে শিবেদাও রেড রোডের দিককার গোল প্রথমে বেছে নিতেন। অভিলাষ কিন্তু মনে মনে বললেন, 'যে দিক থেকেই খেলা শুরু করো না কেন, লাভ হবে না সাহেব। ম্যাচ তোমাদের জিততে দেব না।'

লড়াই শুরু হয়ে গেল। ইনসাইড স্টেইনস বল বাইরে মারলেন। সেন্টার ফরোয়ার্ড ডাও-য়ের শট ডাইভ মেরে ধরলেন হীরেদা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শিবেদা চমৎকার ড্রিবল করে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ওঁর শট বাঁচালেন পিগট। খেলা আপ অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে। চোখে রোদ পড়ছে। তবুও পর পর দু'টো দূরপাল্লার শট আটকালেন হীরেদা। আচমকা আবার শট। এবার লেফট হাফব্যাক ক্লার্কের। সেই বল ধরতে গিয়ে সামান্য পিছলে গেলেন হীরেদা। বল গ্রিপ করতে পারলেন না। বল গোলের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে, ঝাঁপিয়ে পড়ে হীরেদা বুকের কাছে চেপে ধরলেন।

দূর থেকে অভিলাষ দেখতে পেলেন, বল আঁকড়ে জমিতে পড়ে আছেন হীরেদা। গোললাইনে জটলা। কেউ একজন হীরেদাকে লাথি মারলেন। বলসুদ্ধু তাঁকে গোলের ভিতর পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য। দেখে রক্ত গরম হয়ে গেল অভিলাষের। নিজেদের গোলের দিকে তিনি দৌড়তে শুরু করলেন। সাদা চামড়ার ফুটবলাররা একের পর এক লাথি মেরে যাচ্ছেন হীরেদাকে। তবুও হীরেদা বল ছাড়ছেন না। কাছে গিয়ে কার যেন হিসহিসানি শুনতে পেলেন অভিলাষ, 'পুশ দ্য বাস্টার্ড ইনটু দ্য গোল।' প্লেয়ারটা কে? তাঁকে লাথি মারার তাগিদ বোধ করে, অভিলাষ দেখতে পেলেন, গোল লাইনের ভেতর উপুড় হয়ে পড়ে আছেন হীরেদা। মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তবুও বল ছাড়েননি হাত থেকে।

লাফিয়ে জটলার মাঝে ঢুকে গেলেন অভিলাষ। কনুই মেরে ছিটকে ফেলে দিলেন হাফ ব্যাক ক্লার্ককে।

পল্টন ফুটবলাররা 'গোল' বলে রেফারির কাছে দৌড়ে যাচ্ছে। রেফারি ম্যাকিন্টশ দ্বিধায়। তিনি পরামর্শ করতে ছুটে গেলেন লাইন্সম্যান ক্লেটনের দিকে। তার পরই লম্বা গোলের বাঁশি। এ কী? ফাউল বলে নিয়মটা কি উঠে গেছে? ম্যাকিন্টশ গোল দেওয়ায় সমর্থকরা মেনে নিতে পারেননি। হই হই করে তাঁরা মাঠের ভেতর ঢুকে পড়েছেন। গালাগাল করছেন রেফারিকে। গোল বাতিল না করলে, খেলা চালাতে দেবেন না। কিন্তু পুলিশ ব্যাটন হাতে তেড়ে যেতেই, তাঁরা আবার সাইড লাইনের বাইরে চলে গেলেন।

হাফ টাইমে এক গোলে পিছিয়ে মোহনবাগান। শিবেদা বললেন, 'দমে যাস না। হাতে এখনও পঁচিশ মিনিট সময় আচে। গোল শোধ হয়ে যাবে।'

হীরের পাঁজরে চোট লেগেছে। শুশ্রূষা চলছে। নীলুদা বললেন, 'কী হবে রে, হীরেটা তো উঠে দাঁড়াতেই পারচে না। খেলবে কী করে?

শিবেদা বললেন, 'ঠিক খেলবে। চিন্তা করিস না।'

ফের খেলা শুরু হতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহনবাগান। উথেনের শট হীরেদা ডাইভ মেরে আটকালেন। সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের সে কী উল্লাস। একটু পরে শিবেদার শট ধরে ফেললেন পিগট। সারা মাঠ পাগলের মতো চষে বেরাচ্ছেন সবাই। সময় চলে যাচ্ছে... গোল শোধ হচ্ছে না। সেকেন্ড হাফের মাঝামাঝি শিবেদা সেন্টার ফরোয়ার্ড পজিশনে চলে এলেন। কানুদাকে পাঠিয়ে দিলেন লেফট উইংয়ে। এই একটা চালে ভড়কে গেল মিডলসেক্স ডিফেন্স। শিবেদার কাছ থেকে বল পেয়ে কানুদা চড়চড় করে উঠে, জোরাল শট নিলেন গোল লক্ষ্য করে। পিগট আন্দাজ করতে পারেননি, কানুদা অতদূর থেকে

শটটা নেবেন। বাঁক খেয়ে সেই বল ঢুকে গেল গোলে। আনন্দে দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়েছেন। ছাতা খুলছেন, চাদর ওড়াচ্ছেন। মাঠ পরিষ্কার করতেই পুলিশের কয়েক মিনিট লেগে গেল।

খেলা ফের শুরু হতেই হাবুলদা চিৎকার করে বললেন, 'অভিলাষ, এ বার তোর পালা। ১-১ তো হল। আমি তোকে বল বাড়াচ্চি, এবার তুই একটা গোল কর ভাই।'

অভিলাষ মনে মনে বললেন, ১-১ এখনও হয়নি হাবুলদা। হীরেকে লাথি মারার বদলাটা এখনও নেওয়া হয়নি। কাল যদি রিপ্লে হয়, হীরে তাতে নামতে পারবে কি না সন্দেহ। পল্টনরাও যাতে পুরো টিম নিয়ে খেলতে না পারে, তার ব্যবস্থা করছি। তা হলেই প্রকৃত ১-১ হবে। সুযোগটা খুব শিগগিরই পেয়ে গেলেন অভিলাষ। বল নিয়ে ড্রিবল করার সময় হাফব্যাক উথেনের পা চেপে দিলেন। কট করে একটা শব্দ হল। ছিটকে পড়ে উথেন যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন। মিডলসেক্সের বেস্ট প্লেয়ার... ধরাধরি করে তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে অদ্ভুত ধরনের এক আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন অভিলাষ।

যতীনের পিস্তলটা যেন এখন তাঁর হাতে। এখুনি তার ট্রিগার টিপলেন।

(ছাব্বিশ)

কালী মিত্তির বললেন, 'তোমরা প্রোটেস্ট করো। এ জুলুমবাজি সহ্য হচ্চে না। আইএফএ প্রেসিডেন্ট নিন্দ মানুষটা খারাপ না। আমি বলচি, তোমাদের প্রোটেস্ট গ্রান্ট হবেই।'

মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়ে সক্কালবেলাতেই বোসবাড়িতে চলে এসেছেন কালী মিত্তির। সেই সময় খবরের কাগজগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিলেন শৈলেনবাবু। গতকাল সেমিফাইনালে এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে, যা ঘটা উচিত ছিল না। রেফারিং নিয়ে প্রতিবাদ করার কথা বলছেন কালী মিত্তির। সত্যি, এমন নির্লজ্জ রেফারিং, ভাবা যায় না। খেলা ১-১ ড্র হয়েছে। আগামীকাল রিপ্লে। কিন্তু আইএফএ-র ভাবগতিক দেখে শৈলেনবাবুর মনে হচ্ছে, মোহনবাগানকে ফাইনালে উঠতে দেবে না।

কালী মিত্তির নিজে ম্যাচটা দেখেছেন। তিনি খুব খেপে আছেন রেফারি ম্যাকিন্টশের ওপর। তাঁর রাগ বেশি টাচ জাজ ক্লেটনের ওপর। গোলকিপার হীরেকে নিয়ে মিডলসেক্স টিমের তিন চারজন মিলে রাগবী খেলল, লাথি মেরে মেরে তাকে গোলের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে গোলের দাবি তুলল, আর ওমনি গোল অ্যালাউ করতে হবে? ফুটবল আইনে বলছে, গোলকিপারকে বড়জোর শোল্ডার চার্জ করা যেতে পারে। কিন্তু গায়ের জোরে বলসুদ্ধু তাকে গোলের ভেতর ঢুকিয়ে গোল আদায়—এ তো পরিষ্কার জোচ্চুরি।

শৈলেনবাবুকে চুপ করে থাকতে দেখে কালী মিত্তির বললেন, 'রিপ্লেতে ম্যাকিন্টশ রেফারি থাকলে কিন্তু কিচুতেই তোমরা ম্যাচ জিতবে না। তোমরা যদি গ্রিন সিগন্যাল দাও, তা'লে আমি আইএফএ-তে গিয়ে চেঁচামেচি করতে পারি।'

শৈলেনবাবু এ বার বললেন, 'কাকামশায়কে তো আমি জানি, প্রোটেস্ট করায় উনি

কোনওদিন উৎসাহ দেবেন না। উনি বলেন, মোহনবাগান পেরেন্ট বডির এগেনস্টে প্রোটেস্ট করবে না। ওরা যা ডিসিশন দেবে, আমাদের মেনে নিতে হবে।'

একটু অবাক হয়েই কালী মিত্তির তাকালেন শৈলেনবাবুর দিকে। এই ছেলেটার ভেতর আগুন ছিল। কী হলটা কী ? দু' বছর আগের একটা কথা মনে পড়ল। শ্রফশায়ারের বিরুদ্ধে ম্যাচ মোহনবাগানের। খেলা শেষ হওয়ার পর কয়েকজন গোরা ফুটবলার ঘুসি বাগিয়ে তেড়ে এল। অশ্রাব্য গালিগালাজ করে ওরা যখন মারধর করার জন্য হাত তুলেছে, তখন বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই শৈলেন। এক ঘুসিতে এক গোরাকে ছিটকে ফেলে দেওয়ার পর, ও চিৎকার করে বলে উঠেছিল, 'ইফ ইউ আর কিং'স সোলজারস, কাম ওয়ান বাই ওয়ান।' ওর সেই রুদ্রমূর্তি দেখে গোরা ফুটবলাররা সেদিন পালিয়ে যায়। সেই শৈলেনের কী হল?

কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপচাপ। এমন সময় কালী মিত্তির দেখলেন গণেন মল্লিক আসছেন। মিডলসেক্স ম্যাচে মাঠে গণেনকে দেখেননি তিনি। কাছে আসতেই কালী মিত্তির বললেন, 'কী ভায়া, কাল তোমায় মাঠে দেকলুম না। কোতায় গায়েব হয়েচিলে?'

চেয়ার টেনে বসার ফাঁকে গণেন বললেন, 'রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে আসচেন। সে ব্যাপারে খোঁজ নিতে কাল ব্যস্ত ছিলুম। শুধু ফুটবল নিয়ে পড়ে থাকলে তো আমাদের চলবে না দাদা। আমাদের সব ধরনের রিপোর্টই করতে হয়।'

কালী মিত্তির ঠাট্টা করে বললেন, 'কপাল করে জন্মেচ। রাজপুরুষদের সঙ্গে ওঠাবসার সুযোগ পাচ্চ। আমাদেরও একটু দেকো?'

গণেন মল্লিকও পাল্টা দিলেন, 'আপনিও তো রাজারাজড়া কম দেকেননি দাদা। শোভাবাজার রাজবাড়ি তো একটা সময় আপনার আর নগেনদার কথায় উটত বসত। যাক সে কতা, আইএফএ আপিসে গেসলুম। দু'টো সুখপর আচে। একটা হল, মিডলসেক্সের হাফব্যাক উথেন কাল রিপ্লেতে খেলতে পারচে না। পায়ের হাড় ভেঙেচে। প্লাস্টার করে এখন সে ব্যাটা হসপিটালে। মোহনবাগানের সুবিধে হয়ে গেল। উথেনের বদলে মিডলসেক্স নামাবে ডার্লিংকে।'

শুনে উৎফুল্ল কালী মিত্তির, 'তোমার দু'নম্বর সুখপরটা কী শুনি?'

'ম্যাচের রেফারি বদলে যাচ্চে। সাহেবরা একটু ঘাবড়েচে বলে মনে হচ্চে। কার কাচ থেকে ওরা শুনেচে, এক্সট্রিমিস্টরা না কি বদলা নেবে। ইয়ংবেঙ্গল চটে আচে।'

'কাকে দিচ্চে সুপারভাইস করতে?'

'মনে হয়, পুলার সাহেবকে। ক্যালকাটা ক্লাবের প্লেয়ার।'

'কিন্তু কারেন্ট প্লেয়ার কি রেফারিং করতে পারে?'

'এই কোয়েশ্চেনটাই আমি করেচিলুম। ওরা বললে, সেমিফাইনালে ক্যালকাটা ক্লাব ইস্ট ইয়র্কের কাচে হেরে গেচে। ওরা এখন টুর্নামেন্টের বাইরে। তাই পুলার একন ম্যাচ খেলাতে পারে।'

শুনে শৈলেনবাবু খুশি হলেন। সাধারণ লোক যে পক্ষপাতিত্ব রেফারিংয়ে মোটেই সন্তুষ্ট হয়নি, আজ সকালেই তা টের পেয়েছেন তিনি। গড়পারে সিংহদের বাড়িতে

গেছিলেন, স্বদেশি মেলার কার্ড দিতে। সেখানে অল্পবয়সি ছেলেরা ঘিরে ধরেছিল। 'কাল কিন্তু আমরা তৈরি হয়েই মাটে যাব। ত্যান্ডাই ম্যান্ডাই করলে রেফারিকে গোড়ে দিয়ে দেব। আপনাকে বলে রাকলাম।' ছেলেদের মধ্যে দু' একজনকে চেনেন শৈলেনবাবু। বিপ্লবী দলের সদস্য। মারদাঙ্গায় তিনি অবশ্য ভয় পান না। আবার খেলার মাঠে রক্তগঙ্গা বয়ে যাক, এটাও তিনি চান না।

কাঁধের ঝুলি থেকে একটা চিঠি বের করলেন গণেন। শৈলেনবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই চিঠিটা আমাদের আপিসে একজন দিয়ে গেচেন। পড়ে দেকুন দাদা।'

চিঠিতে চোখ বোলালেন শৈলেনবাবু, '২৪ জুলাই আপনি নিজে মাঠে উপস্থিত ছিলেন কি না জানি না। ইচ্ছাকৃত ফাউলের অপরাধে খেলোয়াড়কে প্রথমে সতর্ক করে, পরে মাঠ থেকে বহিষ্কার করা সম্পর্কে ফুটবলে একটা আইন আছে। কিন্তু শিল্ড সেমিফাইনালে সেই আইনটা প্রয়োগ করা হল না কেন, সেটা ভেবে আমরা অবাক হচ্ছি। রেফারির লক্ষ কোটি চোখ হতে পারে না, আমরা জানি। কিন্তু দু'টি চোখ দিয়ে তাঁর দেখা উচিত, খেলার নিয়মভঙ্গ হচ্ছে কি না। মিডলসেক্স দল ওইদিন হাসতে হাসতে সব আইন ভেঙেছে। তবুও তাদের একজনকেও মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়নি। সাদা কালো কোন দল জিতবে এ নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। খেলাটা খেলাই।'

চিঠিটা পড়ে ফেরত দিলেন শৈলেনবাবু। নির্ঘাত কোনও ইংরেজের লেখা। হোলি সাহেব হতে পারেন। শিবদাসের প্রতি তাঁর অন্ধ ভালবাসা। মোহনবাগানের এত বড় সাপোর্টার তো আর নেই। কে যেন সেদিন বলল, হোলি সাহেব বিলেতের কাগজেও চিঠি লিখেছেন, ইংরেজদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারেন, এমন ফুটবলার কলকাতাতেও আছেন। গণেনবাবুকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এই চিঠি কি আপনাদের কাগজে ছাপা হবে?'

'নিশ্চয়ই হবে। বাই দ্য বাই, যে খপরটা নিতে আপনার কাচে এলুম। হীরে কি রিপ্লেতে খেলতে পারবে? কেমন আচে সে?'

হীরের কথা ভুলেই গেছিলেন শৈলেনবাবু। কাল ম্যাচের সময় এত মার খেয়েও হীরে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসেনি। কই মাছের জান। সাহেবদের লাথি খেয়ে ওর ওপরের পাটির সব দাঁত নড়ে গেছে। কানে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। রাতে ব্যথায় কাতরাচ্ছিল দেখে কাকামশায় আর্জেন্ট কল দিয়ে ডেকে আনেন ডাঃ নীলরতন সরকারকে। খালি গায়ে হীরেকে দেখে তিনি শিউরে ওঠেন। কাঁধে, পিঠে, কোমরে লাল চাকা চাকা দাগ। প্রচণ্ড ব্যথা কাঁধে ও কানের ভেতরে। কাঁধে ডিসলোকেশন হতে পারে। এই আশঙ্কা করে হীরেকে ক্যাম্পবেল হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে এক্স রে করানোর কথা বললেন নীলরতনবাবু। কিন্তু হীরে যেতে রাজি হল না। বলল, 'ডাক্তারবাবু, ও সব যা করার... শিল্ড শেষ হয়ে যাওয়ার পর করবেন। আপাতত ওষুধের বড়ি দিন। মাঠে যাতে অন্তত পঞ্চাশটা মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, আগে সেই ব্যবস্থাটা করুন।' ওর মনের জোর দেখে নীলরতনবাবু অবাক হয়ে গেছেন।

হীরে এখন বোসবাড়িতেই আছেন। সকালে ওঁর খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু

কালী মিত্তির এসে যাওয়ায়, খবরটা শৈলেনবাবু নিতে পারেননি। গণেনকে তিনি বললেন, 'কাল হীরে খেলতে পারবে কি না, সেই ডিসিশনটা শিবদাস নেবে। আমার একটাই গোলকিপার। হীরে যদি খেলতে না পারে, তা'লে টিমের ব্যালান্সটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমি কিচু ভাবতে পারচি না কো।'

অন্দর মহল থেকে জলখাবার চলে এল। স্বদেশি বিস্কুট আর চা। প্রথমে না না করেও পরে প্লেট টেনে নিয়ে খেতে খেতে গণেন মল্লিক বললেন, 'একটা ইন্টারেস্টিং খবর আচে। কোন কাগজ যেন লিকেচে, এই যে বলা হচ্চে মোহনবাগান পুরোপুরি বাঙালিদের টিম, এটা সত্যি নয়। টিমে একজন উত্তরপ্রদেশের ছেলেও আছেন। তিনি ভূতি সুকুল।'

খাওয়া বন্ধ করে কালী মিত্তির বললেন, 'এ রকম চুলকোনোর কোনও মানে হয়? কাগজগুনোর কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। কতাটা কানে গেলে সুকুল কী মনে করবে বলো তো?'

শৈলেনবাবু বললেন, 'কতাটা ওর কানেও গেচে মিত্তিরমশাই। মুক গোমড়া করে সে ঘুরে বেরাচ্চিল। শিবদাস ওকে বুঝিয়েচে। আরে, ওদের পরিবার দু'শো বছর আগে কলকাতায় এসেচে। তকন থেকে বসবাস করচে। ওরা অবাঙালি হয় কী করে? ওরা তো আমাদের থেকেও বেশি বাঙালি। এরকম এথনিক কোয়েশ্চেন যারা তোলে, তাদের মাতা ঠিক আচে কি না, আমার তাতে সন্দেহ।'

গণেন মল্লিক বললেন, 'ছাড়ুন না। এ সব কতা পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই।'

কালী মিত্তির বললেন, 'আমার কাচেও একটা খপর আচে। নতুন যিনি লেফট্যানেন্ট গভর্নর হয়ে এয়েচেন, তিনি না কি চান, ফেয়ার প্লে হোক।'

'কে আপনাকে খপরটা দিল মিত্তিরমশাই?'

'জয়কৃষ্ণ। আমার এক বন্ধু। লাটসাহেবের আপিসে চাকরি করে।'

'ওর কতা বিশ্বেস করবেন না। ঠিক উল্টোটা। লেফট্যানেন্ট গভর্নর ডিউক নাকি এসে বলেচেন, তাঁর আমলে ইন্ডিয়ায় এমন কিচু না হয়, যাতে রাজদরবারে মাতা হেঁট হয়ে যায়। মতিলালবাবু... আমাদের কাগজের এডিটর মতিলাল ঘোষের মুকে শুনলুম, বঙ্গভঙ্গ আইন তুলে নেওয়া হচ্চে। তবে তার পর ইংরেজরা এমন একটা কিচু করবে, যাতে না কি বাঙালির আন্দোলন দুমড়ে মুচড়ে যাবে।'

তিনজনের চা খাওয়া শেষ হতে না হতেই হাজির হলেন শিবদাস। তাঁর সঙ্গে অভিলাষ, রাজেন আর সুধীর। ঘরে ঢুকেই শিবদাস বললেন, 'হীরে কেমন আচে স্যার?'

শৈলেনবাবু লজ্জিত স্বরে বললেন, 'সকাল থেকে ওর খোঁজ নেওয়া হয়নি। চলো, সবাই একসঙ্গে যাই। গিয়ে দেখে আসি, কেমন আচে।'

সবাই মিলে এগোলেন বারমহলের দিকে। জানলা দিয়ে তাঁরা যে দৃশ্যটা দেখলেন, তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিছানায় বসে প্র্যাকটিস করছেন হীরালাল। দেয়ালের দিকে বল ছুড়ে দিচ্ছেন। আর রিবাউন্ড বল একবার ডান দিকে ডাইভ মেরে ধরছেন, আর একবার বাঁ দিকে। তাঁর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি শরীরটা স্প্রিংয়ের মতো পড়ছে এবং উঠছে।

মিনিটখানেক কেউ কথা বলতে পারলেন না। দেশবন্ধু পার্কে বসে সেদিন হীরের

কথাগুলো শিবদাসের মনে পড়ল। ও বলেছিল, 'কোনও কষ্টকেই আর কষ্ট বলে মনে করব না। মোহনবাগানের জন্য আজ থেকে সব কষ্টই সইব।' শৈলেনবাবুর দিকে তাকালেন শিবদাস। শৈলেনবাবুও তখন অপার বিস্ময়ে ঘরের দিকে তাকিয়ে আছেন। কাল রাতে কাঁধের ব্যথায় যে ছেলেটা ছটফট করছিল, সে ডাইভ মেরে বল ধরছে? এ ছেলে কোন ধাতু দিয়ে তৈরি!

হঠাৎ এ দিকে চোখ পড়তেই লজ্জায় উঠে দাঁড়ালেন হীরে। বল হাতে নীচে নেমে এসে তিনি বললেন, 'শরীলটা কষটে দেছিল। তাই ভাবলুম, এট্টু ছাড়িয়ে নি। তোরা কখন এয়েচিস?'

অভিলাষ এগিয়ে এসে বললেন, 'হীরাদা, আপনের পায়ের এট্টু ধূলা দেন।'

হীরালাল বললেন, 'এই... এই করচিস কী?'

'না হীরাদা, কাইল রাতে আমি ঘুমাইতে পারি নাই। চক্ষু বুজি, আর আপনের মুখটা খালি চোখের সামনে ভাইস্যা ওঠে। আর তহন মনে মনে কই, আপনের এই হালত যারা করসে, তাগো আমি ছাড়ুম না। আপনারে কইয়া রাখলাম, কাইল ম্যাচে অগো গোলকিপার পিগটের কপালে দুইখ্যো আসে। হালা, এমন হালত করুম...'

শুনে চোখের কোণ ভিজে উঠল শৈলেনবাবুর। না, কোন শক্তিই তাঁর এই টিমকে রুখতে পারবে না।

(সাতাশ)

যতীনকে আজ কোর্টে তোলা হবে। তাঁকে চোখের দেখা দেখার জন্য কোর্ট চত্বরে হাজির হয়েছেন রাজেন আর অভিলাষ। বেলা এগারোটা, সাড়ে এগারোটা বাজে। কলকাতার এই অঞ্চলটায় কোনও দিন আসেননি দু'জন। একটু ভয় ভয়ও করছে। এক-একটা করে পুলিশের ভ্যান এসে দাঁড়াচ্ছে। খাকি পোশাক পরা লালমুখো পুলিশ রুল চালিয়ে গেটের সামনেটা ফাঁকা করে দিচ্ছে। রুলের গুঁতো দিয়ে গাড়ি থেকে নামাচ্ছে আসামীদের। মার খাওয়া সত্ত্বেও, আসামীদের কেউ কেউ চিৎকার করে বলে উঠছেন, 'বন্দে মাতরম'। এটা বোঝাতে, তিনি স্বদেশি।

কোর্ট চত্বরে কালো কোট পরা কয়েকজন আইনজীবীকে দেখে রাজেন বললেন, 'আর এহানে থাইক্যা কাম নাই। চল অভিলাষ, মেসে ফিইর‍্যা যাই। ক্লাবের অফিসিয়ালদের মইধ্যে অনেকেই ল'ইয়ার। এহানে আমাগো দেইখ্যা ফেললে শৈলেনবাবুরে কইয়া দিব।'

সকালে ট্রামে করে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসেছেন অভিলাষ ও রাজেন। খবরের কাগজে বেরিয়েছে, আজ যতীনকে কোর্টে হাজির করা হবে। অভিলাষ দেখতে চান, পুলিশ ওকে মারধর করেছে কি না। মারধর করলে নিশ্চয়ই তার চিহ্ন থাকবে ওর শরীরে। দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দু'জনে তাকিয়ে আছেন গেটের দিকে। কোর্ট চত্বরের পরিবেশ দেখে দু'জনেই বুঝতে পারছেন, এটা আর যা-ই হোক, খেলার মাঠ না। আশপাশে সব মার্কেন্টাইল ফার্মের অফিস। গম্ভীরমুখো সাহেবরা গাড়ি থেকে নামছে, বড় বাড়িগুলোতে ঢুকে যাচ্ছে।

শহরের এই অঞ্চলটা পুরোপুরি ফিরিঙ্গিদের দখলে। দেখে মনে হয় না, দেশটা নিজের। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই লোকগুলোকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন অভিলাষ। হঠাৎ রাজেন বলল, 'ওই দ্যাখ।'

চমকে উঠে অভিলাষ দেখলেন, পুলিশের ভ্যান থেকে ধাক্কা মেরে নামানো হচ্ছে যতীনকে। কোমরে দড়ি। টাল সামলাতে না পেরে ও পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। তার পর আশপাশে তাকিয়ে বলে উঠল, 'বন্দে মাতরম'। হাত মুঠো করে ও শূন্যে তুলে ধরল। কোনওদিকে না তাকিয়ে, যতীন পা টেনে টেনে কোর্টের ভেতরে ঢুকে গেল।

অভিলাষ চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখে হাত চাপা দিলেন রাজেন। তার পর হাত ধরে টেনে বললেন, 'দেখা তো হইছে। চল, ফিইর‍্যা যাই।'

ট্রামে সারাটা রাস্তা গুম হয়ে রইলেন অভিলাষ। শ্যামবাজারে নেমে শ্যামপুকুরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রাজেনকে বললেন, 'যতীন আর কুনওদিন নর্মাল লাইফে ফিইর‍্যা আইতে পারব না, না গো রাজেনদা?'

রাজেন বললেন, 'পারব। যদি দ্যাশ থেইক্যা ফিরিঙ্গিগুলারে তাড়াইতে পারস।'

বোসবাড়িতে এসে ওঁরা দেখলেন, হীরেদা পুরোপুরি ফিট। চনমন করছেন। ওঁদের দেখে নীলু হইহই করে বলে উঠলেন, 'এই তোরা দুই বাঙাল কোতায় ছিলি রে? মেসে নোক পাটানো হল। সে ফিরে এসে বললে, কেউ নেই? ম্যাচের দিন এট্টু সিরিয়াস হতে পারিস না?'

অভিলাষ বললেন, 'তুমি সিরিয়াস হও, তাইলেই টিম জিতব।'

মুখের সামনে এসে খ্যামটা নাচের মতো শরীর ঘুরিয়ে নীলু বললেন, 'অভিলাষ, অভিলাষ...হও তুমি সিরিয়াস, মেটাও মনের আশ।'

শিবদাস ধমক দিলেন, 'কী হচ্চেটা কী? চুপ মার, এখনি কাকামশায় এসে পড়বেন। তার আগে ম্যাচ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করে নিই।'

সবাই ঘরের ভেতর ঢুকে এলেন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়লেন। তক্তপোশের পিছনের দিকে বসলেন অভিলাষ। তাঁর দিকে তাকিয়ে শিবদাস বললেন, 'একটা ভাল খবর দিই। মিডলসেক্সের উথেন আজ খেলতে পারচে না। তুই সেদিন যে দাওয়াই দিয়েচিস, সেটা কাজে নেগেচে। উথেন এখন হাসপাতালে। ওদের মিডফিল্ড অর্গানাইজ করার লোক নেই। আমরা যদি এট্টু বুদ্ধি করে খেলি, তা'লে মনে হচ্চে, ম্যাচটা জিততে পারব। গেমপ্ল্যানটা এখেনেই আলোচনা করে নিই।'

উথেন হাসপাতালে শুনে অভিলাষ খুশি হলেন। যতীনের ঝুঁকে পড়া দেহটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। শিবদাসের কথায় তিনি মন দিলেন। 'শোন, বৃষ্টি হলে আমরা এক রকম খেলব। শুকনো মাঠে অন্য রকম। বৃষ্টি হলে মাঠ শ্ল্যাসি থাকবে। তখন পায়ে বল রেখে ওদের এট্টু খেপাতে হবে। দু' তিনবার একই জায়গায় ড্রিবল করবি, কেরামতি দেকাবি, যাতে বল না পেয়ে ওরা খেপে যায়। ব্যস, যে-ই ওরা মাতা গরম করবে, কেল্লা ফতে। তখন ভুল করতে শুরু করবে। তখন হঠাৎ অ্যাটাক করে আমরা গোল দেব। বুঝতে পারচিস তো?'

আগের ম্যাচে মেজাজ গরম করে ভুলভ্রান্তি করেছিল মিডলসেক্সের প্লেয়াররা। অভিলাষ বুঝে গেলেন, শিবদাস সেই ফায়দাটাই নিতে চান। কোর্ট চত্বর থেকে মনটা ফের সরিয়ে এনে, ক্যাপ্টেনের কথা তিনি শুনতে লাগলেন। 'ফার্স্ট হাফটা কোনও রকমে সামলে দিস সুকুল। তোর ওপর আজ বাঙালির সম্মান নির্ভর করচে। সুধীরটা স্লো। ওঁর ফাঁকফোকর আজ তোকেই ভরাট করতে হবে।' বলার সময় 'বাঙালি' শব্দটার ওপর জোর দিলেন শিবদাস। তার পর বললেন, 'ফার্স্ট হাফটা যদি তোরা পাঁচ ব্যাক আর হাফ ব্যাক মিলে সামলে দিতে পারিস, তা'লে গোল করে ম্যাচ জেতানোর দায়িত্ব নিচ্চি আমরা পাঁচ ফরোয়ার্ড। সামনের দিকে আমাদের কম্বিনেশন, ডেডলি কম্বিনেশন। আমি চাই, প্রত্যেকটা গোলের পেচনে পাঁচজনের টাচ থাকুক। আমি আর বিজেদা, ইন্টারচেঞ্জ করে খেলব। পরে কানু আর হাবুলকেও বলব, জায়গা বদল করে খেলতে। অভিলাষ তুই আজ ফ্রি প্লেয়ার। টপ বক্সে ঘুরঘুর করবি। আর বল পেলেই গোল লক্ষ্য করে শট নিয়ে যাবি।'

শিবদাস আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ঘরে ঢুকে এলেন ভূপেন বসু। তাঁকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালেন। 'বোসো, বোসো সবাই।' ভূপেনবাবু বললেন, 'একটা ভাল খবর আছে। কাল আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রাজেন মুখার্জির। তোমরা তাঁর নাম শুনেছ তো? নামকরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। মার্টিন বার্ন কোম্পানির মালিক। তিনি আমায় বললেন, মোহনবাগান যদি শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, তা হলে তোমাদের সব্বাইকে উনি চাকরি দেবেন। মাইনে কত জানো? মাসে পাঁচশো টাকা।'

শুনে সবার মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পাঁ-চ-শো টা-কা? হাবুল সরকার কর্পোরেশনে চাকরি করেন। পান আশি টাকা। মনমোহন আছেন সরকারের পি ডব্লু ডি-তে। মাইনে পঁচাত্তর টাকা। শিবদাস নিজে আছেন ভেটেরেনারি কলেজে। তিনি হাতে পান একশো পাঁচ টাকা। সুধীর মিশনারি কলেজে পড়ান। তাঁর মাইনে একটু বেশি, দেড়শো টাকা। টিমে তিনজন ছাত্র, বাকি সবাই চাকুরে। একমাত্র নীলেদা কী করেন, অভিলাষ জানেন না। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন হীরালালদার দিকে। শূন্যচোখে তাকিয়ে আছেন। রাজেনবাবু চাকরিটা দিলে সব থেকে সুবিধে হবে হীরেদার। তবে তার আগে শিল্ড জিততে হবে।

ভূপেনবাবু বললেন, 'আমার একটু তাড়া আছে। শুধু এই খবরটা দিতে ঘরে ঢুকলাম। বিকেলে মাঠে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। জান লাগিয়ে খেলো। জিততেই হবে।'

.... বিকেলে খেলা শুরুর আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। মাঠ নরম কিন্তু পিছল নয়। প্রথম বলটা টাচ করেই অভিলাষ বুঝতে পারলেন, মিলিটারি টিমের কপালে দুঃখ আছে। বৃষ্টি হলে শিবেদা যে ধরনের ট্যাকটিসে খেলতে বলে দিয়েছিলেন, সবাই সেভাবেই খেলতে শুরু করলেন। বল পায়ে রেখে এক জায়গায় একজন প্লেয়ারকেই দু' তিনবার করে ড্রিবল। তার পর হাসতে হাসতে কাউকে পাস বাড়ানো। শিবেদা ঠিকই বলেছিলেন। মাথা গরম করতে লাগল স্টেইনস, বেভান, অ্যাটকক, ক্লার্করা। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওরা গালাগাল দিতে শুরু করল, 'ইউ ব্লাডি নিগার', 'ব্লাডি বাস্টার্ড', 'সান অব আ বিচ'। বেভান,

ডাও, ওয়াল আর টিনডালরা শর্ট পাস খেলে, অ্যাটাকে উঠতে শুরু করল বটে, কিন্তু গোলের কাছে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলল।

ফার্স্ট হাফে যাতে গোল না হয়, তার জন্য ডিফেন্সকে অ্যালার্ট থাকতে বলেছিলেন শিবেদা। সুকুলদা আর সুধীরদা অসাধারণ, যেন দেওয়াল তুলে রাখলেন একটা। ফার্স্ট হাফে মাঝামাঝি টপ বক্সে শিবেদার বাড়ানো বল ধরে, অভিলাষ গোলের গন্ধ পেয়ে গেলেন। রাইট ব্যাক এডেনকে তিনি কাটিয়ে নিলেন। তার পর শরীরে যত শক্তি ছিল, তা পায়ে জড়ো করে মারাত্মক শট নিলেন গোল লক্ষ্য করে। বল গিয়ে লাগল ক্রসবারে। শটে এত জোর ছিল, পূর্বদিকের ক্রসবার গেল ভেঙে। আনন্দে হইহই করে সমর্থকরা মাঠে ঢুকে পড়লেন। ডালহৌসি তাঁবু থেকে গজাল নিয়ে এসে সেই ক্রসবার যখন ফের লাগানো হচ্ছে, তখন সব প্লেয়াররা ঘিরে ধরেছেন অভিলাষকে। দৌড়ে গিয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে শিবদাস বললেন, 'ওয়েলডান।'

অভিলাষ মনে মনে বললেন, 'অহনও ওয়েলডান কওয়ার সময় আসে নাই। দ্যাহেন, আমি কী করত্যাসি।'

ফার্স্ট হাফে খেলা শেষ হওয়ার দিকে মোহনবাগান কর্নার পেল। কর্নার কিক থেকে কানুদার পাঠানো বল যখন মিডলসেক্স গোলমুখে, অভিলাষ হেড করার জন্য লাফিয়ে উঠে সোজা ঘুসি চালিয়ে দিলেন গোলকিপার পিগটের মুখ লক্ষ্য করে। 'মাই গুডনেস' বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে লুটিয়ে পড়লেন পিগট। সেদিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে সেন্টার সার্কেলে চলে এলেন অভিলাষ। তিনি প্রতিজ্ঞা করেই মাঠে নেমেছিলেন, বদলা নেবেন। বদলা নিতে পেরেছেন। পিগটকে ধরাধরি করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মিডলসেক্সের প্লেয়াররা দূর থেকে মুখ খিস্তি করছেন। সেদিকে তাকিয়ে কানু বললেন, 'পিগটের চোখের পাশে খোঁচা লেগেছে। চোখ ফুলে গেছে। মনে হয়, ও আর খেলতে পারবে না।' শুনে কেমন যেন তৃপ্তি পেলেন অভিলাষ।

কিন্তু সাহেবের বাচ্চা, সহজে হার মানবে কেন? চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে ফের খেলতে নামল পিগট। হাফ টাইমে শিবেদা বললেন, 'প্রথম পনেরোটা মিনিট কোনও রকমে কাটিয়ে দিয়ে, শেষ দশ মিনিটে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। সুকুল, সুধীর লুজ দিস না। সিংহের লেজ নাড়া দিইচি। বুঝতেই পারচিস ওরা কেমন খেপে আচে। অভিলাষ, তুই একটু নেমে খেল। তোর ওপর ওদের রাগটা বেশি। ভিড়ভাট্টায় একদম যাবি না, কেমন?'

বিরতির পর মিডলসেক্স টিমটা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গোল হয়ে যায় আর কী! কিন্তু মাঠে হাজার পঁচিশেক সমর্থক একযোগে দুয়ো দিচ্ছে পল্টনদের। সেই শব্দ আছড়ে পড়ছে মাঠের ভেতর। ওরা কম্বাইন করবে কী করে? খেলা শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে হঠাৎ গোল। তিনজনে পাস খেলে বক্সের ভেতর ঢুকে শট নিলেন শিবেদা। বল পোস্টে লেগে ফিরে আসছিল। সেই সময় বল গোলে প্লেস করে দিলেন শিবেদাই। তখনই মোহনবাগানের প্লেয়াররা বুঝে গেলেন, বাঁ চোখে ব্যান্ডেজ থাকায় পিগট সেই দিকটা ভাল দেখতে পাচ্ছেন না।

সমর্থকদের চিৎকার থামার আগে ফের গোল। এ বার হাবুলদা। দমদমার টিমটা বুঝে

গেছে ম্যাচ জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। পাগলের মতো তারা লাথি চালাতে শুরু করল। কানুদার পেটে লাথি। জমিতে ছটফট করছে। রেফারি পুলার ডাইরেক্ট ফ্রিকিক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমি থেকে উঠে দাঁড়ালেন কানুদা। শট নিতে যাচ্ছিলেন অভিলাষ। কানু বলল, 'আমায় মারতে দে। শ্লাদের গোল না দিলে আমার ব্যথা কমবে না।' নিখুঁত শটে থার্ড গোলটা করল কানু। দশ মনিটের মধ্যে তিনটে গোল। নীলু মাঠেই নাচতে শুরু করেছে ছড়া কেটে, 'দশ মিনিটে তিনটে গোল, বল সবাই হরিবোল।'

খেলার শেষ দিকে হাল ছেড়ে দিল মিডলসেক্স। ওই তিন গোলে ম্যাচ জিতেই মোহনবাগান ফাইনালে। কোনও ভারতীয় টিমের এই কৃতিত্ব নেই। ডালহৌসি মাঠ থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুর দিকে ফিরছেন অভিলাষ। ভিড়ের মাঝে তাঁর জামার খোঁট ধরে টানলেন বিহারী এক মুসলমান। চাপা স্বরে বললেন, 'কনগ্রাচুলেশনস'। লোকটা কে, চিনতে পারলেন না অভিলাষ। 'থ্যাঙ্কস' বলে সামনের দিকে তিনি পা বাড়ালেন। টিমের প্লেয়াররা খানিকটা এগিয়ে গেছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে লোকটা ফের বলল, 'আর কখনও কোর্টে যেও না। একটা খবর শুনে রাখো। পুলিশ কাস্টোডি থেকে যতীনকে আমরা আজই ছিনিয়ে এনেছি। ওর জন্য তুমি চিন্তা কোরো না।'

চমকে উঠে অভিলাষ পাশ ফিরে তাকাতেই দেখলেন, লোকটা ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। বিহারী মুসলমানের ছদ্মবেশে ইনিই যতীনের সেই হেমদা নাকি? বিপ্লবী হেমচন্দ্র সেন? তাঁর গমনপথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন অভিলাষ। খানিক পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুতে ঢুকে তিনি দেখলেন, সবাই মিলে গান ধরেছেন, 'ব্যাক ফরোয়ার্ড সমান খেলি, যমের দোসর দু'ধারে, আমাদের কে পারে'। আনন্দে তিনিও গলা মেলালেন, 'ফিল্ডে নামলে শিল্ডটি নেবো, কেয়ার কি করে কারে, আমাদের কে পারে...।'

(আঠাশ)

সন্ধ্যায় বোসবাড়িতে যেন উৎসবের মেজাজ। প্রায় শ'পাঁচেক লোকের ভিড়। সবাই ভাদুড়ি ব্রাদার্সকে দেখতে চান। রাস্তায় লোক গিজগিজ করছে। মোহনবাগান শিল্ডের ফাইনালে উঠেছে। এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে? প্লেয়ারদের কেউ জানলার সামনে এসে দাঁড়ালেই জয়ধ্বনি উঠছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁরা রংচং মাখিয়ে... খেলার কথা বলছেন অন্যদের। অনেকেই ফুটবল খেলা কী, তা জানেন না। তাঁদের চোখে আসল হিরো অভিলাষ ঘোষ। পিগট সাহেবকে ঘুসি মেরে শুইয়ে দেওয়ার জন্য।

ময়দান থেকে ফেরার পর প্লেয়ারদের আর বাড়ি ফিরতে দেননি ভূপেনবাবুর মেজ ছেলে দ্বিজেন বসু। বলেছেন, 'তোরা আজ আর কেউ বাড়ি যাস নে। মা নিজের হাতে রান্না করেছেন। ওঁর শখ হয়েচে, আজ তোদের খাওয়াবেন।' বোসবাড়ির বড় গিন্নীর ইচ্ছে মানেই আদেশ। মনমোহন ছাড়া বাকি সবাই বোসবাড়িতে রয়ে গেছেন। মনমোহনের বাবা খুব কড়া ধাতের মানুষ। চাকুরিজীবী ছেলে, তাও সন্ধেবেলার মধ্যে বাড়ি না ফিরলে,

এখনও খড়মপেটা করেন। খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনমোহন তাই ফেরি ধরে উত্তরপাড়ায় চলে যান।

ভূপেনবাবুর চেম্বারে গলা ফাটাচ্ছেন যদুপতি। হাইকোর্ট থেকে সোজা তিনি ফুটবল মাঠে গেছিলেন। মাঠে জনসমাগম দেখে তিনি বিহ্বল। এখনও ঘোর কাটেনি। থেকে থেকে তিনি বলে উঠছেন, 'আজ কী খেলাটাই না আজ খেললে শিবদাস আর বিজয়দাস। আহা, চোখ জুড়িয়ে গেল দেকে।'

এত আনন্দের মধ্যেও মন ভাল নেই ভূপেনবাবুর। একটু আগে খবর পেয়েছেন, সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মাঝে মাঝেই ইন্দ্রনাথ আসতেন সান্ধ্য বৈঠকে। দেশ বিদেশ নিয়ে আলোচনা করতেন। মৃত্যুর খবরটা শোনার পর তাঁর বাড়িতে একবার যাওয়া উচিত। কিন্তু চেম্বার ছেড়ে ভূপেনবাবু উঠতে পারছেন না। আজই প্রথম তাঁর বাড়িতে এসেছেন অতুল চ্যাটার্জি। আই সি এস পরীক্ষায় যিনি প্রথম হয়েছিলেন। কৃতবিদ্য মানুষ, বিশেষ বন্ধু। তাঁকে এই প্রথম মাঠে টেনে নিয়ে গেছিলেন ভূপেনবাবু।

যদুপতির কথায় সায় দিলেন অতুল চ্যাটার্জি, 'সত্য খেলল বটে আমাদের টিম। আমার সবচে' ভাল লেগেচে ওই কালো ছেলেটিকে। কী যেন তার নাম...।'

যদুপতি বললেন, 'অভিলাষ।'

'হ্যাঁ, অভিলাষ। মাঠে তো হোয়াইট স্পেকটেটররা ওকে ব্ল্যাক জায়েন্ট বলে ডাকছিল। তোমাদের বলি, বিলেতে থাকার সময় মিডলসেক্সের এই গোলকিপারটাকে আমি দেকেচি। তখন পোর্টসমাউথ টিমের হয়ে খেলত। খুব রিনাউনড গোলকিপার। অভিলাষ ওকে চার্জ না করলে, কিন্তু তোমরা ম্যাচটা জিততে পারতে না।'

ঘরের কোণ থেকে কে যেন বললেন, 'অভিলাষ কিন্তু এটা ভাল করেনি কো। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট বলে একটা কতা আচে। এ ভাবে জেতার কোনও মানে হয় না।'

'কে, কে বললে এ কতা?' গর্জে উঠলেন যদুপতি। 'মানে হয় না মানে? সাহেবরা লাথালাথি করলে আমরা ছেড়ে দেব কেন বাছা? টিট ফর ট্যাট। বুঝলে হে, দেয়ার ইজ নাথিং রং ইন লাভ অ্যান্ড ওয়ার। নাউ দিস ওয়ার এগেনস্ট দ্যা ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিস্ট। তুমি বেরোও তো বাছা। তোমার মতো মীরজাফরদের জন্যই আজ আমাদের এই দশা।'

তর্ক হয়তো আরও চলত, কিন্তু শৈলেনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, 'কাকামশায়ের কাছে একটা নিবেদন আচে।'

ভূপেনবাবু বললেন, 'কী হয়েছে শৈলেন?'

'কোচবেহারের মহারাজা লোক পাটিয়েচেন। কনগ্রাচুলারি লেটার দিয়ে। আর হীরেলালের জন্য তিনি পুরস্কার পাটিয়েছেন। হাজার টাকা।'

কথাগুলো বলেই চিঠিটা এগিয়ে দিলেন শৈলেনবাবু। কোচবিহারের হিজ হাইনেস মহারাজা রাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ক্লাবের পেট্রন। তাঁর চিঠি খুলে ভূপেনবাবু তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। মোহনবাগানের সাফল্যের খবর যে তাঁর কাছে পৌঁছেছে, জেনে তিনি খুব খুশি। বাইশ বছর আগে ক্লাব তৈরি করার সময় তিনি ভাবতেও পারেননি,

অভিজাত সমাজের মানুষদের তিনি পাশে পেয়ে যাবেন। ক্লাবের প্রথম পেট্রন ছিলেন মহারাজ দুর্গাচরণ ল। তিনি মারা যাওয়ার পর এলেন কোচবিহারের মহারাজা। বছর দুয়েক আগে মহিষাদলের রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর ক্লাব সম্পর্কে আগ্রহ দেখান। ফলে তাঁকে ক্লাবের ভাইস পেট্রন করে নিতে হয়েছে। কোচবিহারের মহারাজা অর্থ পাঠিয়েছেন শুনে ভূপেনবাবু বললেন, 'হীরে কোথায়? টাকাটা এখনই ওকে দিয়ে দাও। অতুলবাবু আচেন। ও-ই না হয় মহারাজার হয়ে পুরস্কারটা তুলে দিক হীরের হাতে।'

শৈলেনবাবু বললেন, 'কাকামশায়, আর একটা কতা। কোচবেহারের মহারাজা ফাইনাল ম্যাচটা দেখতে চান। মানে... সে র'ম ইচ্ছে প্রকাশ করেচেন। কিন্তু মাঠে সেদিন যা অবস্থা হবে, তাতে কি ওঁকে আসতে বলা ঠিক হবে? ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচ এক রকম, কিন্তু ফুটবল...।'

ভূপেনবাবু বললেন, 'না, না, তুমি হেজিটেট কোরো না। এ তো ভাল কথা। ছেলেরা উৎসাহ পাবে ওঁকে পেলে। তুমি রিপ্লাই দাও। হি ইজ মোস্ট ওয়েলকাম। তেমন হলে, ওঁর জন্য আলাদা সোফার ব্যবস্তা করতে হবে মাঠে। আর শোন শৈলেন, আমাকে একটু বেরুতে হবে। ডিনারের সময় প্লেয়ারদের খাওয়া দাওয়ার দিকে তুমি একটু নজর রেকো।'

কথাগুলো বলেই ভূপেনবাবু উঠে পড়লেন। সঙ্গে অতুল চ্যাটার্জি। দু'জনে একসঙ্গে যাবেন ইন্দ্রনাথকে শেষবার দেখে আসতে। বাইরে বেরতেই ভূপেনবাবু শুনতে পেলেন, উদাত্ত গলায় গান ভেসে আসছে। নীলু দেশাত্মবোধক গান ধরেছে, 'বিধির বন্ধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনই শক্তিমান, আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনই অভিমান!'

রবীন্দ্রনাথের গান। অবাক হয়ে বৈঠকখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন ভূপেনবাবু। নীলু ভাল ফুটবল খেলে, তিনি জানতেন। কিন্তু এত সুরেলা গলা ও পেল কোথায়? অতুল চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ইয়ংবেঙ্গল জেগেচে। বুঝলে অতুল, এ বার বোধহয় ইংরেজদের চলে যাওয়ার সময় এসে গেল।'

হীরেকে পুরস্কারের টাকাটা এখনই দিয়ে দেওয়া দরকার। অতুল চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে ভূপেনবাবু বৈঠকখানায় উঠে এলেন। তাঁকে দেখে ঘরের মধ্যে যারা ছিলেন, গান বন্ধ করে তাঁরা সবাই উঠে দাঁড়ালেন। স্যারের কাকামশাইকে সবাই খুব শ্রদ্ধা করেন। ঘরের মধ্যে তাই পিন ড্রপ সাইলেন্স। ভূপেনবাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রথমে প্রণাম করলেন শিবদাস। তাঁর দেখাদেখি সব প্লেয়াররাও প্রণাম করতে শুরু করলেন। পরিবেশটা হালকা করার জন্য ভূপেনবাবু বললেন, 'থাক, থাক। প্রণাম যদি করতেই হয়, দেশমাতৃকাকে করো। হ্যাঁ, যে কারণে এলাম। হীরেলাল কই? তোমার জন্য পুরস্কার আচে বাবা। খুশি হয়ে পাটিয়েচেন কোচবিহারের মহারাজা।'

শুনে প্লেয়াররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। পিছন থেকে ঠেলে হীরালালকে এগিয়ে দিলেন অভিলাষ। তাঁর হাতে হাজার টাকার বান্ডিলটা তুলে দেওয়ার সময় অতুল চ্যাটার্জি বললেন, 'আশীর্বাদ করি, জয়ী হও। ফাইনালেও যেন তোমাদের হাসিমুখে ফিরতে দেখি।'

টাকার বান্ডিলটা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হীরালাল। ইতস্তত করে

বান্ডিলটা তিনি তুলে দিলেন শিবদাসের দিকে। সেটা লক্ষ করে ভূপেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, তুমি কি খুশি নও হীরালাল? টাকাটা শিবদাসের হাতে তুলে দিলে কেন?'

বড় মাপের মানুষের সামনে কোনওদিন মুখ তুলে কথা বলার সাহস পাননি হীরালাল। তিনি বরাবর মুখচোরা টাইপের। কিন্তু আজ বলে ফেললেন, 'পুরস্কারটা আমার একা নেওয়া... ভাল দেখাচ্চে না স্যার। আমি সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চাই।'

শুনে চমকে উঠলেন ভূপেনবাবু। হীরালালকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেচ। ইট'স টিম। ওহ হীরালাল, ইউ আর গ্রেট। আজ থেকে আমার ক্লাবে নতুন নিয়ম চালু হল। তোমরা যে যা পুরস্কার পাবে, সবাই মিলে তা ভাগাভাগি করে নেবে।'

সঙ্গে সঙ্গে নীলু চিৎকার করে উঠলেন, 'থ্রি চিয়ার্স ফর মোহনবাগান... হিপ হিপ...।'

'হুররে' আওয়াজটা আছড়ে পড়ল চার দেওয়ালের বাইরেও। প্লেয়াররা হীরালালকে কাঁধে তুলে নিয়েছে দেখে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ভূপেনবাবু। এই টিম স্পিরিট দেখতেই তো তিনি চাইছেন। না, না, শুধু মোহনবাগানে নয়। স্বদেশি আন্দোলনে যাঁরা জড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যেও।

.... বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরনোর মুখে ফের চমক! ভূপেনবাবু দেখলেন, উঠোন দিয়ে খুব পরিচিত একজন হেঁটে আসছেন। পরনে গিলে করা পাঞ্জাবি আর ধুতি। হাতে সুদৃশ্য ছড়ি। গেটের সামনে গ্যাস বাতি জ্বালানো রয়েছে। স্বল্পালোকেও মানুষটাকে চিনতে ভুল করলেন না ভূপেনবাবু। জগদীশ মিত্তির। ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কীর্তি মিত্তিরের ছেলে। প্রায় কুড়ি-একুশ বছর পর দেখা। তাঁকে আপ্যায়ন জানানোর জন্য ভূপেনবাবু নিজেই কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। জগদীশ তাঁর সমবয়সি, বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আসা মেয়েটি কে? পরনে সবুজ রংয়ের শাড়ি, মেরুন রংয়ের ঘটিহাতা ব্লাউজ। এ তো মোহনবাগানের কালার। মেয়েটার এক হাতে সবুজ-মেরুন পতাকাও রয়েছে।

রামনবমীর দিন উত্তর কলকাতায় মিছিল বেরয়। তাতে শিব-দুর্গা, রাম-সীতা-হনুমান সাজে অনেকে। লোকে সত্যিকারের দেবদেবী ভেবে তাদের প্রণাম করে। এই মেয়েটাকে তো সাক্ষাৎ জগদম্বা বলে মনে হচ্ছে। তাই কি? না, মোহনবাগানের ভাগ্যদেবী! জগদীশের কথা ভুলে ভূপেনবাবু তাকেই জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'তুমি কে মা?'

'আমার মেয়ে মোহিনী।' উত্তরটা দিলেন জগদীশ। 'তোমার মনে আচে, মোহনবাগান ক্লাব যেদিন আমরা তৈরি করলাম, সে দিন আমার মেয়ে হয়েচিল? এ-ই সেই মেয়ে। বাবা মোহনবাগানের সঙ্গে মিলিয়ে এর নাম রেকেচিলেন মোহিনী। কিন্তু তোমাদের ওপর রাগ করে আমি নামটা পাল্টে দিয়েচিলুম। স্কুলে নাম দিয়েচিলুম লাবণ্যপ্রভা।'

লাবণ্যপ্রভার দিকে তাকিয়ে ভূপেনবাবু বললেন, 'এসো মা। তুমি ঠিক দিনেই এয়েচ। পতাকা হাতে..., মোহনবাগানের লেডি লাক-এর মতো। তোমাকে আমি ইনভাইট করচি মা, এই সাজেই তুমি ফাইনালের দিন গড়ের মাঠে যেও। আমার পাশে বসে তুমি খেলা দেকবে।'

লাবণ্যপ্রভা বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ কাকাবাবু, নিশ্চয় যাব। কিন্তু আপনি আমায় চিনতে পারচেন না কেন, তা বুঝতে পারচি না। আমায় আগে দেকেচেন। কুমুদিদির সঙ্গে আমি

কয়েকদিন আপনার কাচে এয়েচি। স্বদেশি মেলায় মেয়ে ভলানটিয়ার্স টিম করার আবেদন নিয়ে।'

'তা হবে।' কথাটা বলেই পাশ ফিরে ভূপেনবাবু বললেন, 'জগদীশ, তুমিও কিন্তু ফাইনালের দিন এসো। প্লেয়াররা তা'লে এনকারেজড হবে।'

সরাসরি উত্তর না দিয়ে জগদীশ প্রশ্ন করলেন, 'শিবদাস কি একনও আছে? ওকে আমি কনগ্রাচুলেশনস জানাতে এলুম। সেই সঙ্গে একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করতেও। তুমি তো জান ভূপেন, মোহনবাগান ক্লাব নিয়ে আমার বাবা কী'রম অবসেসড চিলেন। তোমরা তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখলে কী হবে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বাবা ক্লাবের খোঁজ খবর রাকতেন। দানী মিত্তিরেরা আমাদের বাড়ি গিয়ে, তোমাদের সম্পর্কে যা খপর দিত, বাবা তা-ই বিশ্বেস করে নিতেন। বুঝতেই পারচ, ওরা গিয়ে তোমাদের নামে কেবল বিষই ঢালতেন।'

এ পর্যন্ত শুনে ভূপেনবাবু বললেন, 'থাক না জগদীশ, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ?'

'না, শোন। এ সব তোমাদের শোনা দরকার। ক্লাব নিয়ে বাবা খুব স্বপ্ন দেকতেন। ফুটবল সিজনে প্রায়ই বলতেন, দেকিস, মোহনবাগান ক্লাব ঠিক একদিন আইএফএ লিগ আর শিল্ডে খেলবে। শুধু খেলবে না, একদিন চ্যাম্পিয়নও হবে। হয়তো সেদিন আমি বেঁচে থাকব না। তবুও ক্লাবের লোকেরা যাতে আমার কতা মনে রাখে, তার একটা ব্যবস্তা করে যাব। বাবা একটা সোনার মেডেল রেখে গেচেন। ওঁর ইচ্ছে চিল, যদি কোনওদিন মোহনবাগান ক্লাব শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়, তা'লে ওই সোনার মেডেলটা সেই টিমের ক্যাপ্টেনকে উনি দেবেন। আমি সেই মেডেলটা তোমার হাতে দিতে এয়েচি। এই টিমটা যদি এ বার শিল্ড জেতে, তা হলে বাবার নাম করে... মেডেলটা শিবদাসের গলায় পরিয়ে দিয়ো।' কথাটা বলতে বলতেই পকেট থেকে সোনার মেডেলটা বের করলেন জগদীশ। শূন্যে তুলে ধরলেন। গ্যাসের আলোয় মেডেলটা ঝকমক করে উঠল।

(উনত্রিশ)

অঘোরসুন্দরীর মন আজ খুব প্রসন্ন। এই প্রথম ছেলেদের সঙ্গে কালীঘাটের মা কালীকে দর্শন করতে যাচ্ছেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে ফরিদপুরের কোকন'দা থেকে প্রথম যেদিন এই শহরে পা দিয়েছিলেন, সেই দিনটার সঙ্গে আজকের কতই না তফাৎ। সেদিন সঙ্গে ছিল নাবালক দুই পুত্র রামদাস আর দ্বিজদাস। আর আজ সঙ্গে রয়েছে দুই কীর্তিমান পুত্র বিজয়দাস আর শিবদাস। পুত্রগর্বে বুক ভরে ওঠে অঘোরসুন্দরীর। ইদানীং গঙ্গায় যখন নাইতে যান, তখন দেখেন, সবাই তাঁকে খাতির করছেন। একজন সেদিন বলেও ফেললেন, 'মা, আপনি রত্নগর্ভা। এমন চার ছেলেকে পেটে ধরেচেন, যাঁরা সবাই কীর্তিমান।'

আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকেও এ ধরনের কথা শুনতে পাচ্ছেন অঘোরসুন্দরী। এই দু'দিন আগে বাড়িতে এসেছিলেন মন্মথ গাঙ্গুলি মশাই। মেজবউমার বাপেরবাড়ির তরফের আত্মীয়। মন্মথবাবু ভূয়সী প্রশংসা করে গেলেন শিবে আর বিজের। ফিটনে করে যেতে

যেতে অঘোরসুন্দরী একবার তাকালেন দুই ছেলের দিকে। দু'জনে বল খেলা নিয়ে কী যেন আলোচনা করছে। সর্বক্ষণ খেলা আর খেলা। মায়ের মন্দিরে আসার সময়ও খেলার কথা! এদের মাথায় অন্য কিছু নেই। বিজেটা বরাবরই ফচকে। কিন্তু শিবে ছোটবেলা থেকে অন্যরকম। তাকে একটু সমীহই করে চলেন অঘোরসুন্দরী। শিবে কম কথা বলে। একেবারে বাপের মতো হয়েছে। যা বলে, ভেবে চিন্তে বলে। যা করে, সব ভেবে চিন্তে। আজ ওদের বাবা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হত।

স্বামীর কথা মনে হওয়ায় চোখের কোণ ভিজে উঠল অঘোরসুন্দরীর। প্রথম যেদিন স্বামীর খোঁজে এই শহরে পা দিয়েছিলেন, সেই দিনটার কথা তিনি ভোলেননি। ফরিদপুরের কোকন'দ থেকে এসে, শেয়ালদহ স্টেশনে নেমেই তিনি হকচকিয়ে গেছিলেন। কলকাতা এত বড় শহর নাকি? শিব-র বাবা তখন কলকাতায় চাকরি করতেন। অনেকদিন তাঁর খোঁজখবর পাননি বলে, অঘোরসুন্দরী নিজেই চলে আসেন এখানে। এত বড় শহর, কোথায় পাবেন তাঁর স্বামী বিপ্রদাসকে? ঘুরতে ঘুরতে যখন তিনি শ্যামপুকুরে আসেন, সূর্য তখন মাঝ আকাশে। খিদের জ্বালায় কাঁদতে শুরু করেছেন হরিদাস আর দ্বিজদাস। একটা গাড়ি বারান্দাওয়ালা বাড়ির সামনে বসে নিজের অদৃষ্টকে দোষ দিচ্ছেন তখন অঘোরসুন্দরী। কী করবেন, কোথায় যাবেন,... বুঝে উঠতে পারছেন না।

এই সময় শুনলেন, কে যেন বলছেন, 'বাচ্চা দুটো ভর দুকুরে কানচে কেন বাছা?'

পিছনে তাকিয়ে অঘোরসুন্দরী দেখেন, থান পরা এক বৃদ্ধা। বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন। দ্বিজদাসের গলায় পইতে দেখে বৃদ্ধা বললেন, 'এ কী কাণ্ড বাচা? বামুনের মেয়ে তুমি, অভুক্ত বাচ্চা নিয়ে একেনে বসে আচো? গেরস্তের অকল্যাণ হবে যে গো। এসো মা, ভেতরে এসো।'

অপ্রত্যাশিতভাবে সেদিন ওই বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে গেছিলেন অঘোরসুন্দরী। বাড়ির কর্তারা আশ্বাস দিয়েছিলেন, বিপ্রদাসকে খুঁজে বের করে দেবেন। তাঁরা কথাও রেখেছিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বামীর দেখা পেয়েছিলেন অঘোরসুন্দরী। তার পর শ্যামপুকুর অঞ্চল থেকে অঘোরসুন্দরী আর নড়েননি। পরে শ্যামবাজারের কাছে একটা বাড়ি বিপ্রদাস কিনে ফেলেন খুব অল্প দামে। কিনে অবশ্য ভালই করেছেন। পরিবারকে অকূল পাথারে ফেলে যাননি।

কথাগুলো ভাবতেই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অঘোরসুন্দরী। সেই শব্দে চমকে তাকালেন দুই ছেলে। বিজের মুখে মুচকি হাসি। মনটা ভাল আছে বলে, রেগে উঠলেন না অঘোরসুন্দরী। বললেন, 'তুই হাসচিস কেন রে বিজে?'

বিজে বললেন, 'তোমায় দেকে। তুমি কী ভাবচ, বলব?'

'বল দিকি। দেকি, মায়ের মন তুই ক্যামন পড়তে পারিস।'

'রাগ করবে না বলো।'

'না করব না। তুই বল।'

'তুমি ভাবচ, মায়ের কাচে গিয়ে কী চাওয়া যায়, তাই না? সিন্ধুক ভর্তি গয়না, না কি আলমারি ভর্তি ট্যাকা।'

'দূর পোড়ারমুকো। ট্যাকা পয়সা নিয়ে কী হবে? আমি তোদের বাবার কতা ভাবচিলুম। আগেরবার তো ওঁর সঙ্গেই এয়েচিলুম কি না। তাই মনে খুব পড়চে।'

বলেই অঘোরসুন্দরী চুপ করে গেলেন। বাড়িতে পাঁচ ছেলে, পাঁচ বউমা, নাতি-নাতনি নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। মায়ের আশীর্বাদ আছেই। না থাকলে কারও এত সুন্দর সংসার হয়? ছেলে-বউমারা সবাই তাঁর কথায় উঠে বসে। একমাত্র কনিষ্ঠ বউমা কৃষ্ণভামিনীকে নিয়ে মাঝে মধ্যে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর সন্তানাদি কিছু হয়নি। মায়ের কাছে আজ অঘোরসুন্দরী প্রার্থনা করে যাবেন, ছোট বউমার কোল আলো করে যেন একটা বাচ্চা আসে। হরিদাসের বড় মেয়ে সুলক্ষণার যেন খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে যায়। বিজের আফিমের ব্যবসা যেন ফুলে ফেঁপে ওঠে। শিবে-কে যেন আপিস থেকে আসামে পাটিয়ে না দেয়। বল খেলতে গিয়ে দুই ছেলে যেন হাত-পা ভেঙে না বসে। আর কী কী মায়ের কাছে প্রার্থনা করবেন, অঘোরসুন্দরী ভাবতে লাগলেন।

...কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে যখন অঘোরসুন্দরী পৌঁছলেন, তখন বেলা আটটা। ফিটন থেকে নামতেই শিবেকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল এক পাণ্ডা। বলল, 'আপনার মা জননী আসবেন শুনেচিলুম। তিনি কি এয়েচেন?'

শিবে বললেন, 'হ্যাঁ এয়েচেন। আপনাদের হালদারমশাই কই?'

পাণ্ডা বলল, 'তিনি মন্দিরে। আপনাদের পুজোর জোগাড় করচেন। মা জননীকে উনি অন্দরমহলে নিয়ে যেতে বলেচেন।'

ফিটনের দরজা খুলে নেমে এলেন অঘোরসুন্দরী। কথাবার্তা সবই তাঁর কানে গেছে। তিনি জানেন, কালীঘাটের মায়ের সেবাইত হালদারমশাইরা। মায়ের সাক্ষাৎ ভক্ত। তাঁদের অন্দরমহলে যাওয়া কী কম ভাগ্যের? শুনে মনে মনে তিনি পুলকিত। এর আগে মাত্র একবারই এই মন্দিরে পুজো দিতে এসেছেন অঘোরসুন্দরী। স্বামীর সঙ্গে। সে বার কম হ্যাপা পোহাতে হয়নি। কালীঘাটে আসতে হলে তখন সাহেবপাড়া পেরতে হত। তেমন যানবাহনও ছিল না। উত্তর কলকাতার বাসিন্দারা ভয়ে কালীঘাটে আসতেন না। বেশিরভাগই যেতেন হয় ঠনঠনের কালীবাড়িতে, নয়তো দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। এখন অবিশ্যি ট্রাম হয়েছে। শ্যামবাজার থেকে ট্রাম করে করেই মায়ের মন্দিরে আসা যায়।

অঘোরসুন্দরী রাস্তায় পা দিতেই শিবে বললো, 'মা, তুমি পাণ্ডার সঙ্গে যাও। আদিগঙ্গায় চান করে তাপ্পর মন্দিরে এসো। কেলাবের লোকজন এসে গ্যাচে। আমরা তাদের সঙ্গে দেকা করতে যাচ্চি।'

পাণ্ডা হাতজোড় করে বলল, 'আসুন মা। আমার সঙ্গে আসুন।'

হালদারদের বসতবাটি মায়ের মন্দিরের গায়েই। এক পাশে পাণ্ডাদের দোকান। পুজোর ডালি সাজানো রয়েছে দোকানে। লোকে ভিড় করে ডালা কিনছে। পাশ দিয়ে যেতে অঘোরসুন্দরীর মনে পড়ল, স্বামীর সঙ্গে যে বার মায়ের মন্দিরে এসেছিলেন, পাণ্ডার সঙ্গে সে বার কথা কাটাকাটি হয়েছিল টাকা পয়সা নিয়ে। আজ সেই পাণ্ডারাই আদর করে নিয়ে যাচ্ছে সেবাইতদের অন্দরমহলে। এই দিনটার কথা কখনও চিন্তা করেছিলেন তিনি? কক্ষনও না। সে বার ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে দু'ঘণ্টা লাইন দিয়ে পুজো দিয়েছিলেন।

গরমে মাথা ঘুরে গেছিল।

হালদারদের অন্দরমহলে গিয়ে এ বার অন্য কারণে অঘোরসুন্দরীর মাথা ঘুরে গেল। বউ-ঝিদের গায়ের রং যেন দুধে আলতা মেশানো। কী সুন্দর সব দেখতে। কী বিনয়ী। তাঁদের আপ্যায়নে মুগ্ধ হয়ে গেলেন অঘোরসুন্দরী। ওদের বাড়িরই কাজের লোকেরা কাপড়ের পর্দার মধ্যে দিয়ে তাঁকে নিয়ে গেলেন আদিগঙ্গায়। চান করে আসার পর একজন নতুন গরদের শাড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'মা, এটা পরে নিন। মন্দিরে মায়ের পাওয়া শাড়ি। এটা পরে যা মনস্কামনা করবেন, মা তা পূর্ণ করবেন।' আধঘণ্টা পর বাড়ির বউ ঝি-দের সঙ্গেই মন্দির প্রাঙ্গণে হাজির হলেন অঘোরসুন্দরী। পরনে গরদের সেই শাড়ি। বাড়ি ফিরে এ সব কথা বললে বউমারা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। মনে মনে দুই ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন তিনি। এমন একটা দিন যে তাঁর জীবনে আসতে পারে, কখনও ভাবেননি। মায়ের মন্দিরের গায়েই নাটমন্দির। সেখানে ছাগবলি চলছে। ক্ষণেক্ষণে হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে... মা মা বলে। চাতালটা রক্তে লাল হয়ে আছে। হালদার বউদের একজন বলল, 'আজ একশো পাঁঠা বলি হওয়ার কথা মা। মায়ের প্রসাদ নিয়ে, তবে আপনি বাড়ি যাবেন।'

মন্দিরের সিঁড়ির কাছে এসে অঘোরসুন্দরী দেখলেন, গর্ভগৃহের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শিবে। ওপর থেকেই তিনি বললেন, 'মা, তাড়াতাড়ি এসো। হালদারমশাই অপেক্ষা করছেন।'

শিবে-র সঙ্গে মন্দিরের গর্ভগৃহে নেমে, চোখের সামনে মায়ের মূর্ত দেখে সারা শরীর কেঁপে উঠল অঘোরসুন্দরীর। আগেরবার নাটমন্দির থেকে মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন। এতদিন কালীঘাটের পটে মায়ের ছবি দেখে এসেছেন। এখন চোখের সামনে মায়ের টানাটানা চোখ, বিরাট জিভ। দেখার পর থেকেই অঘোরসুন্দরীর শরীরের কাঁপুনি আর থামে না। তাঁর মনে পড়ল, এই সেই তীর্থক্ষেত্র, যেখানে সতীর ডান পায়ের চারটে আঙুল এসে পড়েছিল। ইচ্ছে করলে, তিনি মায়ের বিগ্রহ স্পর্শ করতে পারেন। ইস, ছোট বউমা সঙ্গে আসার জন্য বায়না ধরেছিল। তাকে নিয়ে এলে ভাল হত। বাড়ি ফিরে গর্ভগৃহে ঢোকার কথা বললে, বউমাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

হালদারমশাই উচ্চস্বরে মন্ত্র পড়ছেন। গর্ভগৃহ গমগম করছে। কপালে তেল সিঁদুরের টিকে দিয়ে হালদারমশাই বললেন, 'মা এ বার আপনাদের গোত্রটা বলুন।'

গোত্র কী, তা ভুলে গেলেন অঘোরসুন্দরী। কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে তাঁর। ডান পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন শিবে। পড়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁর কনুইটা ধরে ফেললেন অঘোরসুন্দরী। শিবে ততক্ষণে গোত্রটা বলে দিয়েছেন। হালদারমশাই মন্ত্র পড়েই যাচ্ছেন। তার পর হঠাৎ তিনি বললেন, 'এ বার নিচু হয়ে মাকে স্পর্শ করুন। তাপ্পর আপনার যা মনস্কামনা, নিবেদন করুন।'

নিচু হয়ে লোহার গ্রিলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে মায়ের বিগ্রহ স্পর্শ করলেন অঘোরসুন্দরী। কিন্তু কী চাইবেন, গুলিয়ে ফেললেন তিনি। সুযোগটা পেলেন মাত্র কয়েক সেকেন্ড। পুজো দেওয়ার জন্য পিছন থেকে লোক নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। তখনই শিবে তাড়া দিলেন,

'পুজো দেওয়া হয়ে গেচে মা। চলো, আমরা বেরিয়ে যাই।'

গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন অঘোরসুন্দরী। তখনও তাঁর ঘোর কাটেনি। আধ ঘণ্টা পর মায়ের প্রসাদ নিয়ে ফের যখন তিনি ফিটন গাড়িতে উঠে বসলেন, তখন জোড়া হাত কপালে ঠেকিয়ে মনে মনে বললেন, 'আমার মনস্কামনা পূরণ কোরো মা। জোড়া পাঁটা বলি দিয়ে সেদিন তোমার পুজো করে যাব।'

গাড়িতে উঠে বসেছেন শিবে আর বিজে। মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে আসার আগে বিজে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'শিবে, ওই দ্যাক। দানী মিত্তির। আমাদের পানেই আসচে। কতা বলিস না।'

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন বিজে। শিবে বললেন, 'আমার সঙ্গে দেকা হয়েচিল দাদা। কী বলল, জানো? ফাইনাল ম্যাচটা জিতিস শিবে। দ্যাক, তোদের জন্য পুজো দিতে এয়েচি।'

'তুই কী বললি?'

'আমি কোনও কতা কইনি। দু'দিন আগে যারা আমাদের নামে ছড়া কেটেচিল, তারা আজ আমাদের ভালর জন্য পুজো দিচ্চে। বিশ্বেস হয় না।'

'ঠিক কয়েচিস ভাই। দু'মুকো সাপ।'

শিবে-বিজে চুপ করে গেলেন। অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে আসার পর বিজে হঠাৎ বললেন, 'মায়ের মন্দির থেকে বেরুনোর সময় তুমি বিড়বিড় করে কী বলচিলে মা?'

বিজে ফের ফচকেমি করছেন। অঘোরসুন্দরী বললেন, 'তোকে বলব কেন রে হতভাগা?'

বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। ফচকেমি করুন অথবা অন্য কিছু, তাঁর দুই ছেলে যে ভাদুড়ি বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মায়ের মন্দিরে এসে আজ অঘোরসুন্দরী বুঝে গেছেন। মায়ের কাছ থেকে আজ তিনি পরিবারের জন্য কিছুই চাননি। মায়ের বিগ্রহ স্পর্শ করার পর বিড়বিড় করে শুধু বলেছেন, 'বল খেলায় আমার ছেলেরা যাতে জেতে, তুমি দেখো মা। তুমি দেখো।'

(তিরিশ)

ধর্মতলায় আইএফএ আফিসে গভর্নিং কাউন্সিলের মিটিং বসেছে। চোদ্দোজন সদস্যের সবাই হাজির। সাধারণত, এমনটা হয় না। কিন্তু শিল্ড ফাইনাল বলে কথা। যার মর্যাদা ইংল্যান্ডের এফ এ কাপের মতো। প্রতিবার দুটো ব্রিটিশ দল ফাইনাল খেলে। তাই কোনও সমস্যা হয় না। এ বারের পরিস্থিতি অন্য রকম। একটা নেটিভ দল ফাইনালে উঠে গেছে। দলটার পেছনে প্রবল জনসমর্থন আছে। ম্যাচে সামান্য এদিক-ওদিক হলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। কাউন্সিলের সদস্যরা শুনেছেন, প্রচুর লোক আসবেন ক্যালকাটা মাঠে খেলা দেখতে।

কাউন্সিলের একমাত্র ভারতীয় সদস্য কালীচরণ মিত্র এখনও মিটিংয়ে উপস্থিত হননি। তাঁর জন্য অপেক্ষা না করেই মিটিং শুরু করে দিলেন ম্যাকগ্রেগর। ম্যাচের ব্যবস্থাপনার

দায়িত্বে রয়েছে কলকাতা পুলিশ। তারা কী ব্যবস্থা করেছে, ম্যাকগ্রেগর প্রথমেই তা জানতে চাইলেন পুলিশের প্রতিনিধির কাছে। ক্যালকাটা মাঠের পশ্চিম দিকে অস্থায়ী গ্যালারি আছে। তা ক্লাব সদস্যদের জন্য। বহু মহিলাও খেলা দেখতে আসেন। ওই দিকটা সাধারণ দর্শকদের জন্য নয়। উল্টো দিকে, অর্থাৎ মাঠের পূর্বদিকে গ্যালারি করে দেবে স্মিথ অ্যান্ড কোম্পানি। তারাই টিকিট বিক্রি করার দায়িত্বে। ফাইনাল ম্যাচের উত্তেজনার ফায়দা নিতে তারা টিকিটের দাম ধার্য করেছে তিন টাকা।

পুলিশের প্রতিনিধি সার্জেন্ট নেভিল বললেন, 'আমাদের কাছে খবর আছে, কলকাতার বাইরে থেকেও প্রচুর দর্শক আসছেন। রেলওয়েজ কর্তৃপক্ষ কয়েকটা জায়গায় স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। বাড়তি ফেরি সার্ভিসের কথা চলছে। আমরা টেলিফোন কর্তৃপক্ষকে বলেছি, মাঠে কয়েকটা কানেকশনের ব্যবস্থা করতে। এটা করতে হচ্ছে, নিরাপত্তার কারণে। যাতে আমাদের লোকেরা দুর্ঘটনার খবর দ্রুত পেতে পারে। আমাদের ইন্টেলিজেন্স বলছে, প্রায় হাজার পঞ্চাশ মানুষ খেলা দেখতে আসবেন। তাঁদের মধ্যে উগ্রপন্থীরাও থাকতে পারেন।'

শেষে এই কথাগুলো শুনে কাউন্সিলের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। সেটা লক্ষ করে সার্জেন্ট বললেন, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আপনারা ভয় পাবেন না। আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছি। নেটিভ দলের দর্শকদের জন্য আমরা খোলা রাখছি মাঠের উত্তর ও দক্ষিণ দিক। অর্থাৎ কেল্লার দিক এবং ইডেন গার্ডেন্সের দিক। তাতে দর্শকদের নিয়ন্ত্রণের সুবিধা হবে।' কথাগুলো বলেই সার্জেন্ট নেভিল বসে পড়লেন।

এর পর ডালহৌসি ক্লাবের উইলিয়াম বার্চ বলে উঠলেন, 'ফাইনাল ম্যাচের টিকিটের দাম খুব বেশি হয়ে গেছে ম্যাক। আমার মনে হয়, দাম কমানো উচিত।'

সঙ্গে সঙ্গে আরও দু' তিনজন বলে উঠলেন, 'আমাদেরও তাই মনে হয়। ইট'স টু মাচ।'

শুনে ম্যাকগ্রেগর খুশি হলেন। টিকিটের দাম তিন টাকা হোক, তা তিনি চাননি। তাই বার্চের সঙ্গে আগে থেকে কথা বলে রেখেছিলেন। যাতে মিটিংয়ে টিকিটের দাম নিয়ে তিনি চেঁচামেচি করেন। বার্চ তাঁর মতো আইনজীবী। রোজ দু'বেলা ওঁরা কোর্টে ওঠাবসা করেন। আইএফএ-র অনেক সিদ্ধান্তই কোর্টের অলিন্দে নেওয়া হয়ে যায়।

ম্যাকগ্রেগর তাই বললেন, 'টিকিটের দাম কত হলে, আপনারা খুশি হন।'

'দু'টাকা। তার বেশি এক কড়িও নয়।'

'ঠিক আছে। স্মিথ কোম্পানিকে আমি বলে দিচ্ছি।'

পরের অ্যাজেনডা রেফারি। ফাইনাল ম্যাচে রেফারি কে হবেন, তা নিয়ে আজই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ম্যাকগ্রেগর বললেন, 'ফাইনাল ম্যাচটা খেলানোর দায়িত্ব কার ওপর দেওয়া যায়, মূলত সে ব্যাপারেই আপনাদের মতামত জানতে এই মিটিং ডাকা হয়েছে। আপনারাই ঠিক করে দিন, ফাইনাল ম্যাচটা কে খেলাবেন?'

সভায় হাত তুললেন স্কর্ন হিল। স্মল ক'জ কোর্টের জজ। বললেন, 'মোহনবাগানের সেমিফাইনাল ম্যাচ আমি দেখেছি। ওই ম্যাচটা খেলিয়েছিলেন মিঃ পুলার। খুব যোগ্যতার

সঙ্গে খেলিয়েছেন। আমার মতে, তাঁকেই ফাইনাল ম্যাচ পরিচালনার ভার দেওয়া উচিত।'

বার্চ কটাক্ষ করলেন, 'রেফারি'জ অ্যাসোসিয়েশনে কি রেফারি কম পড়েছে? একই ব্যক্তি কেন পর পর দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলাবেন?'

হিল বললেন, 'দক্ষতা থাকলে, খেলাতেই পারেন। আইনে কোথাও বাধা নেই।'

বার্চ বললেন, 'আমার মতে, ম্যাকিন্টশ যোগ্য রেফারি। তাঁকেই ফাইনাল ম্যাচটা দেওয়া হোক।'

'আমার অবজেকশন আছে।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন কালী মিত্তির। সবাই ঘুরে তাকালেন তাঁর দিকে। ম্যাকগ্রেগর প্রমাদ গুনলেন। কালী মিত্তির ঢোকার আগেই রেফারি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটা তিনি নিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হল না।

কালী মিত্তির বললেন, 'সেমিফাইনালে মোহনবাগানের একটা ম্যাচ ম্যাকিন্টশ খেলিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইম্পার্সিয়াল ছিলেন না।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় উঠল, 'ইম্পার্সিয়াল কথাটা উইথড্র করুন মিঃ মিটার। একজন অভিজ্ঞ রেফারি সম্পর্কে আপনি এ রকম একটা অবজেকশনেবল ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন না।'

কালী মিত্তির বললেন, 'আমি যা বলেছি, ঠিক বলেছি।'

জাস্টিস হিল তাঁকে সমর্থন করলেন, 'সেদিন আমি মাঠে হাজির ছিলাম। আমিও মিঃ মিটারের সঙ্গে একমত, মিঃ ম্যাকিন্টশের একাধিক সিদ্ধান্ত পক্ষপাতপূর্ণ বলে আমারও মনে হয়েছে।'

সমর্থন পেয়ে কালী মিত্তির উৎসাহিত, 'আমার মনে হয়, এমন কাউকে রেফারিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হোক, যার সম্পর্কে মোহনবাগান কোনও আপত্তি তুলবে না।'

বার্চ বললেন, 'মাননীয় সদস্যরা, আপনারা কি মিঃ মিটারের এই পরামর্শটা সমর্থন করেন? তা হলে তো আমাদের কোনও ম্যাচের আগে, আমাদেরও জিজ্ঞেস করে নিতে হবে, রেফারি সম্পর্কে আমাদের কোনও আপত্তি আছে কি না?'

মিটিংয়ে তর্কাতর্কি চলতে থাকল। ইচ্ছে করে, সেটা খানিকক্ষণ চলতে দিলেন ম্যাকগ্রেগর। কোনদিকে পাল্লা ভারি, তা হলে বোঝা যাবে। ভাল করেই তিনি জানেন, কলকাতার ইউরোপীয় সমাজ আসলে কী চায়। খুব অল্পসংখ্যক মানুষই আছেন, যাঁরা মোহনবাগানের ফাইনালে ওঠাকে সাদা চোখে নিয়েছেন। খেলাটা তাঁদের কাছে নিছক খেলা। এগারো জন বনাম এগারো জনের। কিন্তু বাকিরা অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছেন। সাদা চামড়া আর নীল রক্তের জাত্যাভিমান! তিনি নিজেও মনে মনে মেনে নিতে পারছেন না, একটা নেটিভ দলের সাফল্যকে।

সকলের গলা ছাপিয়ে কালী মিত্তির হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আপনাদের কাছে আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছি মহোদয়গণ। মোহনবাগান কাল শিল্ড জিতছে। আপনারা যাকে ইচ্ছে রেফারি করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, তাঁর সামান্য ত্রুটি মাঠে কিন্তু বিপর্যয় ডেকে আনবে। আপনাদের কোনও পুলিশই স্থানীয় মানুষের আবেগকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। আপনাদের শরীরে যদি সত্যিই খাঁটি নীল রক্ত বয়ে থাকে, তা হলে মোহনবাগান

যাকে রেফারি হিসাবে চাইছে না, তাঁর ওপরই দায়িত্বটা দেবেন না।'

মিটিংয়ে শ্মশানের নীরবতা নেমে এল। সবাই এ-ওর দিকে তাকাচ্ছেন। শুধু মিটিমিটি হাসছেন স্কর্ন হিল। তিনি বললেন, 'চ্যালেঞ্জটা আমাদের অ্যাকসেপ্ট করা উচিত। মোহনবাগান কাকে রেফারি চাইছে মিঃ মিটার?'

কালী মিত্তির বললেন, 'একজন সাদা চামড়ার রেফারিই চাইচে। মিঃ পুলার।'

কথাটা বলার ভঙ্গিতে কটাক্ষ লক্ষ করে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ম্যাকগ্রেগরের। ব্যাপারটা কী? সেদিন প্রায় হুমকির সুরে একই কথা শুনিয়েছিলেন সুবেদার মেজর শৈলেন বসু। এঁরা কী করে ধরে নিলেন, ইস্ট ইয়র্কের মতো একটা রেজিমেন্ট দলকে হারিয়ে শিল্ড জিতবেন? ভারতীয়রা অবশ্য নানা ধরনের ম্যাজিক জানে। মোহনবাগান কি জাদুর আশ্রয় নিয়েছে? তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, পুলারকে রেফারি করা যাবে না। কিন্তু তার আগে সার্জেন্ট নেভিল বলে উঠলেন, 'আমার মনে হয়, মিঃ পুলারকেই দায়িত্বটা দেওয়া হোক। ম্যাচটা সুষ্ঠুভাবে শেষ হওয়ার কথা আপনারা আগে ভাবুন। মাঠে কোনও রকম গন্ডগোল হলে, লেফটেন্যান্ট জেনারেলের কাছে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে ল্যাম্ব আর ডগলাসের মুখ দুটো চোখের সামনে ভেসে উঠল ম্যাকগ্রেগরের। এই দুই রাজপুরুষ সেদিন নানাভাবে মোহনবাগানের কথা জানতে চাইছিলেন। বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এমন জেদ ধরা উচিত নয়, পরে যা নিয়ে সমস্যা হতে পারে। পুলিশ আপত্তি করছে, এটা বড় ব্যাপার। সদস্যদের মুখ চেয়ে ম্যাকগ্রেগর বললেন, 'জাস্টিস হিল যখন বলছেন, তখন আমারও মনে হয়, তাঁর পরামর্শটাই মেনে নেওয়া উচিত। ঠিক আছে, কাল ম্যাচের রেফারি করা হোক মিঃ পুলারকে।'

সার্জেন্ট নেভিল বললেন, 'স্যার, আমার দুটো কথা বলার ছিল। লালবাজার থেকে আমাকে বিশেষ করে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত জানার জন্য।'

জাস্টিস হিল বললেন, 'অত ভণিতা না করে, সরাসরি যা বলার, বলুন।'

'স্যার, ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্ট দল খেলতে নামার সময় তাদের ম্যাসকট একটা কুকুরকে নিয়ে মাঠে আসে। সেই কুকুরটি কিন্তু ফাইনালে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। স্যার, কুকুরটি খেলার সময় ওরা গোলপোস্টের পাশে রেখে দেয়। ওদের লাকি ম্যাসকট বোধহয়। এতদিন কোনও ঘটনা ঘটেনি, কেননা ওদের খেলা দেখার জন্য স্থানীয় মানুষ যাননি। কিন্তু কাল গোলের পিছনে মোহনবাগানের সমর্থকরাই থাকবেন। তাঁরা যদি কুকুরটিকে বিরক্ত করেন, তা হলে ইয়র্কশায়ার দলটি তা পছন্দ করবে না। উপরন্তু দর্শকদের হুড়োহুড়িতে বারপোস্ট ভেঙে পড়তে পারে। এর আগে ভেঙেওছে।'

ম্যাকগ্রেগর এ বার সমস্যাটি বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আমি ইস্ট ইয়র্কশায়ারের সঙ্গে কথা বলব। খেলা চলাকালীন যাতে কুকুরটিকে ওরা নিজেদের জিম্মায় রাখে, সেটা বলে দিতে হবে। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা কী?'

'স্যার, ম্যাডান কোম্পানি কাল খেলার ছবি তোলার পারমিশন চাইছে। ওরা মুভি ক্যামেরায় খেলাটা ধরে রাখবে। আপনারা কি ওদের পার্মিশন দেবেন?'

শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বার্চ বলে উঠলেন, 'না করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমরা

অবশ্যই অনুমতি দেব। মুভি ক্যামেরায় এই ম্যাচ তোলা থাকলে ভবিষ্যতের মানুষ তা দেখতে পাবে। এর আর্কাইভাল ভ্যালু বুঝতে পারছেন?'

সার্জেন্ট নেভিল বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

মিটিং শেষ হয়ে গেল। ম্যাকগ্রেগর দেখলেন, কালী মিত্তির আর জাস্টিস হিল কথা বলতে বলতে বেরিয়ে যাচ্ছেন। চোখের ইশারায় বার্চকে থাকতে বললেন তিনি। আলাদা কথা বলতে চান। বোঝাই যাচ্ছে, সদস্যরা বেশিরভাগই অখুশি। সবাই চলে যাওয়ার পর বার্চ বললেন, 'তা হলে যা শুনেছিলাম, তা ঠিক ম্যাক। নেটিভ দলটা যদি শিল্ড জেতে, তা হলে তাদের সংবর্ধনা দেবেন জাস্টিস হিল।'

'আই সি', বললেন ম্যাকগ্রেগর, 'একটা কিছু করো বার্চ। এই নেটিভ দলটা যদি কালকে শিল্ড জেতে, তা হলে কাউকে মুখ দেখাতে পারব না।'

বার্চ বললেন, 'ধীরে বন্ধু, ধীরে। অত উত্তেজিত হলে চলবে না। ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। এই নেটিভ টিমটা সত্যিই টিম হিসাবে ভাল খেলছে। আমি দেখেছি। এই টিম থেকে একটা প্লেয়ারকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে ওদের রিদম নষ্ট হয়ে যাবে। বন্ধু, আমিও চাই না, টিমটা জিতুক।'

'একটা প্লেয়ারকে সরিয়ে দেওয়া যায় মানে?'

'মানে... যদি আটকে দেওয়া যায়, তা হলে? আমার আত্মীয় ম্যাডক্স আর্ল ক্যালকাটা কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। তার মুখেই শুনলাম, কর্পোরেশনে চাকরি করে এই দলের এক প্লেয়ার। সম্ভবত তার নাম হাবুল সরকার। কাল ম্যাচের দিন সে যাতে অফিস থেকে বেরতে না পারে, তার জন্য ম্যাডক্সকে বলতে হবে। ওঁকে নোটিশ দিতে বলব, কাজ ফাঁকি দিয়ে কোনও কর্মী যদি মাঠে খেলা দেখতে যান, তা হলে তাঁর চাকরি যাবে।'

শুনে খুব খুশি হলেন ম্যাকগ্রেগর। যেন একটা আশার আলো তিনি দেখতে পেলেন। বার্চের কাঁধে হাত রেখে তিনি বললেন, 'গুড আইডিয়া বার্চ। তোমার এই কূট বুদ্ধির জন্যই আমি তোমাকে এত পছন্দ করি। দেখো তো, নেটিভ টিমটার সর্বনাশ করতে পারো কি না?'

(একত্রিশ)

'দুগগা, দুগগা কোতায় গেলে?'

বাড়ির ভেতর ঢুকে খুশি মনে ডাকলেন হীরালাল। প্রায় সাত আটদিন পর তিনি বাড়িতে ফিরলেন। তিনি জানেনও না, শাশুড়িমাতা এখনও আছেন কি না। শাশুড়িমাতার সঙ্গে তাঁর বনিবনা নেই। ওঁর বড়লোকিপনা একদম সহ্য করতে পারেন না হীরালাল। তিনি তো দুর্গাকে বিয়ে করতে চাননি। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হয়েছিলেন, জামাইবাবু জেদ ধরায়। শাশুড়িমাতার তখনই বোঝা উচিত ছিল, বিয়ের উপযুক্ত 'পাত্তর' তিনি নন। এখন 'অকম্মের ধাড়ি' বলার মানেটা কী?

ডাক শুনে ঘর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে আশাই করেননি হীরালাল। জামাইবাবু! হঠাৎ তিনি এ বাড়িতে? চোখাচোখি হতেই হাউমাউ করে উঠলেন তিনি, 'এ কী অবস্তা করেচিস চোক-মুকের? এ কী কাণ্ড, হায় হায়।'

সেদিন খেলার মাঠে সাহেবদের লাথি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে হীরালালের। ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা আর নেই বটে, কিন্তু মুখের কাছটায় এখনও বেশ ফোলা। ভয়ে আরশিতে মুখ দেখেননি তিনি কয়েকটা দিন। জামাইবাবুর আর্তনাদ শুনে তিনি একটু দমে গেলেন। জামাইবাবুকে হীরালাল বেশ ভয়ই করেন। কোনও দিন মুখের ওপর কথা বলার সাহস পাননি। কাঁচুমাচু হয়ে তিনি বললেন, 'তেমন কিচু হয়নে, খেলতে গিয়ে নেগেচে।'

'তোকে বলেচিলুম না হতভাগা, সাহেবদের সঙ্গে খেলার দরকার নেই। ওরা গরুখেকো জাত। পশুর অধম। আমরা হলুম গে বামুন। ওদের সঙ্গে খেললে আমাদের জাত যাবে। তুই আমার কোনও কতা শুনিস নে। হতভাগা বউকে একা বাড়িতে ফেলে তুই বল খেলতে গ্যাচিস। তোকে জুতোপেটা করা না পর্যন্ত আমার শান্তি হবে নে।'

জামাইবাবুর চেঁচানি শুনে দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন শাশুড়িমাতা। তাঁর বিশাল বপুর আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছেন স্ত্রী দুর্গা। স্ত্রীর মুখটা দেখে দুর্বল হয়ে গেলেন হীরালাল। সত্যিই অসুস্থ স্ত্রীকে ফেলে... এতদিন বোসবাড়িতে পড়ে থাকা উচিত হয়নি। শাশুড়িমাতাও একপ্রস্থ ঝাল ঝাড়বেন, আশা করেছিলেন হীরালাল। কিন্তু আশ্চর্য, মোলায়েম স্বরে উনি বললেন, 'আহা রে বাছা, মুকটা শুকিয়ে গ্যাচে। এসো, ভেতরে এসে বোসো।'

সূর্য কি আজ পশ্চিম দিকে উঠেছে? ঘরে ঢুকে তক্তপোশে বসার পরও হীরালাল বুঝতে পারলেন না। পেছন পেছন ঘরে ঢুকে এসেছেন দুর্গা। সাত সকালেই স্নান সেরে নিয়েছেন। পরনে গরদের লাল পেড়ে শাড়ি। কপালে বড় সিঁদূরের টিপ। সকালে কোথাও পুজো দিতে গেছিলেন না কি? গায়ের রং কালো। কিন্তু দুর্গার মুখটা ঠিক দুর্গা ঠাকুরের মতো। বউয়ের সব ভাল, কিন্তু একটাই বদ অভ্যেস। কথায় কথায় কাঁদেন। শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন দুর্গা। গড় হয়ে প্রণাম করলেন। মৃদু স্বরে হীরালাল জিজ্ঞেস করলেন, 'শরীল কেমন আচে দুগগা?'

'ভাল। দু'দিন আগে শিবেদা এয়েচিলেন। মায়ের কাচে ট্যাকা দিয়ে গ্যাচেন। ত্যাখনই আপনার কতা বলে গেলেন... চিন্তে কতে হবে না কো।'

শিবে টাকা দিয়ে গেছে! কই, তিনি কিছু জানেন না তো? ওহ, এই কারণেই তা হলে শাশুড়িমাতার মুখে এত হাসি! টাকার কথা উঠতেই হীরালালের মনে পড়ল, এ বাড়িতে তিনি টাকা দিতেই এসেছেন।

কোচবিহারের মহারাজার দেওয়া পুরস্কার... ভাগের নব্বই টাকা পাওয়া গেছে। ধুতির খোঁট থেকে সেই একশো টাকা বের করে হীরালাল বললেন, 'এই নাও, এই ট্যাকাটা কাচে রাকো।'

হাত বাড়িয়ে টাকা হাতে নিলেন দুর্গা। তার পর বললেন, 'মা আজ আমাকে হাওড়ায়

নে যেতে চাইচেন। বলচেন, তোকে আর এই ভাড়া বাড়িতে থাকতে হবে নে। জামাইবাবুও সে কতাই বলচে। কী করব, আপনি বলে দিন।'

শুনে গুম হয়ে গেলেন হীরালাল। ফের হাওড়ায় গিয়ে তিনি শ্বশুরবাড়িতে উঠতে চান না। উত্তরের অপেক্ষায় দুর্গা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তক্তপোশ থেকে উঠে গিয়ে হীরালাল বললেন, 'না, তোমায় যেতে হবে নে। আজই আমাদের খেলা শেষ। কাল সক্কালেই চলে আসব।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুর্গার মুখ। তিনি বললেন, 'আমার সই বলচেল, বল খেলায় নাকি আপনার খুব নাম হয়েচে? ফিরিঙ্গিরা না কি হেরে গ্যাচে।'

ভাড়াবাড়িতে আসার পর থেকে দুর্গার এক সই হয়েছেন। তাঁর নাম নলিনী। আশপাশেই কোথাও থাকেন। তাঁর মুখে ফুটবলের কথা শুনে হীরালাল একটু অবাকই হলেন। বাড়ির অন্দরমহলেও আজকাল ফুটবলচর্চা হচ্ছে না কি? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সই বল খেলার কতা জানলেন কী করে?'

মুখ আরও নিচু করে দুর্গা বললেন, 'যেদিন শিবেদা এলেন, বাড়ির সামনে খুব ভিড় হয়ে গেচিল। পাড়ার সবাই ত্যাকন জানতে পেরে গ্যাচে, আপনি কে? সই বলচেল, তোর কপাল ভাল রে সই, এমন সোয়ামী পেইচিস। আমার বরটা খালি পয়সা চেনে। ভাল্লাগে না।'

শুনে মুখ টিপে হাসলেন হীরালাল। ঠিক তখনই ঘড়িওয়ালা বাড়ির ঘড়ির ঘণ্টা শুনতে পেলেন তিনি। এই রে... ন'টা বেজে গেল। ঠিক ন'টার সময় নীলে এসে দাঁড়িয়ে থাকবেন ঘড়িওয়ালা বাড়ির নীচে। দু'জনে একসঙ্গে যাবেন শিবেদের বাড়িতে। পুজো দিতে শিবে আর বিজে গেছেন ঠনঠনের কালীমায়ের মন্দিরে। ওঁদের বাড়িতে দশটার মধ্যে বাকি সবাইকে হাজির হতে হবে। দ্রুত সে সব কথা চিন্তা করে হীরালাল বললেন, 'আমি একন যাই দুগগা। আমার তাড়া আচে।'

দুর্গা বললেন, 'তা কী করে হবে। মা যে আপনার জন্যি নুচি ভাজতে চাইচে।'

'না, না। অত সময় নেই। আজ খাওয়া দাওয়া সব শিবের বাড়িতে।'

বলতে বলতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হীরালাল। পায়ে জুতো গলানোর ফাঁকে দেখলেন, রসুই ঘর থেকে উঠে আসছেন শাশুড়িমাতা। এই রে সব বোধহয় চৌপাট হয়ে গেল। মুখটা কঠিন করে ফেললেন হীরালাল। কোনও জোরাজুরি করলে, মুখের ওপর দু' চার কথা শুনিয়ে দেবেন। কিন্তু এ কী? শাশুড়িমাতার হাতে প্রসাদের চাঙাড়ি। কাছে এসে উনি বললেন, 'সকালে কালীবাড়ি গেছিলাম বাছা। মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যাও। জয়ী হও।'

এ দিকে, বিপ্রদাস কুটিরে শিবদাস আর বিজয়দাস যখন ফিরলেন, তখন সকাল প্রায় সাড়ে ন'টা। ঘরে ঢুকেই তাঁরা দেখতে পেলেন নীলে, হীরে, রাজেন, সুধীর আর অভিলাষ ইতিমধ্যেই হাজির। ঘরে আরও দু'জন আছেন, যাঁদের চেনেন না। বিজয়দাসের হাতে প্রসাদী ফুল। সবার কপালে ছুঁইয়ে দিতে শুরু করলেন তিনি। এক-একজনের কপালে ছোঁয়াচ্ছেন, আর এক-একটা প্রার্থনা করছেন। হীরালালের হাতে প্রসাদ দিয়ে বললেন,

'মা, কৃপা কোরো মা, এ ব্যাটা যেন গোল না খায়।' অভিলাষের বেলায় বললেন, 'মা দেকো, এ ব্যাটা যেন উইনিং গোল করে শিল্ড পাইয়ে দেয়।' নীলের কাছে গিয়ে বিড়বিড় করলেন, 'মা, এ ব্যাটা বোষ্টম, তোমার সৎছেলে মা, এ ব্যাটা যেন ভাল ভাল বল বাড়ায়।'

সুধীরের কাছে গিয়ে বিজয়দাস বললেন, 'মা, এ ব্যাটা যিশুকেষ্টর ছেলে। তাও ফেলে দিও না মা। এ নড়তে চড়তে সময় নেয়। একে দেকো।'

সবাই হেসে উঠলেন কথা শুনে। রাজেন এই সময় এক তরুণকে দেখিয়ে শিবদাসের উদ্দেশে বললেন, 'শিবেদা, আপনের লগে হ্যার পরিচয় করাইয়া দেই। হ্যায় আমাগো দ্যাশের। আমিন আলি। আমার দোস্ত। শিল্ড ফাইনাল দেখনের লেইগ্যা ঢাকা থেইক্যা আইসে।'

রাজেনের কথা শুনে শিবদাস অবাক হয়ে গেলেন। গতকালই বোসবাড়িতে তিনি শুনেছিলেন, শিল্ড ফাইনাল দেখার জন্য আশপাশ প্রদেশ থেকে লোকজন আসছে। পাটনা থেকে এসে নাকি একজন স্যারের কাছে টিকিট চেয়েছেন। দুটো বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা হয়েছে বর্ধমান আর নৈহাটি থেকে। তা ছাড়া প্রচুর স্টিমার চলবে ভাগীরথী বক্ষে। আজ যে মাঠে ভিড় হবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শিবদাস আশা করেননি, পূর্ববাংলা থেকে মুসলমান ছেলেরাও খেলা দেখতে আসবে।

আদাব জানিয়ে আমিন আলি বললেন, 'শিবদাসবাবু, ঢাকায় আপনের অনেক ফ্যান। আপনাগো খেলা দেখনের লেইগ্যা ঢাকা থেইক্যা অনেক মানুষ আইসেন। আপনেরে দাওয়াত দিয়া রাখলাম। একবার ঢাকায় চলেন। আপনার দ্যাশই কইতে পারেন।'

কথাটা শুনে খুব খুশি হলেন শিবদাস। আদতে তিনি পূর্ববাংলারই ছেলে। তবে কোনওদিন ফরিদপুরে যাননি। বাবা মারা যাওয়ার পর তো ওদিককার সম্পর্ক সব চুকেবুকে গেছে। রাজেনের মুখে শিবদাস শুনেছেন, পূর্ববাংলার জেলায় জেলায় ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। লোকজনের উৎসাহও প্রচুর। পুজোর পরে কলকাতায় ফুটবল হয় না। তখন ওদিকে খেলতে গেলে হয়। টিমটা ঠিক থাকবে। তা ছাড়া নতুন নতুন ফুটবলারও খুঁজে নেওয়া যাবে। আগ্রহভরে আমিন আলিকে তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই যাব। আগে আজকের গাঁটটা পেরিয়ে নিই। তার পর ভাবা যাবে।'

তার পর ঘুরে সতীর্থদের শিবদাস বললেন, 'আমি ভেতর থেকে ঘুরে আসচি। এখুনি মা জলখাবার পাঠাচ্চেন। তোরা চট করে খেয়ে নে।'

সুধীর বললেন, 'তার আগে একটা কথা শুনে যাও শিবদাস। ডোমপাড়ার একটা ছেলে আমার কাছে খুব আসে। সে কী বললে জানো।'

সুধীর সাধারণত মুখটুখ খোলেন না। অন্যদের থেকে একটু আলাদাই থাকেন। শিক্ষিত ছেলে, তার ওপর খ্রিস্টান। ওঁর চলন বলনই আলাদা। কলকাতার আর্চবিশপ সুধীরকে খুব ভালবাসেন। তিনি চান, সুধীর খ্রিস্ট ধর্মপ্রচারক হোন। শিবদাস পা বাড়িয়েও...দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'কী বললে?'

'ইস্ট ইয়র্কশায়ার দল একটা কাগজের শিল্ড নিয়ে মাঠে যাবে। খেলার পর সেটা তুলে দেবে আমাদের হাতে। কাগজের শিল্ড ওরা তৈরি করতে দিয়েছে ডোমপাড়ায়।

বলেছে, দেখতে যেন একেবারে আসল শিল্ডের মতো হয়। যত টাকা লাগে লাগুক, ওরা দেবে বলেছে।'

সবাই সুধীরের কথা আগ্রহভরে শুনছিলেন। সবার মুখই রাগে থমথম করে উঠল। অভিলাষ কী বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিলেন শিবদাস। বললেন, 'কতা বলে কোনও লাভ নেই। ওই কাগজের শিল্ড নিয়ে যাতে ওরা ব্যারাকপুরে ফেরত যায়, তার ব্যবস্তা করতে হবে। এমন খেলা আমাদের খেলতে হবে, লোকে যাতে ওদের দুয়ো দেয়।'

ফৈজাবাদ থেকে ইস্ট ইয়র্কশায়ার টিমটা এসে উঠেছে ব্যারাকপুরে ক্যান্টনমেন্টে। শিবদাস এটা শুনেছেন শৈলেন বসুর মুখ থেকে। তাঁর কাছে আরও একটা খবর আছে। যা শুনলে মোহনবাগানের পুরো দলটাই তেতে উঠবে। ঠিক মাঠে নামার আগে সেটা সতীর্থদের তিনি বলবেন, ভেবে রেখেছেন। কিন্তু সবার মুখগুলো দেখে শিবদাস বুঝে গেলেন, এটা সেরা সময়। তিনি বললেন, 'গোরাদের দলটা একজন জোকার ভাড়া করে আনচে। খেলা চলার সময় না কি সে ঘুরে ঘুরে আমাদের ভ্যাঙাবে। আসলে এটা ওদের চাল। আমাদের রাগিয়ে দেওয়ার তাল। ওদের ফাঁদে কেউ পা দিবি না। আমরা আমাদের খেলা খেলে যাব।'

শিবদাস কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার আড়াল থেকে চারুবালা চাপা স্বরে বললেন, 'ঠাকুরপো, তোমাদের জলখাবার এসে গ্যাচে। নিয়ে যাও।'

লম্বা একটা টেবলে কাচের পাত্রে খাবার সাজানো আছে। সবাই একে একে তুলে নিয়ে এলেন। মুখ বুজে সবাই খাওয়ায় মন দিলেন। সুধীর বললেন, 'সেদিন ইস্ট ইয়র্কের সেমিফাইনাল ম্যাচটা আমি দেখতে গেচিলাম। শিবদাস, ওরা দেখলাম, টিমের ম্যাসকট নিয়ে মাঠে নামছে।'

ম্যাসকট কী, সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই বাকিদের। তাই সবাই কৌতূহলী মুখে তাকালেন সুধীরের দিকে। নীলু খেতে খেতেই ছড়া কাটলেন, 'কাকে বলে ম্যাসকট, বলে ফ্যাল চটপট।'

সুধীর বললেন, 'ম্যাসকট হল ক্লাবের প্রতীক। ইস্ট ইয়র্কের ম্যাসকট হল একটা কুকুর। আমাদেরও একটা ম্যাসকট থাকা উচিত। সেটা কোনও পশু বা পাখি হলে ভাল হয়।'

রাজেন বললেন, 'অগো যদি কুত্তা হয়, তাইলে আমাগো হওয়া উচিত বাঘ। দ্য রয়াল বেঙ্গল টাইগার। কী, তোমাগো আপত্তি আছে?'

শিবদাস বললেন, 'দূর বোকা, বাঘ নিয়ে কি মাঠে যাওয়া যাবে না কি? আমরা সাদা পায়রা নিয়ে মাঠে নিয়ে যেতে পারি। পায়রা হল শান্তির প্রতীক। সেটা ওদের জঙ্গিপনার ফিটিং রিপ্লাই হবে। বোসবাড়িতে অনেক হোমার পায়রা আচে। নিবারণকে বললেই হবে, খাঁচায় করে এগারোটা পায়রা মাঠে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে পায়রা থাকবে। মাঠে নেমে আমরা সেগুলো উড়িয়ে দেব।'

'সেই ভাল।' শুনে সবাই হইহই করে উঠলেন।

(বত্রিশ)

মনমোহন খুব মুশকিলে পড়েছেন। পুজো সেরে সক্কালবেলায় তিনি বিপ্রদাস কুটিরে যাওয়ার জন্য বেরচ্ছিলেন। সেই সময় বাবাকে বলতে শুনলেন, 'শোনো মনুর মা, মনু যেন আজ কলকেতায় না যায়। গড়ের মাঠে সাহেবদের কী এক খেলা আছে। প্রচুর লোক খেলা দেখতে যাবে। গঙ্গার ঘাটে ওরা আজ বলাবলি করছিল, কলকাতায় গন্ডগোল হতে পারে।'

মা বললেন, 'ও মা, সে কী কতা? খেলার মাঠে লোক হবে বলে, সবাই বাড়িতে বসে থাকবে?'

বাবা বললেন, 'কী দরকার কলকেতায় যাওয়ার? একদিন আপিস কামাই করলে, কারোর চাকরি যাবে না। আমি বলে দিলুম। তুমি মনুকে জানিয়ে দিও।'

সকাল ন'টার মধ্যে শিবদাসের বাড়িতে পৌঁছনোর কথা। ওখানে খেলার আলোচনা সেরে সবাই মিলে যাবেন বোসবাড়িতে। আটটা বেজে গেছে। এখনই না বেরলে ঠিক সময়ে শ্যামবাজারে পৌঁছনো যাবে না। মনমোহন উসখুস করতে লাগলেন। বাড়ির পেছন দিককার পাঁচিল টপকে তিনি বেরিয়ে যেতে পারেন। বাবা তা হলে জানতে পারবেন না। কিন্তু দুপুরবেলায় যখন খাবার টেবলে খোঁজ পড়বে, তখন তাঁকে দেখতে না পেলে বাবা কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বেন।

ফুটবল খেলা বাবা যে পছন্দ করেন না, তা নয়। কিন্তু কলকাতায় খেলে দেরি করে বাড়ি ফেরায় বাবার আপত্তি। বাবার কথা হল, যেখানেই থাকো, সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাড়ির ছেলেকে বাড়ি ফিরে আসতে হবে। সেটা সম্ভব? চাকরি জীবনে ঢুকে গেছেন মনমোহন। স্ত্রী এবং দুই সন্তানও হয়েছে। তবুও বাবাকে যমের মতো ভয় পান। ম্যাচ যেদিন থাকে না, সেদিন সন্ধে ছ'টার মধ্যে বাড়ি চলে আসেন। কিন্তু ম্যাচের দিন খেলা তো শুরুই হয় বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। শেষ হতে হতে সাড়ে ছ'টা। তারপর ফেরি ধরে বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে সাতটা বেজে যায়। মা আর বউকে ম্যানেজ করে নিয়েছেন মনমোহন। বাড়ির পেছনের দরজা ওঁরা খুলে রাখেন। কখনও কখনও পাঁচিল টপকেও মনমোহনকে বাড়ি ঢুকতে হয়। ফুটবল মরশুমে মা আর বউ রোজই মিছে কথা বলেন বাবাকে।

বাবা বৈঠকখানায় চলে যাওয়ার পর মায়ের কাছে গেলেন মনমোহন, 'মা কী হবে? আজ ফাইনাল খেলা। না গেলে সর্বনাশ হবে।'

মা বললেন, 'এখন বেরুস না বাবা। তোর বাবাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিই। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য উনি ওপরে উঠে গেলে তুই বেরিয়ে যাস।'

'তা'লে তো বারোটা, সাড়ে বারোটা বেজে যাবে মা।'

'তা তো বাজবেই। তুই না হয় সোজা মাঠে চলে যাস।'

বেলা বারোটা অবধি বাড়িতে ছটফট করতে লাগলেন মনমোহন। বেলা সাড়ে বারোটার সময় বাবার সঙ্গে এক টেবলে বসে খলসে মাছের ঝাল দিয়ে ভাত খেলেন। গলা দিয়ে ভাত নামতে চাইছে না। বোসবাড়িতে কী হচ্ছে, সেই দুর্ভাবনাতেই। এতক্ষণে নীলে, সুধীর,

হাবুলরা সবাই বোসবাড়িতে পৌঁছে গেছে। লাঞ্চ খাওয়াও বোধ হয় সারা। কেননা, খেলার চার ঘণ্টা আগে খাওয়ার কথা প্লেয়ারদের। নিশ্চয়ই এতক্ষণে আলোচনা হচ্ছে, মনমোহনের কী হল? শৈলেন স্যার খুব রাগ করবেন। তবে শিবেদা আছে, ও ম্যানেজ করে দেবে। বাড়ির অসুবিধের কথা শিবেদা জানে।

বেলা দেড়টার সময় পেছনের দরজা দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন মনমোহন। তার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিয়েছেন। প্রণাম করার সময় মা বললেন, 'শিল্ড জিতে তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে যেন বোসবাড়িতে চলে যাস না।'

ফেরিঘাটে এসে মনমোহন দেখলেন, মারাত্মক ভিড়। যাত্রীদের কারও কারও হাতে সবুজ আর মেরুন ঘুড়ি দেখে মনমোহন একটু অবাকই হলেন। ঘুড়ি কেন, জিজ্ঞেস করায় কে একজন বললেন, মাঠে ভিড় হবে। ঘুড়ির গায়ে রেজাল্ট লিখে ওড়ালে পিছন দিকের লোকেরা সবাই দেখতে পারবে। শুনে মনমোহন মনে মনে তারিফ করলেন। বাঃ, বেশ বুদ্ধি তো এঁদের। যাত্রীদের সবার মুখেই খেলার কথা। চুপ করে দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনতে লাগলেন তিনি। কেউ তাঁকে চেনেন না। তিনিও কাউকে চেনেন না। আশপাশে অনেক চটকল আছে। এঁরা বোধহয় সেখানকার কর্মী।

বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে এঁরা কথা বলছেন। শুনতে শুনতে বেশ মজাই পেলেন মনমোহন। কে একজন বলল, 'মোহনবাগান জরুর জিৎ যায়েগা।' অন্যজন সহমত, 'সে তো জিতবেই। লেকিন ফিরিঙ্গি টিম মে আচ্ছা গোলকিপার হ্যায়।' আর একজন বলল, 'ঠিক বোলা, ও বহুত গোল বাঁচাতা। কিন্তু আমি শুনেছি, ওর টেংরিমে চোট আছে।' পাশেরজন প্রতিবাদ করে উঠল, 'না না, চোট ঠিক হো গ্যায়া আমি জানি।'

মনমোহন বুঝতে পারলেন, যাত্রীরা ইয়র্কশায়ারের গোলকিপার ক্রেসির কথা বলছে। ক্রেসি যে ভাল গোলকিপার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে বধ করার পরিকল্পনাও করেছে মোহনবাগান। কাল সব প্লেয়ারকে বুঝিয়ে দিয়েছেন শিবেদা। সত্যি, শিবেদার মাথায় খেলেও বটে। গোলবক্সের ছয় গজের মধ্যে ক্রেসি অসাধারণ। একেবারে বাঘের মতো ঘুরে বেড়ায়। উঁচু বলে ওকে গোল দেওয়া কঠিন। তাই শিবেদা প্ল্যান করেছেন, ক্রেসিকে ছয় গজ থেকে বের করে আনতে হবে। ওকে টোপ দিতে হবে। কীভাবে সেই টোপ দেওয়া হবে, কারা দেবে, সেটাও ছকে নেওয়া হয়ে গেছে।

নৌকো বাবুঘাটের দিকে এগোচ্ছে। গঙ্গাবক্ষ থেকেই ফোর্ট উইলিয়ামের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক দেখতে পেলেন মনমোহন। পত পত করে উড়ছে। পতাকা দেখেই চিনচিনে একটা রাগ হতে শুরু করল। সেই রাগটা আসলে সাহেবদের ওপর রাগ। পরাধীন থাকার যন্ত্রণা। হাটে-বাজারে, অফিস-কাছারিতে ওদের অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না। এমনিতে মনমোহন খুব শান্ত প্রকৃতির। কিন্তু অতি সম্প্রতি অফিসের এক ঘটনায় তিনি মনে মনে গোমরাচ্ছেন। তিনি চাকরি করেন পিডব্লুডি-তে। অফিসের বড়বাবু অমিয় মুখার্জি কী একটা ভুল করেছিলেন। সেই কারণে, লাঞ্চের সময় তাঁকে জোর করে বিফ খাইয়ে দেন সাহেব বড়কর্তা। বয়স্ক ব্রাহ্মণ, সকলের সামনে বড়বাবু এই অপমান সইতে পারেননি। জাতিচ্যুত হওয়ার ভয়ে আর তিনি বাড়ি ফেরেননি। গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেন। মাছে ঠুকরে

খাওয়া বড়বাবুর মৃতদেহটা বাবুঘাট থেকে উদ্ধার করেছিল জলপুলিশ। একদিন পর।

নৌকো থেকে নেমে, বাবুঘাটে পা দিয়ে মনমোহন বাড়ির কথা ভুলে গেলেন। মনে মনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, বদলা নিয়ে তবে ফিরবেন।

...সকাল থেকেই কলকাতার লোক ময়দানমুখো। কাগজের অফিস থেকে গণেন মল্লিক মাঠের দিকে রওনা হলেন বেলা তিনটের সময়। বাগবাজার থেকে গড়ের মাঠ আধ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। গঙ্গার ধার দিয়ে এগোলে আরও কম সময় লাগে। কেননা, এই অঞ্চলে লোক চলাচল খুব কম। বেশির ভাগই ওয়ার হাউস। ব্যাপারী আর পোর্টারদের ভিড়। আজ তারাও নেই। বাবুঘাটের কাছাকাছি এসে গণেন মল্লিক অবশ্য বুঝতে পারলেন, গড়ের ঢালে তিলধারণের স্থান থাকবে না।

হাওড়ার দিক থেকে নৌকো এসে ঘাটে ভিড়ল। হইহই করে লোক উঠে আসছে। তাদের মাঝে মনমোহনকে দেখতে পেলেন গণেন মল্লিক। এ কী, এই সময়ে মনমোহন এখানে? তার তো টিমের সঙ্গে থাকার কথা। তিনি বললেন, 'শিগগির আমার গাড়িতে উঠে এসো। এত দেরি হল?'

মনমোহন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গাড়িতে উঠে বললেন, 'বাড়ি থেকে বেরুতে দেরি হয়ে গেল।'

'চলো, শিগগির আমার সঙ্গে চলো। শৈলেনবাবুরা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তা করছেন।'

স্ট্র্যান্ড রোডের মুখ অবধি পৌঁছে গাড়ি আর এগোতে পারছে না। সামনে সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে। ফিটন, ভিক্টোরিয়া, কেরাঞ্চি, লান্ডো। একেবারে কেল্লার ধার পর্যন্ত জট পাকিয়ে রয়েছে। অগুনতি মানুষ। সাংবাদিক জীবনে এত বড় জনসমাবেশ কখনও দেখেছেন কি না মনে করতে পারলেন না গণেন মল্লিক। মোহনবাগানের সঙ্গে যেন বাঙালির ভাগ্য জড়িয়ে গিয়েছে। বাঙালির অনেক ক্ষোভ জমা হয়ে রয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। দু'শো বছরেরও অধিক অপমান আর অত্যাচারে তাদের বুকে এখন গভীর ক্ষত। সেই ক্ষতে মলমের প্রলেপ দিচ্ছে মোহনবাগান শিল্ড ফাইনালে উঠে।

গত পাঁচ-ছয় বছরে একের পর এক ঘটনা ঘটে গেছে। বঙ্গভঙ্গ, ক্ষুদিরামের ফাঁসি, আলিপুরের বোমা মামলা ও শ্রীঅরবিন্দের গ্রেফতার হওয়া, বহু বিপ্লবীর দ্বীপান্তর এবং ফাঁসি... বাঙালিকে আত্মসচেতন করে তুলেছে। তারা এখন ক্ষোভপ্রকাশের পথ খুঁজছে। এই সময় শিল্ডের এই ম্যাচ। গাড়ি থেকে নেমে, মনমোহনকে নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুর দিকে হাঁটার সময় গণেন মল্লিকের মনে হল, মাঠে আজই না আগ্নেয়গিরির উৎসমুখটা খুলে যায়। গলগল করে বেরিয়ে আসবে আবেগের লাভাস্রোত। ফিরিঙ্গিদের দম্ভ, আভিজাত্য আর অপশাসন তাতে চাপা পড়ে যাবে।

গড়ের মাঠে আজ আর কোনও বৈষম্য নেই। হিন্দু মুসলমান সব এক। ইডেন গার্ডেন্সের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গণেন মল্লিক আর মনমোহন দেখলেন, গাছের ছায়ায় একদল মুসলমান নামাজ পড়ছেন। খোদাতালার কাছে বোধহয় প্রার্থনা করছেন মোহনবাগানের জন্য। শিল্ডে মুসলিমদের একটা দল এ বার অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ইস্ট ইয়র্কশায়ারের কাছে তারা ৭-১ গোলে হেরে যায়। থার্ড রাউন্ডের সেই ম্যাচ কভার করার জন্য মাঠে

হাজির ছিলেন গণেন মল্লিক। সাহেবরা পাত্তাই দেয়নি মুসলিম দলটাকে। সেই কারণেই কি মুসলমানরা... মোহনবাগানকে সমর্থন জানাতে মাঠে এসেছেন।

গড়ের ঢালে প্রচুর ফেরিওয়ালার ভিড় লক্ষ করলেন মনমোহন। টুলওয়ালা হাঁক পাড়ছে, 'এক ট্যাকা, এক ট্যাকা'। দাঁড়িয়ে ম্যাচ দেখার জন্য টুল দেবে, তার ভাড়া এক টাকা। আর এক জায়গায় ছোট জটলা। দু'টি কাঠের দণ্ডের ওপর নীচে আয়না লাগানো একটা যন্ত্র। ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে নীচের আয়নার দিকে তাকালে খেলা দেখা যায়। একজন লোকের হাতে ওই যন্ত্রটা দেখে কিছু লোক কৌতূহলী হয়ে ভিড় করেছে। মনমোহন জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যন্ত্রটা কী গণেনবাবু?'

'পেরিস্কোপ।' গণেন মল্লিক বললেন, 'আগে দেখোনি? গড়ের ঢালে অনেক দূর থেকে খেলা দেখা যায়। পিছনের দিকে যারা থাকবে, তারা পেরিস্কোপ ভাড়া নিয়ে খেলা দেখবে। একটা খেলা ঘিরে কত রোজগার দেখো। একটা সেদ্ধ আলুর দাম এক আনা! যে যা পারছে, দাম হাঁকাচ্ছে।' কথাগুলো বলতে বলতে গণেন মল্লিক পকেট থেকে ঘড়ি বের করলেন। প্রায় চারটে বাজে। দূর থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবু দেখতে পেলেন ওরা। সেখানেও বেশ ভিড়। লোকজনের মাঝখান দিয়ে দ্রুত পায়ে সে দিকে এগোতে লাগলেন। খটখটে রোদ্দুর। লোক চলাচলের জন্য চারদিকে ধুলো উড়ছে। ধুতির খোঁট দিয়ে গণেন মল্লিক একবার মুখের ঘাম মুছে নিলেন।

...মিনিট তিনেক পর তাঁবুকে ঢুকতেই সবাই হইহই করে উঠলেন। চারদিক থেকে একযোগে প্রশ্ন ধেয়ে এল মনমোহনের দিকে। এত দেরি হল কেন? কিন্তু তাঁদের থামিয়ে দিয়ে গণেন মল্লিক বললেন, 'এখন কোনও প্রশ্ন নয়। বেচারী অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। ওকে ঘাম শুকোতে দাও।' সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-ছয়জন মিলে বাতাস করতে লাগলেন মনমোহনকে।

উত্তর কলকাতার পরিচিত মুখগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন গণেন মল্লিক। বনেদি বাড়ির সব মানুষ। আরে, দানী মিত্তিরও এসেছে। লোকটা এতদিন ধরে মোহনবাগানকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করল! এত পেছনে লাগল। আজ কী করতে এসেছে? শৈলেনবাবুই বা অ্যালাউ করলেন কী কারণে? ভূপেনবাবু কথা বলছেন কালীচরণ মিত্তিরের সঙ্গে। শৈলেনবাবু গুম মেরে আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে গণেন মল্লিক জিজ্ঞেস করলেন, 'টিমে কোনও অদলবদল হয়নি তো?'

ছোট্ট উত্তর, 'না।'

'তাঁবুর ভেতর এত ভিড় কেন? প্লেয়াররা ওয়ার্ম আপ করবে কীভাবে?' কথাটা গণেন মল্লিক একটু জোরেই বললেন। তাতে কাজ হল। লোকজন বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

তাঁবুর ভেতর টেনশন এ বার টের পেলেন গণেন মল্লিক। প্লেয়ারদের দিকে একবার তিনি চোখ বোলালেন। বেশিরভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। কেউ ছাত্র, কেউ কেরানী, কেউ শিক্ষক অথবা ছোট ব্যবসায়ী। এই ম্যাচ থেকে এরা যা পাওয়ার লক্ষ নিয়ে নামছে, তা হল আত্মমর্যাদা। গোলকিপার হীরে দরিদ্র পরিবারের ছেলে। শিল্ড জয় এই ছেলেটিকে সামাজিক সম্মান এনে দেবে। রাইট ব্যাক ভুতি সুকুল অবাঙালি পরিবারের

ছেলে। সুকুল আজ প্রমাণ করবে, ওর থেকে বড় বাঙালি আর কেউ নেই। লেফট ব্যাক সুধীর খ্রিস্টান। কিন্তু সাদা চামড়ার খ্রিস্টান নয়। ওর কাছে এই ফাইনাল ম্যাচ অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই। ... এক-এক জনের কাছে এই ম্যাচ এক-এক কারণে অর্থবহ। তাঁবুর ভেতর গরমে ঘামতে ঘামতে গণেন মল্লিকের মনে হল, প্রতি মানুষের জীবনেই এমন একটা সন্ধিক্ষণ আসে, যখন তাকে চরম লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে হয়। মোহনবাগানের এই এগারো জনের জীবনে সেই সন্ধিক্ষণ এসে গেছে। এদের লড়াই একটা জাতির বদনাম ঘুচিয়ে দেবে। একটা জয় সব কলঙ্ক মুছে দেবে। বাঙালিকে মেয়েলি বলার আগে সাহেবরা তখন দু'বার ভাববে!

(তেত্রিশ)

প্রকাণ্ড এক গর্জন হাউইয়ের মতো আকাশের দিকে উড়ে গেল, বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে মোহনবাগান যখন ক্যালকাটা মাঠে এল। মাঠের পূর্ব আর পশ্চিম দিকে গ্যালারি। তাতে সার সার বসে সাদা-লাল মুখ। ইংরেজ মহিলারাও খেলা দেখতে এসেছেন। আর মাঠের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছেন মোহনবাগান সমর্থকরা। মাঠে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাচের রেফারি মিঃ এইচ জি পুলার। তাঁর দু'পাশে লাইন জাজ মিঃ ম্যাকক্রেডি আর মিঃ মার্সডেন। লাইন জাজদের পেছনে ঢুকছে দুটো টিম। ইস্ট ইয়র্কশায়ার টিমের ক্যাপ্টেন জ্যাকসনের কোলে একটা বিলিতি কুকুর। তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে শিবদাস... তাঁর হাতে সাদা হোমার পায়রা। মোহনবাগানের এগারোজন একসঙ্গে এগারোটা পায়রা উড়িয়ে দিলেন মাঠে ঢুকে। সমর্থকরা আগে এ জিনিস কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। তারা হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

সেই উল্লাস থেমে যাওয়ার পর ইংরেজদের গ্যালারি থেকে এক যুবক রেফারির উদ্দেশে বলে উঠলেন, 'মিঃ পুলার ফার্স্ট চেক দেয়ার নেল'স।' সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারি থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। সেমিফাইনালে মিডলসেক্স টিমের গোলকিপার পিগট চোখের কোণে চোট পেয়েছিলেন... অভিলাষের সঙ্গে সংঘর্ষে। চোখের কোণ কেটে রক্ত পড়েছিল। তাতে সাহেবদের ধারণা হয়, অভিলাষের নখের খোঁচায় সেটা হয়েছে। সেই কারণেই রসিকতা। রেফারিকে পরামর্শ মোহনবাগানে প্লেয়ারদের পায়ের নখ পরীক্ষা করার জন্য।

মিঃ পুলার অবশ্য দর্শকদের মন্তব্যে কান দিলেন না। জ্যাকসন আর শিবদাসকে টস করতে ডাকলেন। এই মাঠে টস জিতে যে দল কেল্লার দিকে খেলার সুযোগ পাবে, তাদের বাড়তি সুবিধে। উল্টোদিকে, অর্থাৎ রেড রোডের দিকে গোল আগলাতে হলে গোলকিপারের অস্বস্তি হয়। কেননা, অস্তগামী সূর্যের আলো তাঁর চোখে এসে পড়ে। দূরপাল্লার শট গোলকিপার ঠাওর করতে পারেন না। অনেক সময় গোল হয়ে যায়। দর্শকরাও এই সুবিধে-অসুবিধের কথা জানেন। তাই জ্যাকসন টস জেতায় হইহই করে উঠলেন ইংরেজরা।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কিক অফ হয়ে গেল। ক্যালকাটা মাঠের চারপাশে...গড়ের ঢালে প্রায় আশি হাজার মানুষ চিৎকার শুরু করলেন মোহনবাগানের হয়ে। আর সেই মুহূর্তেই যেন ভারতীয় ফুটবলের সূর্যোদয় শুরু হয়ে গেল।

অভিলাষ বল বাড়িয়ে দিলেন বিজয়দাসকে। ইস্ট ইয়র্কের রাইট ইনসাইড হাওয়ার্ডকে কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তার পর বাঁপায়ে চিপ করে বল বাড়ালেন হাবুল সরকারকে। পেনাল্টি বক্সের মাথা থেকে হাবুল যখন গোলে শট নিতে যাবেন, তখন লেফট হাফব্যাক মার্টিন দৌড়ে এসে লম্বা কিক করে বল পাঠিয়ে দিলেন মোহনবাগান এলাকায়। খেলা জমে উঠল।

দু'দলই এ বার গুছিয়ে আক্রমণে উঠতে লাগল। ইয়র্কশায়ারিরা মোহনবাগান গোলের আশপাশ দিয়ে ঘুরে গেল বার দুয়েক। কিন্তু প্রথমবার সুকুল আর পরের বার রাজেনের জন্য গোলের মুখ খোলা পেল না। এবার পাল্টা আক্রমণে গেল মোহনবাগান। রাইট উইং দিয়ে তরতর করে বল নিয়ে উঠে গেলেন কানু রায়। সেই দৃশ্য দেখে দর্শকরা লাফালাফি শুরু করলেন। আকাশ ফাটানো চিৎকার কা-নু, কা-নু। ডান দিক থেকে সেন্টার করলেন কানু। কিন্তু বল হেড করে ফিরিয়ে দিলেন জ্যাকসন।

মিনিট পাঁচেক খেলা হয়ে গেল। মাঝমাঠে নীলু অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। শিবে করছেটা কী? খেলার আগে এতসব প্ল্যান করল, কোথায় কী? ডান দিক থেকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এ্যাই শিবে, দয়া করে এ বার শিঙে বাজা।' শিবদাস হাত তুলে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। ইস্ট ইয়র্কের রাইট ব্যাক হুইটনি ছিনে জোঁকের মতো লেগে রয়েছেন তাঁর গায়ে। তাঁকে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ খুঁজছেন শিবদাস। এত অধৈর্য হলে চলে?

সুযোগটা শিবদাস পেয়েও গেলেন কয়েক মিনিট পর। মাঝমাঠ থেকে ফ্রি কিক নিয়েছিলেন রাজেন। বল জমি স্পর্শ করার আগে শিবদাস দেখতে পেলেন, বিপজ্জনকভাবে বুট তুলে তাঁকে ট্যাকল করতে এগিয়ে এসেছেন হুইটনি। শরীরে শরীরে সংঘর্ষ হলে চোট অনিবার্য। তাই আত্মরক্ষার তাগিদে, শরীরকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, গোড়ালি দিয়ে বল তুলে নিলেন শিবদাস। তার পর জোরাল শট নিলেন গোল লক্ষ্য করে। কিন্তু গোলকিপার ক্রেসি সেই শট রুখে দিলেন।

দু'দলই মাঝমাঠ থেকে বল দেওয়া-নেওয়া করে আক্রমণ শানাতে লাগল। কিন্তু গোল পেল না। একটা সময় খেলাটা এসে দাঁড়াল দুই গোলকিপারের দক্ষতা প্রদর্শনে। ক্রেসি একটা ভাল সেভ করেন, তো উল্টো দিকে হীরেও কম যান না। তিনিও পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে। বল আটকে দিতে লাগলেন। এ দিকে দর্শকরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছেন। তাঁরা ভাদুড়িদের গোল দেখতে এসেছেন। মাঠের চারপাশে অসংখ্য গাছে বসে বহু মানুষ খেলা দেখছেন। গালাগাল করতে করতে তাঁরা জুতো ছুড়ে মারছেন ইংরেজদের গ্যালারির দিকে।

প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারল না। বিরতির সময় মাঠের একধারে বসে মোহনবাগান দল লেমনেড খাচ্ছে। এমন সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন দুখীরামবাবু। শিবদাসের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই, তোরা জায়গা বদল করে খেলচিস না কেন? সেদিন যে পইপই করে বলে এলুম?'

শিবদাস বললেন, 'ফার্স্ট হাফটা কাটিয়ে দিলুম। এইবার অ্যাটাকে যাব। পঁচিশ মিনিট অল আউট অ্যাটাক।'

দুখীরামবাবু ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে দিলেন শিবদাসের। তার পর বললেন, 'তুই বিজের সঙ্গে জায়গা বদল করে খ্যাল। তোর দিকেই ওদের নজর বেশি। বিজেকে ওরা ফাঁক রেখে দিচ্চে। ফায়দা তুলে নে শিবে। দেখবি, ঠিক গোল পেয়ে যাবি।'

শিবদাস বললেন, 'ওরা অফসাইডে লোক রেখে দিচ্চে। কী করা যায় বলুন তো? দেখবেন, ওদের লেফট আউট ক্লুকাস আমাদের সুকুল আর সুধীরের থেকে একটু এগিয়ে থাকচে। আমার ভয় লাগচে, রেফারি না আবার চোখ বন্ধ করে রাকে। অফসাইড দেবে না। হীরেকে একা পেয়ে ক্লুকাস ব্যাটা গোল করে আসবে।'

'তুইও এক কাজ কর শিবে। অভিলাষকে বলে দে, অফসাইডে থাকতে। ওকে আরও বলে দে, বল বাড়ানোর আগে যেন অনসাইডে চলে আসে। ওদেরও পাল্টা চাল দে না। মজা টের পাবে।'

শিবদাস বললেন, 'ঠিক আচে। অভিলাষকে আমি বলে দিচ্চি।'

মাঠ থেকেই শিবদাস দেখলেন, দক্ষিণে ইডেন গার্ডেন্সের দিকে সার সার বসে রয়েছেন ভূপেনবাবু স্যার, কালীচরণ মিত্তির, জগদীশ মিত্তির, মণিলাল সেন, হোলি সাহেব, গণেন মল্লিক আরও অনেকে। তাঁদের পেছনে কাতারে কাতারে মানুষ। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। ম্যাচটা জিততে না পারলে এত লোক হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। ইস্ট ইয়র্কশায়ার টিমটা...রংচঙে পোশাক পরা একজন জোকারকে মাঠে নিয়ে এসেছে। সে নানা রকম ভাঁড়ামো করছে। হঠাৎ শিবদাস দেখলেন, শৈলেনবাবু স্যারের সামনে গিয়ে সেই জোকার মিমিক্রি করতে লাগল। তাই দেখে অভিলাষ আর সহ্য করতে পারল না। উঠে গিয়ে তাকে ঠাস করে এক চড় মারল। লাফিয়ে উঠে অভিলাষকে জাপটে ধরল রাজেন, 'মাথা ঠান্ডা কর। ম্যাচ অহনও জিতি নাই।'

ম্যাচ রিস্টার্ট হওয়ার ঠিক আগে সতীর্থদের কাছে ডাকলেন শিবদাস। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতি ম্যাচেই তাঁরা ম্যাচ জেতার শপথ নেন। তার পর টিমের গান গাইতে গাইতে সবাই মাঠে নেমে পড়েন...'আমাদের কে পারে'। আজও সবাইকে ডেকে শিবদাস বললেন, 'আর মাত্তর পঁচিশটা মিনিট বাকি আচে। এ বার আমরা আমাদের খেলা খেলব। রোদ পড়ে এয়েচে। এ বার সবাই অল আউট যাব।' প্রত্যেক প্লেয়ারকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে লাগলেন শিবদাস। উল্টো দিকে ইস্ট ইয়র্ক টিমটা এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রেফারি বাঁশি বাজিয়ে ডাকছেন তাঁদের। ইচ্ছে করেই না-শোনার ভান করলেন শিবদাস। ইস্ট ইয়র্ক টিমটাকে চটানোর জন্য। নেটিভ দলের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে, এটা সাহেবরা বরদাস্ত করতে পারবেন না। মাথা গরম করে ফেলবেন।

ঠিক মাঠে নামার আগে মোহনবাগানের প্লেয়াররা একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন। ভূপেনবাবু স্যারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা মেয়ে। তার পরনে সবুজ-মেরুন শাড়ি। হাতে বেশ বড় একটা সবুজ-মেরুন পতাকা। সাহেবদের সঙ্গে মেমরা প্রায়ই খেলা দেখতে আসে। কিন্তু কোনও বাঙালি মেয়েকে আজ পর্যন্ত ফুটবল মাঠে দেখেননি শিবদাস। দু'হাতে পতাকা নাড়তে নাড়তে মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, 'শিবদাসদাদা, ম্যাচ জিতে ফেরা

চাই-ই।' উড়তে থাকা সবুজ-মেরুন ওই পতাকা যেন বুকের ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়ে গেল প্লেয়ারদের। কে এই মেয়েটা?

...বিরতির পর খেলা শুরু হতেই ইস্ট ইয়র্ক প্রচণ্ড চেপে ধরল মোহনবাগানকে। ছোট ছোট পাসে তারা খেলছে। তাদের আটকাতে গিয়ে সুধীর আর সুকুলের দম বেরিয়ে গেল। রাজেনও নীচে নেমে গেছে। যথাসাধ্য সাহায্য করছে ডিফেন্ডারদের। গোলের মুখ যাতে সাহেবরা ফাঁকা না-পায়, তার চেষ্টা করছে। খেলা এ ভাবে চললে, বেশিক্ষণ ওদের রোখা যাবে না। কে কার কথা শোনে? মিনিট দশেক কেটে গেল। তবুও গুছিয়ে আক্রমণে যেতে পারল না মোহনবাগান। আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। না, এ বারও বোধহয় শিল্ড পাওয়া আর হল না।

ভাবতে না ভাবতেই গোল। পেনাল্টি বক্সের বাইরে হ্যান্ডবল করে বসল সুকুল। ডাইরেক্ট ফ্রি কিক। কুড়ি পঁচিশ গজ দূর থেকে হীরেকে গোল দেওয়া কঠিন। কিন্তু সেই কাজটাই সহজে করে ফেলল ইয়র্কশায়ার টিমের ক্যাপ্টেন জ্যাকসন। জমি ঘেষা শট নিল। হীরে বলের গতিপথ অনুমান করার আগেই গোলে ঢুকে গেল (১—০)।

গড়ের ঢালে যেন শ্মশানের নীরবতা নেমে এল। ইস্ট ইয়র্কের সমর্থকরাও প্রথমে বুঝতে পারেননি, গোল হয়ে গেছে। যখন বুঝতে পারলেন, তখন গ্যালারি থেকে নেমে অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করলেন। কাগজের তৈরি একটা শিল্ড ওঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেটা নিয়েই তাঁরা মত্ত। তাঁদের আনন্দধ্বনি পিছন দিককার দর্শকদের কানে পৌঁছনোর কথা নয়। তাঁরা আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত! কালো ঘুড়ি উড়ছে। তার মানে মোহনবাগান গোল খেয়েছে! খেলার তখন আর মিনিট দশেক বাকি। আর কোনও আশা নেই। কেউ কেউ অবশ্য বললেন, 'গোল ঠিক শোধ হয়ে যাবে, দেকো। আমাদের পিছলবাবু আচে।' অর্থাৎ শিবদাস ভাদুড়ি! এতটা আশার কারণ, মিডলসেক্স ম্যাচেও তো মোহনবাগান প্রথমে গোল খেয়েছিল। তার পর ভাদুড়ি ব্রাদার্স খেল দেখিয়েছিল। আজও দেখাবে।

মাঠে কিন্তু জেতার লক্ষণ নেই। গোল করার পর মোহনবাগানকে আরও ঠেসে ধরেছে গোরা পল্টনরা। পরপর তিনবার কর্নার। যে কোনও মুহূর্তে আরও গোল হয়ে যেতে পারে। ঠিক সেই সময় শিবদাস তাঁর জাদু দেখালেন। নিজেদের মধ্যে পাস খেলতে খেলতে ইয়র্কশায়ার গোলমুখে পৌঁছেই গোল লক্ষ্য করে শট নিলেন শিবদাস। গোঁত খেয়ে বল গোলে ঢুকে গেল (১—১)। খেলা শেষ হতে আর তখন পাঁচ মিনিট বাকি।

আকাশে এ বার সবুজ-মেরুন ঘুড়ি উড়ল। অর্থাৎ মোহনবাগান গোল দিয়েছে। গোলটা কে করলেন। কেউ নিশ্চিত নন। কেউ বললেন শিবদাস, কেউ বললেন... না তাঁর দাদা। চুলোয় যাক, গোলটা কে করেছে। ১—১ তো হয়েছে! আকাশ-বাতাস যেন কেঁপে উঠল। 'ভাদুড়ি ব্রাদার্স জাদু দেকাচ্চে রে', 'গোরা পল্টনদের হাগিয়ে দিয়েচে'। জনতার উল্লাসে সামিল হয়েছেন কর্তারাও। রিপোর্টার গণেন মল্লিক লাফিয়ে উঠে চিৎকার করেছেন, 'আরও গোল হবে। নিশ্চয়ই হবে।' গণেনের প্রতিদ্বন্দ্বী রমেশ ঘোষালও বসে থাকবেন কী করে? ইংরেজদের কাগজে চাকরি করেন। এতদিন তিনি মোহনবাগান থেকে দূরে দূরে থেকেছেন। চাকরির কথা ভুলে তিনিও ছাতা ঘোরাচ্ছেন মাথার ওপর।

গোল শোধ হওয়ার পরই ইস্ট ইয়র্ক দল ডিফেন্সিভ হয়ে গেল। সেই সুযোগে মনমোহনকে তুলে এনে সিক্সথ ফরোয়ার্ড করে দিলেন শিবদাস। গোল এল... বহু আকাঙ্ক্ষিত গোল। খেলা শেষ হওয়ার মিনিট তিনেক আগে। শিবদাসের পায়ে বল...পাঁকাল মাছের মতো তিনি এগিয়ে গেলেন ইয়র্কশায়ারের গোলের দিকে... জ্যাকসনকে কাটিয়ে নিলেন... ধোঁকা দিলেন মার্টিনকেও... গোলের খুব কাছে গিয়ে তিনি লক্ষ করলেন, মার্জারের সতর্কতায় পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন গোলকিপার ক্রেসি... শিবদাস বুঝে গেলেন, শট নিলেও তিনি গোল পাবেন না... ক্রেসিকে বোকা বানানো সহজ নয়... তাই আলতো করে পাস বাড়ালেন অভিলাষকে।

যতীনের পিস্তলটা হাতে এসে গেছে। ট্রিগার টিপলেন অভিলাষ। বলটা বুলেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে গোলের ভেতর ঢুকে গেল। দু'হাত মুঠো করে শূন্যে ছুড়ে দিলেন অভিলাষ। তার পর হিস্টিরিয়া রোগীর মতো কী যেন বলতে বলতে দৌড়ে গেলেন শিবদাসের দিকে।

(চৌত্রিশ)

'থ্রি চিয়ার্স ফর মোহনবাগান।'

ফাইনাল ম্যাচের প্রধান অতিথি মিঃ কার্টারের হাত থেকে আইএফএ শিল্ড হাতে নিয়ে দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন শিবদাস। শিল্ডের ভার তিনি বইতে পারছেন না। তাঁর শরীর এমনই ক্লান্ত। পাশ থেকে দৌড়ে এলেন সুধীর, নীলু আর অভিলাষ। 'হিপ হিপ হুররে' বলতে বলতে ছুটে এলেন সুকুলও। চারপাশের আনন্দ-কোলাহল শিবদাস যেন শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর কানে তালা ধরে গেছে। এক বছর আগে শৈলেনবাবুর সামনে একটা শপথ করেছিলেন। সেটা রাখতে পেরেছেন। জীবনে যেন আর কিছু পাওয়ার নেই। আশপাশে তাকিয়ে তিনি ক্লাব সচিবকে খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন, দূরে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে তিনি মুখ মুছছেন। বেঙ্গল আর্মির সুবেদার মেজর শৈলেনবাবুকে কখনও কাঁদতে দেখেননি শিবদাস। স্যারের চোখে জল দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে গেলেন। ধরাধরি করে সবাই মিলে শিল্ড স্যারের কাছে নিয়ে এলেন। আনন্দে কেঁদে উঠলেন অনেকে।

হঠাৎই শিবদাসের মনে পড়ল রাজেন সেনগুপ্তের কথা। খেলা শেষ হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন রাজেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্যই। ডিহাইড্রেশন হয়ে গেছিল। তাঁর মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হচ্ছিল। সেই সময় পুরস্কার নেওয়ার জন্য ডাক পড়ে শিবদাসের। খেয়াল হতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'রাজেন কই? সে কেমন আচে?'

সুধীর বললেন, 'ঠিক আচে। ডাক্তার দেকেচে। ভয়ের কিচু নেই।'

চারপাশে কাতারে কাতারে মানুষ। স্লোগান দিচ্ছে 'মোহনবাগান জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে।' প্লেয়ারদের কানে তালা লেগে গেছে। দিনের আলো চলে যাচ্ছে। এ বার বোসবাড়ির দিকে রওনা হতে হবে। তার আগে গা-হাত-পা পরিষ্কার করা দরকার। প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুর দিকে যাওয়ার সময় একটা নালা পড়ে। সেখানে বৃষ্টির জল জমে আছে। রোজ খেলার পর সেখানেই গা-হাত-পা থেকে কাদা তুলে নেন শিবদাসরা।

সুকুলকে তিনি বললেন, 'এই... সবাইকে গাছতলায় আসতে বল। একটু পরেই রওনা হতে হবে।'

খেলার সময় পায়ে শাড়ির পাড় বেঁধে খেলেন শিবদাস। যাতে বুটের আঘাত না লাগে। গাছতলায় বসে তিনি পাড় খুলতে লাগলেন। সেই সময় ভিড়ের মাঝখান থেকে ছুটে এলেন এরিয়ান ক্লাবের দানী মিত্তির। প্রায় কাকুতি করার ভঙ্গিতেই তিনি শৈলেনবাবুকে বললেন, 'আমায় মাপ করে দে ভাই। পুরনো কতা সব ভুলে যা। তোদের অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেচি। ভুল করেচি। তকন বুঝতে পারিনি। আজ আমায় একটু প্রায়শ্চিত্ত করতে দে।'

দানী মিত্তিরের কথায় একটু টলে গেলেন শৈলেনবাবু। এই আনন্দের দিনে কীই বা বলতে পারেন তিনি। সেই হ্যান্ডবিলের কথা মনে পড়তেই সারা শরীর চিড়বিড়িয়ে উঠল। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'ভাগ্যিস তোরা আমাকে নিয়ে ছড়া লিকেচিলি। নইলে শিল্ড জেতার ইচ্চেটা আমাদের জাগত না।'

'আর বলিস না ভাই।' দানী মিত্তির বললেন, 'অনেক শিক্ষে হয়েচে। চল, সবাই মিলে আনন্দ করি। এ তোদের জয় নয়। সারা বাঙালি জাতির জয়। শৈলেনভাই, আমি চার চারটে ওয়েলার ঘোড়ার গাড়ি এনেচি। উইনিং টিমকে গাড়িতে বসিয়ে বোসবাড়ি নিয়ে যাব। দুটো ব্যান্ডকেও বলে দিয়েচি। মিচিল করে ব্যান্ড বাজিয়ে শিবে-বিজেদের নিয়ে যাব শ্যামপুকুর।'

...এ দিকে দানী মিত্তিরের লোকেরা যখন প্লেয়ারদের জড়ো করার চেষ্টা করছেন, অন্যদিকে তখন নালার সামনে বসে ফুটবল বুট পরিষ্কার করছেন সুধীর। তাঁর পাশে কলেজের এক বন্ধু। খেলা নিয়ে দু'জনে কথা বলছেন। আশপাশে দাঁড়িয়ে সমর্থকরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই কথা শুনছেন। এমন সময় উদয় হলেন দীর্ঘদেহী এক ব্রাহ্মণ। পরনে শুভ্রবস্ত্র, উত্তরীয় ও উপবীত। পায়ে খড়ম। প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব তাঁর। চোখে পড়তেই হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন সুধীর। কোনও ভূমিকা না করেই সেই ব্রাহ্মণ বললেন, 'এটা তো হল। ওটা কবে নামানো যাবে?'

কথাটা বলেই আঙুল দিয়ে তিনি দেখালেন... কেল্লায় পতপত করে উড়তে থাকা ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাককে।

ঘটনার আকস্মিকতায় সুধীর বিহ্বল হয়ে গেছেন। এ তো স্বদেশিদের প্রশ্ন। মাঠে প্রচুর পুলিশের চর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন। তাঁদেরই কেউ ছদ্মবেশে এসে পরীক্ষা করছেন না কি? সুধীর কোনও রকমে উত্তর দিলেন, 'ওটাও হবে। আবার যেদিন মোহনবাগান শিল্ড জিতবে।'

স্মিত হেসে... আশীর্বাদের ভঙ্গি করে সেই ব্রাহ্মণ ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

...ওদিকে শিবদাসকে ঘিরে বেশ বড় ভিড়। প্লেয়াররা একে একে ওয়েলার গাড়িতে এসে উঠছেন। সুকুল, কানু, বিজেদা, হীরে এক গাড়িতে উঠে পড়েছেন। খোঁজ চলছে মনমোহনের। তাঁকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। শিবদাস বুঝতে পারলেন, মনমোহন বাড়ি চলে গেছেন। খেলার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করেন না মনমোহন। গঙ্গা পেরিয়ে

সিধে চলে যান উত্তরপাড়ায়। ওঁর বাবা মহেন্দ্র মুখার্জি কড়া ধাতের মানুষ। তিনি চান না, সন্ধের পর ছেলে বাড়ির বাইরে থাকুক। শিবদাস মনে মনে আফসোস করতে লাগলেন। বোসবাড়িতে গিয়ে শিল্ডজয়ী দলটার ছবি তুলবে বলেছে জ্যোতিষ। আজ মাঠে এসে মুভি ক্যামেরায় খেলার ছবি তুলেছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেল সে। যাওয়ার আগে বলে গেল, একটা গ্রুপ ছবি তুলে রাখবে। ইস, সেই ছবিতে মনমোহন থাকতে পারবে না। না, না, মনমোহনকে বাদ দিয়ে গ্রুপ ছবি তোলা যাবে না। জ্যোতিষকে কাল দুপুরে আসতে বলতে হবে।

মনমোহনের আশা ছেড়ে দিয়ে শিবদাস যখন গাড়িতে উঠতে যাবেন, তখন দেখলেন, হাবুল মুখ শুকনো করে অন্য গাড়িতে উঠছেন। এত আনন্দের দিনেও ওঁর মুখ কালো কেন? তিনি জানতে চাইলেন, 'কী হয়েচে রে হাবলা?'

হাবুল নিচু স্বরে বললেন, 'ওই দ্যাক মাডকস সাহেব। আমাদের আপিসের হেড অফিসার। ওই যে... দাঁড়িয়ে কতা কইচেন ভূপেনবাবুর সনে। আমায় দেকে ফেলেচেন। শিবে... আমার চাকরিটা বোধহয় কাল থেকে আর থাকবে না কো।'

শিবদাস অবাক হয়ে বললেন, 'চাকরি যাবে মানে?'

'সাহেবকে আমি মিথ্যে কথা কয়েচি যে। কাল আপিসে সাহেব নোটিশ দিয়েচিল, কর্পোরেশনের কোনও এমপ্লয়ি যেন কাজে ফাঁকি দিয়ে খেলা দেকতে না যায়। গেলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। নোটিশ দেকার পর... বাবার অসুক বলে আমি ছুটি নিইচি। কে জানে শ্লা, সাহেব আজ খেলা দেকতে আসবে? একা আসেনে...আবার বউ নিয়েও এয়েচে। কী কপাল আমার দ্যাক ভাই।'

শুনে হাসি পেল শিবদাসের। অফিসে তিনিও একই কারণে ফেঁসে আছেন। ভূপেনবাবু আছেন, সামলে নেবেন। এ বার নিয়ে হাবুল বার পাঁচেক ওঁর মৃত বাবাকে অসুখে ফেললেন। সে কথা মনে হতেই শিবদাস বললেন 'ধুত, এখন চল তো। তোর চাকরি নিয়ে পরে ভাবা যাবে'খন।'

ভিড়ের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে প্রেসিডেন্সি কলেজের তাঁবুর দিকে যাচ্ছেন অভিলাষ। তিনি জানেন না, চার ঘোড়ার ওয়েলার গাড়িতে টিম বোসবাড়িতে ফিরে যাবে। তাঁবুর কাছাকাছি এসে কাউকে তিনি দেখতে পেলেন না। লোকজনের ঢল এগিয়ে যাচ্ছে ধর্মতলার দিকে। অন্যদিন ধর্মতলার দিকে এ সময়ে আলো জ্বলে যায়। আজ এখনও আলো জ্বলেনি সাহেবপাড়ার দিকে। হাঁটতে হাঁটতে দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ল অভিলাষের। বাবার কথাও। আজ না হয় কাল, জয়ের খবর ময়মনসিংহে পৌঁছবেই। বাবা খুব আনন্দ পাবেন খবরটা শুনলে যে, ওঁর গোলেই মোহনবাগান জিতেছে।

'ওয়েলডান অভিলাষ।' পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল।

চমকে পাশ ফিরে তাকাতেই অভিলাষ দেখলেন, একজন ঝাঁকামুটে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বিরাট ঝাঁকা। পরনে মালকোচা দেওয়া ময়লা ধুতি আর ফতুয়া। মাঝবয়সি ঝাঁকামুটের সঙ্গে রয়েছে আর একটি ছেলে। তার কোলে একটা ডালায় সেদ্ধ ছোলা, বাদাম আর আলু। ছেলেটি মিটিমিটি হাসছে। দেখেই চিনতে পারলেন অভিলাষ। ... যতীন।

তা হলে মাঝবয়সি মানুষটা কে? বিপ্লবী হেমচন্দ্র সেন না কি? ছদ্মবেশে আজও উনি খেলা দেখতে এসেছেন! শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে অভিলাষ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন। মোহনবাগানের একজন প্লেয়ার একজন ঝাঁকামুটের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে, এটা লোকের চোখে পড়ে যাবে।

কোলের ডালা থেকে এক মুঠো ছোলা তুলে দিয়ে যতীন ফিসফিস করে বলল, 'উফ, তুই যা আনন্দ দিলি ভাই, জীবনেও কোনওদিন ভুলব না। এর পর ফাঁসির দড়ি গলায় ঝোলাতেও আমার বুক কাঁপবে না।'

'তুমি অহন কোথায় আছ ভাই?'

'বলা যাবে না। হেমদা তোকে কী যেন বলতে চান। ওঁর দিকে তাকাস না। ভিড়ের মাঝে পুলিশের চর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েচে। আমাদের চিনতে পারলে গুলি করে মারবে।'

তখনই হেমদা বলে উঠলেন, 'হ্যাটস অফ অভিলাষ। খেলার মাঠে আজ যা তোমরা করে দেখালে, কয়েক হাজার ইংরেজকে মেরেও আমরা সে কাজটা করতে পারতুম না ভাই। স্বাধীনতা আন্দোলনকে তোমরা একধাপ এগিয়ে দিলে। পারলে আমাদের ডেরায় একদিন এসো। লাবণ্যপ্রভা বলে একটা মেয়ে তোমাকে নিয়ে আসবে। সে তোমার বাদুড়বাগানের মেসে গিয়ে যোগাযোগ করে নেবে।'

ছোলা চিবোতে চিবোতে অভিলাষ বললেন, 'তারে আমি চিনুম কী কইর‍্যা?'

'তাকে তুমি আজই দেখেছ। হাফ টাইমে ভূপেনবাবুর পাশে বসেছিল। মোহনবাগানের পতাকা নাড়িয়ে চিয়ার আপ করতে চাইছিল তোমাদের। আ জেম অব আ গার্ল। আমাদের সমিতির সাপোর্টার। টিমের সঙ্গে সে বোসবাড়িতেই যাচ্ছে। সে নিজে তোমার সঙ্গে কথা কয়ে নেবে।'

অভিলাষ এ বার যতীনকে বললেন, 'তোমার লগে ফের কবে দেখা অইব ভাই।'

'লাবণ্য তোকে জানিয়ে দেবে। আর দেরি করা যাবে না। আজ আসি।' বলেই পা বাড়াল যতীন।

হেমবাবু অনেক আগে সরে পড়েছেন। দূর থেকে তাঁকে প্রণাম জানালেন অভিলাষ। ভগবান আজ তাঁর দু'দুটো ইচ্ছে পূরণ করে দিলেন। শিল্ড জেতা আর হেমবাবুকে দেখা। কম ভাগ্যের কথা!

...মিনিট দশেক পরে টিমের সঙ্গে শ্যামপুকুরের দিকে রওনা হলেন অভিলাষ। একেবারে সামনের গাড়িতে বসেছেন তিনি আর শিবদাস। ফাইনালের দুই গোলদাতা। উল্টো দিকে বসে রয়েছে সেই মেয়েটা। তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছেন না অভিলাষ। মেয়েটার হাতে সবুজ মেরুন পতাকা। কেমন যেন দেবী দেবী বলে মনে হচ্ছে তাঁকে। এই মেয়েটার মধ্যে এত তেজ আর সাহস! অনুশীলন সমিতির হেমচন্দ্র সেনও যাঁকে সমীহ করেন। শিবেদা আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর লাবণ্যপ্রভার সঙ্গে তিনি গল্প করতে শুরু করলেন।

পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের মুখ বুজে থাকতেই দেখেছেন অভিলাষ। তাদের স্থান ঘরের কোণে। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলন এমন একটা ঢেউ তুলেছে যে, অন্দরমহল ছেড়ে মেয়েরাও বাইরে বেরিয়ে এসেছে। লাবণ্যপ্রভার দিকে তাকিয়ে থাকার সময় অভিলাষ

এই প্রথম অনুভব করলেন, মেয়েরা স্বদেশি আন্দোলনে যত বেশি অংশ নেবে, স্বাধীনতা তত তাড়াতাড়ি আসতে বাধ্য। লাবণ্যপ্রভার মতো আরও মেয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে জন্মাক। মনে মনে তিনি এই প্রার্থনাই করলেন।

গাড়ি চলেছে উত্তর কলকাতার দিকে। হাজার হাজার মানুষ সেই বিজয় মিছিলে। নাচছেন, কেউ গাইছেন। চাঁদনি চকের কাছে গাড়ি থামালেন একদল মুসলমান। ব্যান্ড পার্টি নিয়ে এসেছেন। তাঁরাও মিছিলে সামিল হতে চান। শিবদাসকে মালা পরাতে চান। গাড়ি থেকে নেমে গেছেন শিবদাস। ফুলের মালায় মুসলমানরা ঢেকে দিয়েছেন তাঁকে। হঠাৎ অভিলাষ শুনলেন, 'কী আশ্চর্য, তাই না? জয়ের মালা যাঁর গলায় ঝোলার কথা, সে উপেক্ষিতই রয়ে গেল।'

চমকে উঠে অভিলাষ দেখলেন লাবণ্যপ্রভা তাঁর খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। কথাগুলো বলে তিনি মিটিমিটি হাসছেন। অভিলাষ বললেন, 'কার কথা কইতাছ?'

'বুঝতে পারোনি।' সঙ্গে সঙ্গে অভিলাষকে একটা মালা পরিয়ে দিলেন লাবণ্যপ্রভা। তার পর খিলখিল করে হাসতে লাগলেন।

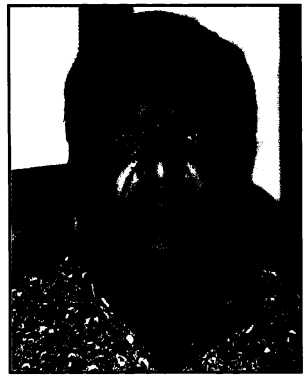

মতি নন্দীর পর ক্রীড়া সাহিত্যিক হিসাবে যাঁর নামটি উচ্চারিত হয়, তিনি রূপক সাহা। মতি নন্দীরই সুযোগ্য শিষ্য। দীর্ঘ ৩৫ বছর রূপক আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া দফতরে কাজ করেছেন। একটা সময় ক্রীড়া সম্পাদকও ছিলেন। বিশ্বকাপ ফুটবল, ইউরো ফুটবল, অলিম্পিক গেমস, এশিয়ান গেমস, সাফ গেমস—কভার করার জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্তে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন। তাঁর ফুটবল প্রাগুত্য নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ফুটবল নিয়ে তাঁর উপন্যাস 'নায়ক যখন কুশ', 'কোথায় তুমি ঋক', বাংলার কিশোর ফুটবলারদের স্বপ্ন পূরণের অনবদ্য কাহিনী।

সাহিত্যের জগতেও রূপকের অনায়াস বিচরণ। গবেষণালব্ধ তাঁর নতুন ধরনের উপন্যাসগুলি খুবই জনপ্রিয়। 'জুয়াড়ি', 'জীবন এমন', 'লাল রঙের পৃথিবী', 'সাদা পাতায় কালো দাগ', 'একাদশ ইন্দ্রিয়', 'হিয়া' 'পাতালজাতক', 'জীবাণু', 'মোক্ষ', 'বিষপাথর', 'হরফ' নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। তাঁর লেখা উল্লেখ্য খেলার বই—'মারাদোনার দোষ নেই, বিদ্রোহী মারাদোনা', 'বেঁচে গেল কলকাতা', 'ইতিহাসে ইস্টবেঙ্গল', 'গোলকি'। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি রূপক এখনও সাংবাদিকতা চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে তিনি 'সকালবেলা' সংবাদপত্রের ক্রীড়া সম্পাদক।